মহাবিশ্বে মানুষ
পুস্তকমালা

নূতন আবাস নূতন পড়শীর খোঁজে

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

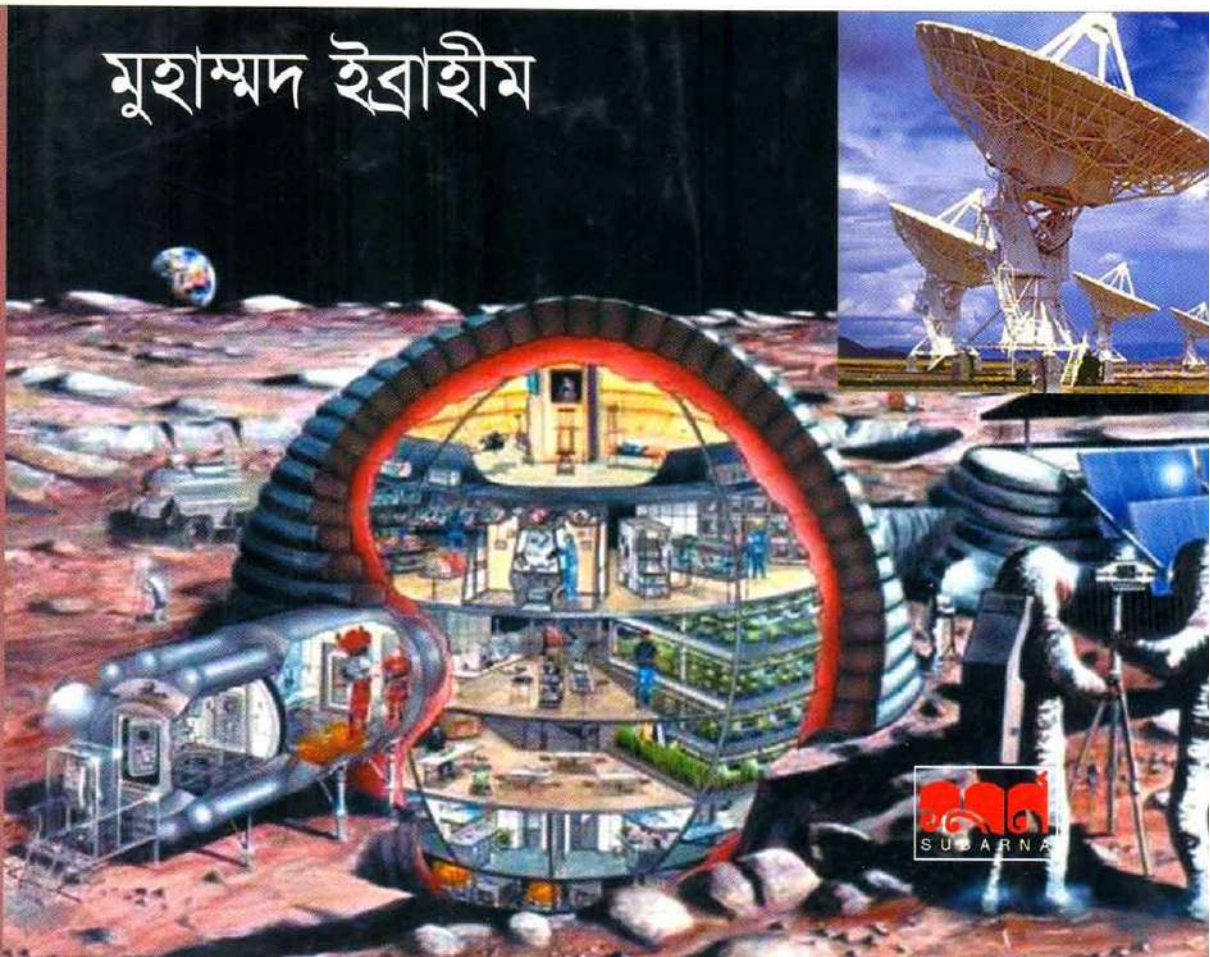

সুবর্ণ
SUBARNA

মহাবিশ্বে মানুষ
পুস্তকমালা

নূতন আবাস নূতন পড়শীর খোঁজে

জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র ধ্বংস অথবা কোন দৈব দুর্বিপাকে বাধ্য হয়ে মানুষকে পৃথিবীর বাইরে বসত করতে হতে পারে। প্রসারমান অর্থনীতি ও উন্নয়নের খাতিরেও তা করতে হতে পারে-আর তা হয়তো খুব দূর ভবিষ্যতের ব্যাপার নয়। সেক্ষেত্রে কোথায় হবে আমাদের নতুন ঠাঁই? আমরা চাঁদে ইতোমধ্যে গিয়েছি, মঙ্গল গ্রহেও যাব যাব করছি। কিন্তু সৌর জগতের এরকম কোন গ্রহ-উপগ্রহে আমাদের স্থায়ী বসতের সুযোগ কতখানি রয়েছে? যদি থাকে, তা হলে সেগুলোর কোনটিতে বসতের পথে কী রকম সমস্যা রয়েছে? ইতোমধ্যে কোন রকম কোন প্রাণি কি এগুলোর কোনটিতে আছে-এমনকি ক্ষুদ্র অণুজীব হলেও? এসব নিয়ে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান সাম্প্রতিক কালে অনেক এগিয়ে গেছে। একই সঙ্গে সেখানে যাবার,বসত করার, স্বাবলম্বী হবার উপায় উপকরণ নিয়েও প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে পৃথিবীর মত আমাদের জীবনযাত্রার উপযোগী গ্রহ-উপগ্রহ খুঁজে পেতে হলে আমাদেরকে সৌর জগৎ ছাড়িয়ে অন্য তারার গ্রহে যেতে হবে, যেটি শিগ্‌গির হবার নয়। কিন্তু এনিয়েও গবেষণা থেমে নেই। তাছাড়া আরেকটি প্রশ্ন এখন আমাদের সামনে। এই বিশাল মহাবিশ্বে আমরা কি একা, না আমাদের মত বুদ্ধিমান কেউ ঐ সুদূর জায়গাগুলোতে রয়েছে। যদি থাকে সেই আশায় চেষ্টা চলছে এরকম দূর বুদ্ধিমানের খবর নেয়ার।

প্রচ্ছদ ॥ মোবারক হোসেন লিটন

পুস্তকমালা

মহাবিশ্বে মানুষ

অষ্টম বই

নূতন আবাস, নূতন পড়শীর খোঁজে

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

মহাবিশ্বে মানুষ । অষ্টম বই

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১১ ।
প্রকাশক : আহমেদ মাহ্‌ফুজুল হক ।
সুবর্ণ । বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (দোতলা) রুম নং ২৩৫ ।
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন : ৭১২২৪১৬ ।
পৃষ্ঠা বিন্যাস : পারফর্ম কম্পিউটার্স, ১০৫ ফকিরাপুল, ঢাকা ১০০০
মুদ্রণ : ঢাকা প্রিন্টার্স । ৩৬ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা ১১০০
প্রচ্ছদ : মোবারক হোসেন লিটন । স্বত্ব : লেখক ।

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984 70297 0082-0

উৎসর্গ

যাদের সঙ্গে বিজ্ঞান আলোচনা করে সব সময়
অসীম আনন্দ লাভ করেছি,
যাদের অনুসন্ধিৎসু মন ও স্বপ্নভরা চোখ
সর্বক্ষণ অনুপ্রাণিত করে
যুগে যুগে যারা মহাবিশ্বে মানুষের স্থানটিকে
উজ্জ্বলতর করে তোলার প্রয়াস নিয়েছে, সেই–
তরুণ-তরুণীদেরকে

পুস্তকমালার ভূমিকা

প্রাণিজগতে আমাদের যে প্রজাতি তার বৈজ্ঞানিক নাম নিজেরা দিয়েছি হোমো সেপিয়েন্স অর্থাৎ 'জ্ঞানী মানুষ'। অন্য সব প্রজাতিকে ছাড়িয়ে যে অনন্যতা আমরা লাভ করেছি তার বড় প্রকাশ উচ্চতর চিন্তার ক্ষমতা, এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে মহাবিশ্বকে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করার আগ্রহ ও সক্ষমতা। নিজেদের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে আত্মঅনুসন্ধানও এই উদ্ঘাটন চেষ্টার অন্তর্ভূক্ত। আমরা কারা, কোথা থেকে এসেছি, কেমন করে চিন্তা করি, অন্য সবকিছুর সঙ্গে আমাদের কী রকম সম্পর্ক, ভবিষ্যতে কী সংকট ও কী সম্ভাবনাগুলো আসতে পারে– বিজ্ঞান এ সব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং এখন উত্তরগুলোকে সূক্ষ্মভাবে প্রমাণিত করতে পারছে। সামনে যে তা আরো শাণিত হবে তাও স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। এই পুস্তকমালা এসবকেই সবার জন্য সহজভাবে পরিবেশন করার প্রয়াস নিয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে লেখক এ বিষয়গুলো নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কিছু বিজ্ঞান-বক্তৃতা দিয়েছেন সর্ব-সাধারণের জন্য। 'সবার জন্য সর্বশেষ বিজ্ঞান' নামের এই বক্তৃতাগুলো প্রতি মাসে ঢাকাস্থ বৃটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং চ্যানেল আই কর্তৃক টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়েছে। পুস্তকমালার বইগুলো তার ভিত্তিতেই রচিত। একেবারেই সাম্প্রতিক বিজ্ঞান এসব নিয়ে আমাদের জ্ঞানের সীমান্তটি যেখানে এনে দিয়েছে, সকল জটিলতা সত্ত্বেও তাকেই সহজ ভাষায় উপভোগ্য করার চেষ্টা এতে রয়েছে। মহাবিশ্বের ক্রমবিকাশকে বুঝার ও তাতে আত্মঅনুসন্ধানের কিছু স্বাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ও ধরিত্রীর ভবিষ্যতের স্বার্থে আমাদের জীবনভঙ্গির অনেক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও এর মধ্যে অনিবার্যভাবে এসেছে। সব মিলে পুস্তকমালাটি আগ্রহী সবার জন্য, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের জন্য, চিন্তার ও আনন্দের খোরাক যোগাবে

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

পুস্তকমালার অন্যান্য বই

মহাবিশ্বের বয়স ও আমাদের মহাজাগতিক শিকড়

চারশত কোটি বছরের পৃথিবী ও প্রাণ

আফ্রিকা থেকে জ্ঞানী আমরা

আমরা কী ভাবে চিন্তা করি

উদ্ঘাটিত ডিএনএ, উৎসারিত সম্ভাবনা

জীববৈচিত্র ও আমাদের ভবিষ্যৎ

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন

নূতন আবাস, নূতন পড়শীর খোঁজে

ভূমিকা

আমাদের একটি মাত্র পৃথিবী, এটি আমাদের একমাত্র আবাস, এর ভবিষ্যতই আমাদের ভবিষ্যৎ। এই উপলব্ধি নিয়েই আজ আমরা পরিবেশ বিনষ্টি, বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন, ও জীব-বৈচিত্র ধ্বংস ইত্যাদির বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রামে রয়েছি। এই লড়াই এ আমাদেরকে জিততে হবে একথা যেমন ঠিক, তেমনি এতে হেরে যাবার উপক্রম হলে পৃথিবীর বাইরেও ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত হবার সুযোগ আমাদের করে রাখতে হবে। তা ছাড়া এ ধরনের দুর্বিপাকে বাধ্য না হলেও ভবিষ্যতের প্রসারমান অর্থনীতি ও উন্নয়নের প্রয়োজনেও পৃথিবীর বাইরে অন্য গ্রহ-উপগ্রহে বসত স্থাপনের প্রচেষ্টা আমাদেরকে চালিয়ে যেতে হবে। মহাশূন্য অভিযানে আমাদের অভিজ্ঞতা এবং সৌর জগতে প্রতিবেশী গ্রহ-উপগ্রহ সম্পর্কে আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞান এই প্রচেষ্টায় প্রচুর নূতন মাত্রা এনে দিচ্ছে।

কোথায় হতে পারে আমাদের নূতন ঠাঁই ? স্বাভাবিক ভাবে আমাদের তাৎ-ক্ষণিক লক্ষ্য হবে পৃথিবীর কাছাকাছি জায়গাগুলোতে যেখানে পরিস্থিতি পৃথিবীর চেয়ে অনেক ভিন্ন হলেও বসতের জন্য একেবারে অসম্ভব হবেনা। এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আমাদের চিন্তায় খুব বেশি করে আসে, তা হলো পৃথিবীর বাইরে জীবের অস্থিত্ব থাকার বিষয়। নাই বা হলো বুদ্ধিমান, জটিল বা বড় কোন জীব, এমনকি সেখানে কোন অণুজীবের অস্তিত্বের কথাও যদি জানা যায়, তা হলে সেখানে বসত করার ব্যাপারে আমাদের আস্থা অনেক বেড়ে যায়। তাই এখন বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান চলছে পৃথিবী- সদৃশ কোন্ গ্রহ-উপগ্রহগুলোতে এমন জীবের উপস্থিতির সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, আর কোথাকার উত্তাপ, বায়ুমণ্ডল, পানির উপস্থিতি ইত্যাদি আমাদের জীবন ধারণের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি অনুকূল হবে, তা নিয়ে। আপাতত আমাদের প্রধান নজর হলো মঙ্গল গ্রহের দিকে। যদিও মানুষ নিজে এখনো সেখানে যায়নি, মনুষ্যবিহীন নানা অভিযানের মাধ্যমে যা জানা গেছে তাতে বসত স্থাপনের জন্য একে অপেক্ষাকৃত অনুকূল বলে মনে করা যায়। অণুজীবের অস্তিত্বের সম্ভাবনার দিক থেকেও মঙ্গল এগিয়ে রয়েছে। তা ছাড়া বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপা এবং শনির উপগ্রহ টাইটানকেও কিছুটা সম্ভাবনাময় বলে মনে করা হচ্ছে। পরিস্থিতি ততটা অনুকূল না হলেও নৈকট্য ও পরিচিতির কারণে চাঁদ ও শুক্র গ্রহের কথাও বাদ দেয়া যাচ্ছেনা, এমনকি খুবই ছোট নানা গ্রহাণুর কথাও নয়। বসত স্থাপনের দিক থেকে এদের বিভিন্নটির বিভিন্ন রকম সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে। সত্যিকারভাবে সে বসতের স্থাপনা ভবিষ্যতের বিষয় হলেও এখনই এর নানা দিক নিয়ে গবেষণা ও পরীক্ষণের কমতি নেই। এটি এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির একটি জীবন্ত দিক।

এতে একটি বড় মাত্রা যোগ হয়েছে সম্প্রতি সৌর জগতের বাইরে দূর- তারার গ্রহ

আবিষ্কারের পর থেকে। এখন বিভিন্ন পদ্ধতিতে এরকম নানা তারার বেশ কিছু গ্রহ আবিষ্কৃত হচ্ছে যেগুলোর কোন কোনটি পৃথিবী-সদৃশ, প্রাণের ও বসতের অনুকূল হবার মত। ঐসব তারার জগতেই হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে আমাদের বসত স্থাপনের জন্য সব চেয়ে উপযোগী গ্রহ-উপগ্রহ। কিন্তু সেখানে সমস্যা হলো দূরত্বের। দূর-তারার জগতে অভিযান সম্ভব করে তুলতে হলে আমাদের আজকের মহাশূন্যযানের গতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে হবে, এ গতিকে নিয়ে যেতে হবে আলোর গতির আরো অনেক কাছাকাছি। সেই নূতন ধরনের মহাশূন্যযান নিয়েও চলছে গবেষণা।

ইতোমধ্যে আর একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন নিয়ে গত পঞ্চাশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা সক্রিয় অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। সে প্রশ্নটি হলো মহাবিশ্বে আমরা কি একা ? মহাবিশ্বের অন্যত্র আমাদের মত বুদ্ধিমানদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার জন্য তাদের পাঠানো সম্ভাব্য রেডিও সিগন্যাল উদ্ঘাটন করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন অনেক বিজ্ঞানী। যে কোন দিন সেই উদ্ঘাটন ঘটে গেলে মহাবিশ্বে নিজেদের অবস্থান নিয়ে আমাদের চিন্তা চেতনা আমূল বদলে যাবে বৈ কি। সত্যি সত্যি কখন আমরা পৃথিবীর বাইরে ছড়িয়ে পড়বো, কখন দূর-বুদ্ধিমানের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হবে, সেদিন আসার অনেক আগেই বিজ্ঞানের এই চমকপ্রদ প্রচেষ্টাগুলো মহাবিশ্বে মানুষের স্থানটিকে ক্রমাগত নূতন করে আমাদের সামনে নিয়ে আসছে।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সূচিপত্র

অন্য কোন খানে ১২

সৌর জগত সমীক্ষা ২৭

প্রাণ সম্ভবা প্রতিবেশী ৪৪

গ্রহকে গড়ে নেয়া ৬৬

সৌর জগতে বসত ৭৫

অন্য তারার গ্রহ ৯৬

তারার জগতে পাড়ি দেবার বাহন ১১২

আমরা কি একা ? ১২৫

নূতন আবাস,
নূতন পড়শির খোঁজে

অন্য কোন খানে

কোথায় হবে আমাদের নূতন ঠাঁই?

পৃথিবীতে মানুষ বাড়ছে, প্রাকৃতিক সম্পদ কমে যাচ্ছে। এভাবে কতদিন এখানে সবার জায়গা হবে? তার চেয়েও ভয়ের কথা মানুষ নিজের কর্মকাণ্ডে এমন কিছু ঘটাচ্ছে যার ফলে এ পৃথিবী আর কতদিন বাসযোগ্য থাকবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আগামীতে জলবায়ু পরিবর্তন যে বহু অনর্থ ঘটাবে সেটি প্রায় অবধারিত। দুনিয়াটিকে আমরা দ্রুত দূষিত করে ফেলছি, জীববৈচিত্রের গণ-বিলুপ্তি ঘটিয়ে এর জৈব ভারসাম্যও নষ্ট করে ফেলছি। বড় ধরনের প্রাকৃতিক দৈর্ব দুর্বিপাকের সম্ভাবনাও দূর হয়ে যায়নি– যে রকম দুর্বিপাক সাড়ে ছয়শত কোটি বছর আগে পৃথিবীর সকল জীবের বড় অংশ ধ্বংস করে দিয়েছিল। হয়তো শেষ পর্যন্ত মানব জাতিকে টিকিয়ে রাখতে হলে শুধু পৃথিবীর উপর আর ভরসা করা যাবেনা, আমাদেরকে তার বাইরের মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে হবে– প্রথমে অবশ্য আমাদের সৌর জগতেই সুবিধাজনক কোথাও, তারপর আরো দূরে। আমাদের মহাকাশ গবেষণার অংশ হিসাবে বিজ্ঞানীরা তাঁদের অনুসন্ধানে এই দিকটার কথাও বহুদিন ধরে খেয়ালে রেখেছেন, একটি সুদূর সম্ভাবনা হিসাবে।

প্রখ্যাত পদার্থবিদ ষ্টিফেন হকিংস কিন্তু একে খুব বেশি সুদূরের ব্যাপার মনে করছেননা। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে যা করতে হবে তা হলো অন্তত আরো দু'শটি বছর পৃথিবীটাকে কোন রকমে সকলের বাসযোগ্য রাখতে হবে। এর মধ্যেই আমরা পৃথিবীর বাইরে অন্যত্র বড় আকারের বসত সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করবো। অনেকে হয়তো এই সময়ের পরিধিটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে একমত হবেন না। কিন্তু যে বিষয়ে সবাই মোটামুটি একমত হবেন তা হলো জীব-প্রজাতি হিসাবে নিজেদেরকে দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে মানুষকে পৃথিবীর বাইরে ছড়িয়ে পড়তে হবে, যেভাবে পৃথিবীর ভেতরেও তারা ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের মূল উৎপত্তি স্থল থেকে। কিন্তু পৃথিবীর বাইরে স্থায়ীভাবে থাকতে যাওয়া একটি খুব বড় চ্যালেঞ্জ। তার আগে করতে হবে অনেক অনুসন্ধান, অনেক পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ, বিশাল সব আয়োজন– যার অনেকগুলো এখন ভাবতেই মাথা ঘুরে যায়। কিন্তু এসব হতে হবে, এবং এর প্রক্রিয়া এখনো থেমে নেই।

কোথায় হবে আমাদের নূতন ঠাঁই? স্বভাবতই সে জায়গা মানুষের বাসযোগ্য হতে হবে। আর সেটি হবার মানে হলো এটি অন্য জীবেরও বাসযোগ্য হতে হবে। প্রাণের

জন্য অনুকূল পরিবেশ হতে হলে ন্যূনতম কতগুলো জিনিসের উপস্থিতি একেবারেই অপরিহার্য। অন্তত এখন পর্যন্ত আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে বিজ্ঞান সেটিই বলে এসেছে। এর মধ্যে একটি হলো তরল পানি– প্রাণ এবং পানি আমাদের কাছে প্রায় সমার্থক। অধিকাংশ জীবদেহের বড় অংশটাই তো পানিতে গড়া। যে উত্তাপে জীব বাঁচতে পারে তারো একটি সীমা আছে– ওরকম অনুকূল উত্তাপ থাকা চাই। জীবের জন্য শক্তির উৎস থাকতে হবে, যেমন পৃথিবীর প্রায় সব জীবের জন্য শক্তি আসে প্রকারান্তে সূর্যের শক্তি থেকে। আর জীবের দেহ গঠন হবার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগুলোও যথাযথ পরিমাণে থাকতে হবে। বায়ুমণ্ডলতো থাকতে হবেই, তার উপাদানগুলোও সঠিক হতে হবে– যেমন কিছু ব্যাকটেরিয়া ছাড়া অধিকাংশ জীবের জন্য অক্সিজেন অপরিহার্য। বায়ুমণ্ডলের চাপটিও ঠিক থাকা চাই। চাপ খুব কম হলে আমাদের প্রয়োজন মিটবেনা, বেশি হলে আবার চাপে চ্যাপ্টা হয়ে মারা যাব। পৃথিবীতে এসব ঠিক ঠাক আছে, তাই আমরা আছি, অন্য সব জীবও আছে। ওরকম জায়গা পৃথিবীর বাইরে খুঁজে পাবো কি? না পেলে সেখানে তা অন্তত সৃষ্টি করতে পারবো কি? ঠাঁই বদলের লক্ষ্যে আমাদের অনুসন্ধান ও পরীক্ষা নিরিক্ষায় এ সব প্রশ্ন খুব গুরুত্ব পাবে।

স্বাভাবিক ভাবে আমাদের প্রথম দৃষ্টি থাকবে সৌর জগতের মধ্যে পৃথিবীর আশেপাশে। এখানকার গ্রহ-উপগ্রহগুলো সূর্য থেকে মোটামুটি পৃথিবীর মত একই মাত্রার দূরত্বে রয়েছে বলে এর মতোই এরাও কঠিন পাথুরে বস্তু দিয়ে তৈরি, উত্তাপটিও বেয়াড়া রকমের চরম না হবার কথা। তবে দৃষ্টি আর একটু দূরেও দিতে হতে পারে। সূর্য থেকে অপেক্ষাকৃত অনেক দূরে যে বিশাল দু'টি গ্রহ রয়েছে বৃহস্পতি আর শনি– এরা অত্যন্ত শীতল এবং প্রধানত গ্যাসে গড়া বলে ওখানে আমাদের ঠাঁই হবার কথা নয়। কিন্তু এগুলোর কোন কোন উপগ্রহের ক্ষেত্রে এ কথা খাটেনা। সেগুলোর দিকেও নজর দিতে হবে। সৌরজগতের বাইরে অন্য তারার গ্রহ সম্পর্কে আমরা এতদিন কিছুই জানতামনা। এখন জানতে শুরু করেছি, এমনকি পৃথিবীর মত গ্রহেরও হদিশ পাচ্ছি সেখানে। এদেরও সম্ভাবনাগুলো দেখতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে বড় সমস্যা ঐ বিশাল দূরত্বে যাওয়া নিয়ে।

পৃথিবীর বাইরে প্রাণের সম্ভাবনা

পৃথিবীর বাইরে আমাদের পা বাড়াবার ও বসত করার চিন্তার সঙ্গে ওত-প্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে আর একটি প্রশ্ন। পৃথিবীর বাইরের কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি? নাই বা হলো আমাদের মতো উচ্চ পর্যায়ের বা বুদ্ধিমান কোন প্রাণি, নিদেন কোন অণুজীব যেমন ব্যাকটেরিয়ার সন্ধানও যদি আমরা পাই, তা হলে সে জায়গার

বাসযোগ্যতা সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট আস্থা তৈরি হয় বৈ কি। এই ব্যাপারটি সম্পর্কে আমরা পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে কিছু কিছু আন্দাজ করে আসছি বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বাইরে কোথাও কোন ধরনের প্রাণের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়নি। অবশ্য এমন প্রমাণ পাওয়ার মত বিস্তারিত অনুসন্ধানের সুযোগও আমাদের ঘটেনি তেমন। প্রমাণ না পাওয়া গেলেও বিজ্ঞানীদের একটি বড় অংশ নিশ্চিত যে পৃথিবীই প্রাণের একমাত্র আবাস হতে পারে না, প্রাণ নিশ্চয়ই মহাবিশ্বের আরো অসংখ্য জায়গায় রয়েছে। তাঁদের এই আস্থার কারণ হলো মহাবিশ্বের সর্বত্র যে একটি সমতা বিরাজ করছে, বিশাল এই মহাবিশ্ব মোটের উপর যে সমসত্ত্ব, এই বৈজ্ঞানিক নীতির অকাট্যতা। পৃথিবীতে যে ভাবে প্রাণের উন্মেষ হয়েছে, সেভাবে তাই মহাবিশ্বের সব অঞ্চলে অনুরূপ পরিবেশের সব জায়গাতেই হবার কথা, কারণ মহাবিশ্বের মধ্যে পৃথিবীর কোন আলাদা বৈশিষ্ট নেই। যে সূর্যের এটি গ্রহ, সেটির মত তারা মহাবিশ্বে কোটি কোটি রয়েছে, আর সে সব তারার সঙ্গে পৃথিবীর মত অগুণতি গ্রহও থাকার কথা, যাদের মধ্যে পৃথিবীর মতই প্রাণের উন্মেষ হবার সব শর্তই বর্তমান। মহাবিশ্ব সমসত্ত্ব, এর প্রকৃতিও সমসত্ত্ব– কাজেই প্রাণের সম্ভাবনার বন্টনও মোটামুটি সারা মহাবিশ্ব জুড়েই রয়েছে। আমরা এখনো উদ্ঘাটন করতে পারিনি বলেই পৃথিবীর বাইরে প্রাণের কথা জানতে পারিনি।

এর পেছনে আরো একটি তত্ত্ব কাজ করছে– তা হলো প্রাণের উন্মেষকে নিয়ে। এই তত্ত্বের মতে প্রাণের উন্মেষ হবার মত পারিবেশিক পরিস্থিতি যেখানে আছে সেখানে কোন না কোন পর্যায়ে প্রাণের সৃষ্টি ঘটবেই– যেমন করে ঘটেছিল পৃথিবীতে আজ থেকে প্রায় ৪ শত কোটি বছর আগে। এ যেন সুযোগ পেলেই প্রাণ থাকবে এমন এক ধরনের অবশ্যম্ভাবিতা। যে সব রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক যোগ-বিয়োগের বৈচিত্রের মধ্যে পৃথিবীতে প্রাণ এসেছিলো বলে মনে করা হয়, সেগুলোরই অবশ্যম্ভাবিতা এটি। কাজেই সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত এই দুটি বৈজ্ঞানিক নীতি পৃথিবীর বাইরে প্রাণ সম্পর্কে আমাদেরকে আশান্বিত করে– প্রকৃতির সমসত্ত্বতার নীতি এবং প্রাণের জৈব রাসায়নিক অবশ্যম্ভাবিতা। কিন্তু নীতি দুটি বিজ্ঞানীদের সবার কাছে একেবারে সর্বজনমান্য হয়ে উঠেনি। কেউ কেউ প্রাণের উন্মেষ ঘটার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে দেখেন। তাঁরা একে অত্যন্ত বিরল একটি অনন্য ঘটনা মনে করেন। অনেকগুলো জিনিস খুবই সূক্ষ্মভাবে দৈবক্রমে এক সঙ্গে মিলে গিয়েছিল বলে পৃথিবীতে প্রাণ শুরু হতে পেয়েছিল, এভাবে অন্যত্র ঘটার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ। এ মতামতটি কেন বর্তমানে বেশি সমর্থন পায়না তা বুঝতে হলে পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে যে তত্ত্বগুলো এখন যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে সেগুলো খুব সংক্ষেপে একটু দেখা দরকার।

পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব কালীন পরিস্থিতি

পৃথিবীতে ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া রূপে সর্বপ্রাচীন প্রাণের যে সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে তা চার শত কোটি বছরের খুব কাছাকাছি সময় আগেকার। ঐ সময় পৃথিবীর একেবারে শৈশব– ঘন ঘন উল্কা আর ধূমকেতুর আঘাতে জর্জরিত, বজ্র বিদ্যুৎ সঙ্কুল আকাশ, আর উচ্চ জোয়ার ভাটায় উথাল উত্তপ্ত সমুদ্রের পানি। ১৯৫৩ সালে এক পরীক্ষণে বিজ্ঞানী মিলার ঠিক এমনি একটি পরিবেশ অতি ক্ষুদ্র আকারে নকল করেছিলেন তাঁর ল্যাবোরেটরির ফ্লাস্কে। এতে পানি, মিথেন, এমোনিয়া, কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের মধ্য পানি ফুটিয়ে ক্রমাগত এর বাষ্প চালনা করা হয়েছে আর একটি ফ্লাস্কে যার মধ্যে বৈদ্যুতিক স্পার্ক বা স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। ঐ বাষ্প একটি U আকৃতির বাঁকা নলের মধ্য দিয়ে এসে ঐ গ্যাস ভর্তি ফুটন্ত পানির সঙ্গে আবার যোগ দিচ্ছে। এভাবে কয়েকদিন ক্রমাগত চলার পর দেখা গেছে যে ঐ বাঁকা নলের মধ্যে অনেক জৈব অণু সমৃদ্ধ একটি ঝোল তৈরি হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে প্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর মধ্যে ছিল বেশ কয়েক রকমের সুগার, এমাইনো এসিড, ডিএনএ'র অংশ হবার মতো অণু ইত্যাদি। মিলারের এই পরীক্ষা ও এর পরের অনুরূপ আরো কিছু পরীক্ষার ফলাফলে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে যে পৃথিবীর শৈশবে ওরকম আবহাওয়া ও বায়ুমণ্ডলে বজ্র বিদ্যুতের উপস্থিতিতে প্রথম জীবের অত্যাবশকীয় উপাদানগুলো স্বাভাবিক ভাবেই সৃষ্টি হতে পেরেছিল। স্পষ্টত এমন পরিস্থিতিতে তা সৃষ্টি হওয়া মোটেই বিরল ঘটনা নয়। এমাইনো এসিড জীবের জন্য অত্যাবশ্যক প্রোটিনের উপাদান, আর অন্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিস ডিএনএ'র উপাদানও কিছু কিছু মিলারের পরীক্ষণে তৈরি হয়েছিল।

উপাদান থাকলেই তো আর প্রথম জীব সৃষ্টি হতে পারেনা, সেই উপাদানগুলো একত্র হয়ে পরস্পর বিক্রিয়া করে জীব হওয়ার প্রক্রিয়াটি প্রথম বারের মত শুরু হতে হবে। সেটি কীভাবে সম্ভব হয়েছিলো সে সম্পর্কেও মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব রয়েছে। এতে ডিএনএ'র কিছুটা সরলতর সংস্করণ আর এন এ স্বয়ংক্রিয় ভাবে তৈরি হয়েছিল বলে ধরে নেয়া হয়। আর এন এর উপাদানগুলো পরিবেশে যে থাকতে পারতো তার প্রমাণ মিলারের পরীক্ষার মত পরীক্ষায় পাওয়া গেছে। ঐ সরল উপাদানগুলো অনুকূল সুশৃঙ্খল তলের উপর জটিলতর অণু গঠন করতে পারে, যথেষ্ট সময় পেলে আরএনএ'র অণুও গঠন করতে পারে। এই আরএনএ অণু একাধারে ডিএনএ'র মতো প্রোটিন তৈরির সংকেত যুগিয়েছে, আবার একই সঙ্গে এ প্রাথমিক প্রোটিন এনজাইমের মতোও কাজ করছে।

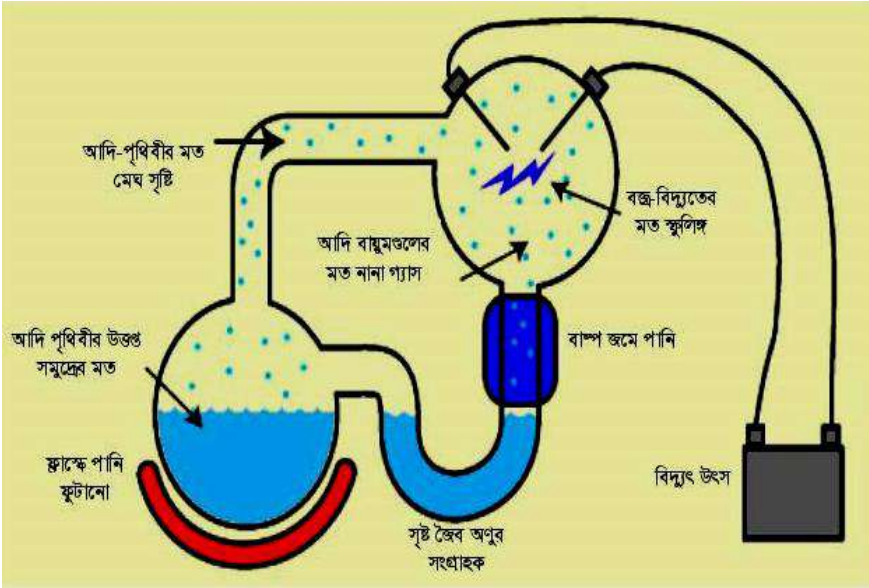

মিলারের পরীক্ষণে জীবনের উপাদান সৃষ্টি

১৯৭০ এর দশকের আগে মনে করা হতো যে মূলত সূর্যের শক্তি ব্যবহার করা ছাড়া জীবের অস্তিত্বের আর কোন উপায় নাই, এবং তা কখনো ছিল না। কিন্তু ১৯৭৭ সালে প্রশান্ত মহাসাগরের তলে গভীর খাদের মধ্যে ছোট ডুবোজাহাজ নামিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষায় ধরা পড়েছে যে সেখানে আগ্নেয়- গিরি সক্রিয়তায় খুবই উত্তপ্ত অঞ্চলের কাছে নলাকৃতি কিছু কীট, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদির রীতিমত এক কলোনি। অথচ ওখানে সূর্যের আলো পৌঁছেনা, সালোক সংশ্লেষণে উদ্ভিদ-প্লাংকটনের তৈরি হবার কোন সুযোগ নেই। উপর থেকে জলজ জীবের মরদেহও নিচে যাচ্ছে না যা ঐ কলোনির প্রাথমিক খাদ্য যোগান দিতে পারে। বরং আবিষ্কৃত হলো সম্পূর্ণ নূতন ব্যবস্থা, নূতন খাদ্য চেইন যা এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার উপর নির্ভরশীল। এই ব্যাকটেরিয়ার খাদ্য সরাসরি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অজৈব বস্তু থেকে সংশ্লেষিত হয়– সালোক সংশ্লেষণের বদলে রাসায়নিক সংশ্লেষণ। ওখানে অভ্যন্তর থেকে নির্গত হচ্ছে অত্যন্ত উত্তপ্ত হাইড্রোজেন ও হাইড্রোজেন- সালফাইড গ্যাস– যা সাধারণত জীবের জন্য খুব ভাল জিনিস নয়। কিন্তু ঐ গ্যাসের বুদবুদের সঙ্গে পানিতে মেশানো অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড বিক্রিয়া করে তৈরি হয় ব্যাকটেরিয়ার পুষ্টি কার্বোহাইড্রেট।

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি তত্ত্ব ব্যাপারটিকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছে। গভীর সমুদ্রের আভ্যন্তরীণ উত্তপ্ত শক্তি উৎসের যে নমুনা উপরে দেখেছি প্রাণের সূচনালগ্নে পৃথিবীর শৈশবে সেগুলো ব্যাপকভাবে ছিল। সেখানে নির্গত লোহা আর সালফারে গড়া আয়রন পাইরাইট স্ফটিকের অতি সুশৃঙ্খল তলের উপর সরল উপাদানগুলো স্বয়ংক্রিয় ভাবে সংশ্লেষিত হয়েছিল। সরল উপাদান থেকে এভাবে জটিলতর জৈব

অণু গঠন করতে পেরেছিল স্বয়ংক্রিয় সংশ্লেষণ– যাকে পৃথিবীতে প্রাণের উন্মেষের একটি আবশ্যকীয় প্রক্রিয়া মনে করা হচ্ছে।

কাজেই পৃথিবীতে যা সম্ভব হয়েছে তা একই পরিবেশ পেলে অন্যত্র সম্ভব হবেনা তা ভাবার কোন কারণ নেই। এরকম অভাবনীয় পরিস্থিতিতেও তাই প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে। পৃথিবীতে প্রাণের উন্মেষের আর একটি বিকল্প তত্ত্ব কোন কোন বিজ্ঞানী সমর্থন করেন, যদিও তাঁদের সংখ্যা কম। এ তত্ত্বের মতে প্রাণের উন্মেষ আসলে

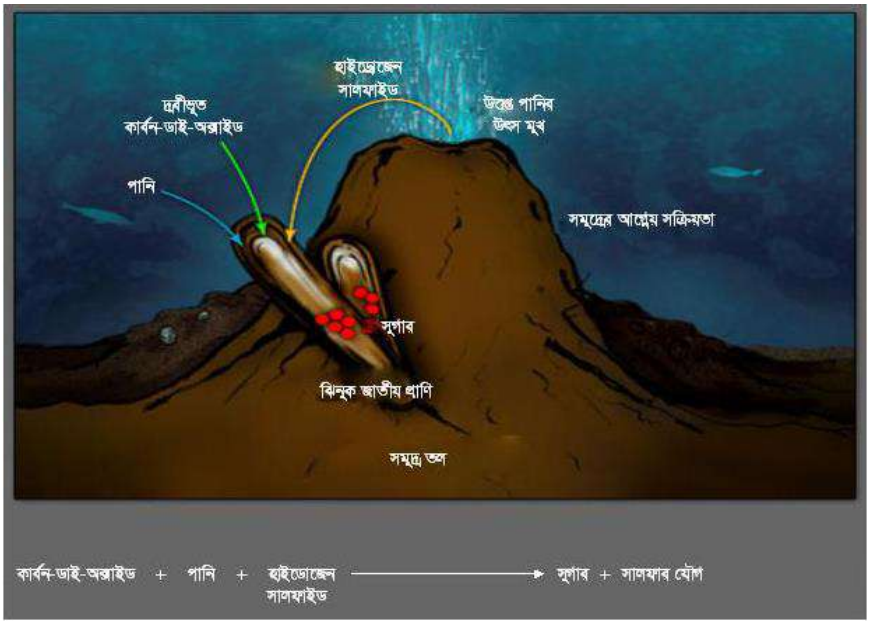

সালোক সংশে- ষণের বদলে রাসায়নিক সংশে- ষণে খাদ্য তৈরি (পৃথিবীতে সমুদ্র তলে)

পৃথিবীতে ঘটেনি, ঘটেছে মহাবিশ্বের অন্যত্র হয়তো বহু বিভিন্ন জায়গায়। সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন বস্তুখণ্ডে গড়া ধূমকেতু বাহিত হয়ে এই আদি বীজ পৃথিবীতে এসেছিলো। ধূমকেতুর মধ্যেও থাকে পানি, এমোনিয়া, মিথেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি– যা জীবের পোষণের জন্য অনুকূল। পৃথিবীতে প্রাণের শুরু নিয়ে এই তত্ত্ব যদি ঠিক প্রমাণিত হয় তা হলে পৃথিবীর বাইরে বহু জায়গায় প্রাণ থাকাটি তো আরো বেশি স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে পড়ে।

প্রাণ যে পৃথিবীর একচেটিয়া হবার কথা নয়, পৃথিবীর চেয়ে সার্বিক ভাবে মহাবিশ্বই যে প্রাণের জন্য অধিকতর অনুকূল ক্ষেত্র তার স্বপক্ষে একটি চমৎকার যুক্তি রয়েছে। পৃথিবীর সব জীবের দেহের মধ্যে সাধারণভাবে ৪টি প্রধান মৌলিক পদার্থ অবশ্যই থাকে– হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ও নাইট্রোজেন। অন্যদিকে মহাবিশ্বে সব

চেয়ে বেশি প্রাচুর্য রয়েছে যে ৬টি মৌলের– এই চারটি তার অন্তর্গত। বাকি দুটি হলো হিলিয়াম ও নিয়ন যারা কোন কিছুর সঙ্গে বিক্রিয়া করেনা বলে জীবের জন্য নিষ্প্রয়োজন। অথচ পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশি প্রাচুর্য রয়েছে যে মৌলগুলো তার মধ্যে জীবের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ঐ চারটির মধ্যে শুধু একটিই রয়েছে– অক্সিজেন। কাজেই বলা যায় জীব দেহ মহাবিশ্বেরই প্রতিচ্ছবি– পৃথিবীর নয়। যদি মহাবিশ্বে ঐ চারটি মৌল দুষ্প্রাপ্য হতো আর পৃথিবীতে প্রচুর থাকতো তা হলেই বরং প্রমাণিত হতো যে প্রাণ জিনিসটা পৃথিবীরই একচেটিয়া।

মহাবিশ্বময় প্রাণ-বীজ

ধূমকেতু বাহিত হয়ে প্রথম প্রাণের পৃথিবীতে আসার ধারণাটি এখন আর এক ভাবে আরো বিস্তৃত রূপ পেয়েছে। এতে মনে করা হচ্ছে যে পৃথিবীতে এত বৈচিত্রের মধ্যেও সব জীবের মধ্যে একটি মৌলিক ঐক্য রয়েছে। সেই একই জীবের কোন না কোন সরল রূপ মহাবিশ্বে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়েছে উল্কা ধূমকেতুর মত জিনিসে বাহিত হয়ে। যেখানে অনুকূল পরিবেশ পেয়েছে প্রাণ সেখানে বিকশিত হয়েছে। এর মতে গোড়া থেকে এটি ঘটে চলেছে– একই প্রাণ-বীজ যেন বিশ্বময় ছড়িয়ে চলেছে। এই তত্ত্বটিকে বলা হয় তাই 'মহাবিশ্বময় প্রাণবীজ' (প্যানস্পার্মিয়া)। আশীর দশকে পৃথিবীতে একটি উল্কা খণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে যা মঙ্গলগ্রহ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে এখানে এসে পড়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর মধ্যে এমন কিছু আণুবীক্ষণিক চিহ্ন পাওয়া গেছে যাকে খুব ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়ার ফসিল বলে কেউ কেউ মনে করছেন– অনেকটা পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র কিছু ব্যাকটেরিয়ার মত। যদিও শেষের বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ রয়েছে, একে মহাবিশ্বময় প্রাণবীজ ধারণার একটি সাক্ষ্য মনেও করছেন কেউ কেউ। খুবই সম্প্রতি এই ধারণার আর এক ধরনের পরোক্ষ সমর্থন মিলেছে খুব সূক্ষ্ম কিছু পরীক্ষণে।

২০০৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র মহাশূন্য সংস্থা নাসার ষ্টার ডাষ্ট মিশনে মহাশূন্যযান মহাকাশে ধূমকেতু থেকে বস্তু সংগ্রহ করে তার বিশ্লেষণের ব্যবস্থা করেছে। তখন ধূমকেতুর বস্তুতে বিভিন্ন রকম এমাইনো এসিড ও অন্যান্য জৈব অণুর সন্ধান পাওয়া গেছে, যাতে মনে হয় প্রাণের বাহক হবার, এমন কি প্রাণের বিকাশ ঘটাবার সুযোগ এর রয়েছে। ২০০৯ সালে আরো স্পষ্ট কিছু আলামত ধরা পড়েছে নাসার বিজ্ঞানীদের হাতে। কিছু কার্বন-সমৃদ্ধ গ্রহাণু থেকে আসা উল্কার বিশ্লেষণে তাঁরা তাতে বেশ কিছু এমাইনো এসিডের সন্ধান পেয়েছেন। অন্যান্য অনেক জৈব অণুর মতো একই রকম এমাইনো এসিড অণু রাসায়নিক ভাবে দুটি ভিন্ন রূপে থাকতে পারে– একটিকে বলা যায় বাঁহাতি, অন্যটিকে ডানহাতি। পৃথিবীর জৈব প্রকৃতিতে এটি শুধু বাঁহাতি রূপেই

পাওয়া যায়। ঐ উল্কার বিশ্লেষণে দেখা গেছে সেখানে ডানহাতি রূপের তুলনায় বাঁহাতি রূপেই এমাইনো এসিড অনেক বেশি দেখা গেছে। অথচ প্রাণের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন ভাবে শুধু অণু হিসাবে এগুলো মহাবিশ্বে তৈরি হলে উভয়ের সংখ্যা সমান হবার কথা ছিল। সৌরজগতের মধ্যে উল্কাখণ্ডের মাধ্যমে প্রাণ-বীজ বিনিময় ঘটেছে এমন ধারণার প্রতি এসব সমর্থন যোগাচ্ছে। অনেকের মতে সৌর জগতের বাইরেও মহাবিশ্বের সর্বত্র এ ধারণাটি সত্য– এবং একই ধরনের প্রাণের বিস্তৃতি সেখানেও ঘটেছে।

মহাবিশ্বময় প্রাণ-বীজের আদান প্রদানের এই তত্ত্বটির বিরুদ্ধেও কিছু যুক্তি রয়েছে। পৃথিবীর জীবসদৃশ প্রাণের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয় হলো হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন, এবং তার পরপরই বেশি প্রয়োজনীয় লোহা, ফসফরাস ও সালফার। এসব মৌল যথেষ্ট ঘনত্বে ও যথাযথ উত্তাপে একত্রে না থাকলে জীব গড়ে উঠা সম্ভব নয়। সেই বিচারে প্রাণ-বীজ গ্রহ-উপগ্রহদের আশ্রয়ে অথবা আন্ততারা বস্তুতে ধূলিমেঘের ভেতরেই শুধু থাকতে পারে। এসবের বাইরে এসে মহাজাগতিক রশ্মি, তারার অগ্নিশিখার ঝড়, ক্ষতিকর আলট্রাভায়োলেট রশ্মি ইত্যাদির মধ্যে উন্মুক্ত ভাবে দীর্ঘদিন থাকলে তাতে কোন জীব বেঁচে থাকা দুরূহ। তাছাড়া এখন আমরা জানি যদিও মঙ্গল, শুক্র প্রভৃতি আমাদের প্রতিবেশী কিছু গ্রহ এখন পৃথিবীর থেকে অনেক ভিন্ন পরিবেশে রয়েছে, সৃষ্টি হবার কিছু পরে শৈশবে কিন্তু ওদের অবস্থা অনেকটা পৃথিবীর মতই ছিল। মহাবিশ্বময় প্রাণ-বীজ থাকলে পৃথিবীর মত সেখানেও প্রাণের প্রারম্ভ ঘটতো, সেগুলো হয়তো পৃথিবীর মত বিবর্তিত ও বিকশিত হতো। তেমনটি হলে তাদের উপস্থিতি কোন না কোন ভাবে ইতোমধ্যে আমরা বুঝতে পারতাম। আজ সেগুলো যদি টিকে নাও থাকে, অন্তত তাদের ফসিল মঙ্গল গ্রহ ইত্যাদিতে আমাদের অনুসন্ধানে পাওয়া যাওয়ার কথা। কিন্তু সে রকম কোন আভাস এখন পর্যন্ত মেলেনি।

অন্যদিকে মহাবিশ্বের এক জায়গা থেকে ভিন্ন জায়গায় বাহিত হবার মত চরম পরিস্থিতি সহ্য করতে কোন কোন জীব যে সক্ষম তার প্রমাণ মিলছে। মহাশূন্যে মহাজাগতিক রশ্মি ইত্যাদির দ্বারা ক্ষতির এবং অনেক বেগে বায়ুমণ্ডলে ঢুকার সময় সৃষ্ট উত্তাপ সহ্য করার ব্যাপারে এখন অনেকটা আশাবাদী তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে কিছু ধরনের ব্যাকটেরিয়া এগুলো অধিক সহ্য করতে সক্ষম। যেমন মহাশূন্য থেকে পৃথিবীতে উল্কা- খণ্ড রূপে কিছু বস্তু এখনো মাঝে মাঝে এলেও অধিকাংশ বস্তু আসে সূক্ষ্ম ধূলি কণা রূপে। এর সঙ্গে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি যুক্ত হওয়া অসম্ভব নয়। দেখা যায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকার সময় এরকম সূক্ষ্ম কণা কিছুক্ষণের জন্য ৫০০° সেলসিয়াস পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়। ই-কলাই এর মত সাধারণ ব্যাকটেরিয়াও

এরকম উত্তাপ ২০ সেকেণ্ড পর্যন্ত সহ্য করতে পারে। আর্কিক ব্যাকটেরিয়ার মত বিশেষ ধরনের ব্যাকটেরিয়া তা সহ্য করতে পারে আরো বেশি। অনেক ব্যাকটেরিয়া নিজেকে এক ধরনের সাময়িক নির্জীব বস্তুতে পরিণত করে নিজের চারিদিকে একটি শক্ত আবরণ তৈরি করে– যাকে স্পোর বলা হয়। এই স্পোর অত্যন্ত তাপ নিরোধী বলে এ অবস্থায় জীব অনেক বেশি উত্তাপ সহ্য করতে পারে– মহাশূন্যে বিশ্বময় প্রাণ-বীজ হিসাবে যাদের আদান প্রদান অসম্ভব নয়।

চরমজীবী ব্যাকটেরিয়া

অণুজীব বেঁচে থাকার জন্য যে পরিবেশ এক সময় অপরিহার্য বলে মনে করা হতো এখন কিন্তু তা অপরিহার্য নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর ফলে পৃথিবীর বাইরে আরো অনেক চরম অবস্থাতেও আমাদের পরিচিত কিছু ব্যাকটেরিয়া যে বেঁচে থাকতে পারে সে সম্ভাবনা অনেক বেশি বলে মনে হচ্ছে। মহাশূন্যেই কিছু পরীক্ষা নিরিক্ষার সুযোগ এমন চরমজীবিতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এনে দিয়েছে। এর মধ্যে চাঁদের

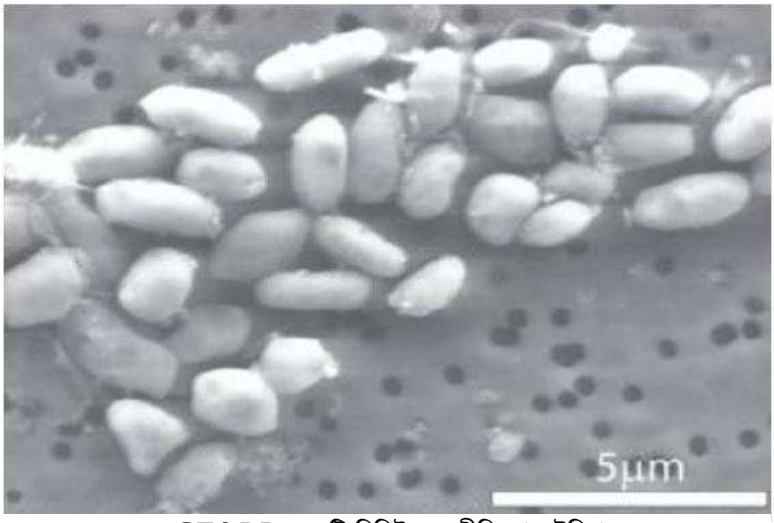

GFAJ-I ঃ একটি বিশিষ্ট চরমজীবি ব্যাকটেরিয়া
(অনুবীক্ষণে ছবি: নিচে ডান কোণে ৫ মাইক্রোমিটার দৈর্ঘ দেখানো)

বুকের একটি চমকপ্রদ ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে সার্ভেয়ারএ-৩ নামে একটি মনুষ্যবিহীন মহাশূন্যযান চাঁদে নেমেছিল। এটি চাঁদের ওশেনাস প্রোমিলারিয়াস নামের একটি জায়গাতে নেমে সেখান থেকে বেশ কিছু ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল। এর আড়াই বছর পর এপলো-১২ এর মহাকাশচারী কনরাড এবং বীন ঠিক ঐ জায়গায় অবতরণ করে সার্ভেয়ারের ফেলে আসা চাঁদের

বুকে এতকাল পড়ে থাকা সেই ক্যামেরাটি কুড়িয়ে নেন। তাঁরা ক্যামেরাটি পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনে এর উপর পরীক্ষা নিরিক্ষা করার সুযোগ করে দেন। তখন বিজ্ঞানীরা এর মধ্যে জীবন্ত স্ট্রেপটোকক্কাস মাইটিস নামক ব্যাকটেরিয়া দেখতে পান। চাঁদে ক্যামেরাটি সংগ্রহ করার সময় এমন সব পূর্ব-সতর্কতা নেয়া হয়েছিল যে বাইরে থেকে এর মধ্যে নূতন করে কোন ব্যাকটেরিয়া ঢুকা সম্ভব ছিলনা, পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার পরেও না। ফলে বুঝা গেল যে ঐ ব্যাকটেরিয়া পৃথিবী থেকেই ক্যামেরার সঙ্গে চাঁদে গিয়েছিল সার্ভেয়ারের উৎক্ষেপনে। সেখানে সম্পূর্ণ ভ্যাকুয়াম বা বায়ুশূন্য অবস্থা, চরম উত্তাপ, বায়ুমণ্ডলের অনুপস্থিতির কারণে বাধাহীন মহাজাগতিক সকল মারাত্মক রশ্মি ও সূর্যের আলট্রা ভায়োলেটের তীব্র বিকিরণ, আর্দ্রতার অনুপস্থিতি– এমন প্রতিকূল সব কিছুর মধ্যে আড়াই বছর এটি বেঁচে থেকেছে। প্রতি মাসে যে বিশাল উত্তাপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একে যেতে হয়েছে এর ফলে এটি হয়তো শীতে জমে শুষ্ক (ফ্রিজ ড্রাইড) হয়ে একটি জীবম্মৃত অবস্থা নিয়েছিল এবং পরে পৃথিবীর অনুকূল পরিবেশে জেগে উঠেছে। চমকপ্রদ ঘটনা হলেও বিজ্ঞানীদের জন্য এটি একেবারে অভাবনীয় ছিলনা। কারণ ইতোমধ্যে পৃথিবীর বহু চরম অবস্থার মধ্যে টিকে থাকা ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন– যেমন আমেরিকার ইয়েলোষ্টোন পার্কে টগবগ করে ফুটন্ত সালফার ভর্তি কাদার মধ্যে, কিংবা গভীর সমুদ্রে আগ্নেয়গিরির কাছে উত্তপ্ত হাইড্রোজেন সালফাইড পরিবেশে।

মহাশূন্যেই আরো বিভিন্ন প্রকার জীব নিয়ে গবেষণা হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। ২০০৭ সালে ইউরোপীয় উদ্যোগে মনুষ্যবিহীন মহাশূন্যযান ফোটন এম-থ্রি বার দিন মহাশূন্যে পৃথিবীর কক্ষে থাকার পর ফিরে এসেছিল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের

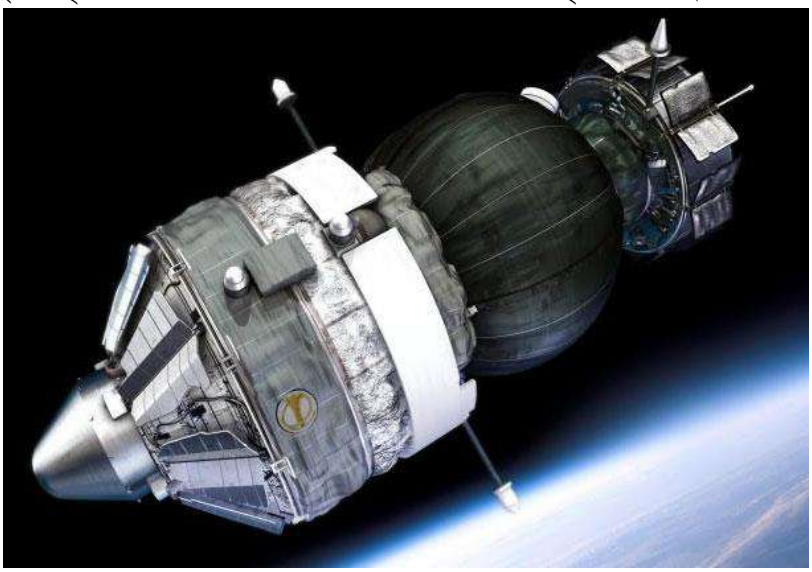

ফোটন-এম-থ্রি মহাশূন্য মিশন
এটি নানা রকম ক্ষুদ্র জীব উন্মুক্ত অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল

সময় তার ঘর্ষণে যাতে অতি উচ্চ উত্তাপে গিয়ে মহাশূন্যযান ধ্বংস হতে না পারে সে জন্য এর বাইরে তাপ নিরোধী বর্ম দেয়া থাকে (যার ক্ষতির কারণে স্পেস শাটল কলম্বিয়া ধ্বংস হয়ে এত প্রাণহানি হয়েছিল)। ফোটন এম-থ্রি এ এই বর্মের সঙ্গে কতগুলো পাথরের পাতলা চাকতি সেঁটে দেয়া হয়েছিল। এর সঙ্গে দিয়ে দেয়া হয়েছিল জীবন্ত কিছু কিছু ক্ষুদ্র জীব এবং অপেক্ষাকৃত কিছুটা বড় জীবও। এতে ছিল সালোক সংশ্লেষণে সক্ষম সিয়ানো ব্যাকটেরিয়া (নীল-সবুজ ব্যাকটেরিয়া), ব্যাকটেরিয়া স্পোর, অন্যান্য কিছু ব্যাকটেরিয়া, লাইকেন নামক ক্ষুদ্র ফাঙ্গাস যা সালোক সংশ্লেষণকারী ব্যাকটারিয়া বা আলজির পারস্পরিক সহযোগিতায় থাকে, এবং টার্ডিগ্রেড নামক ছোট প্রাণি। বার দিন ধরে মহাশূন্যে বায়ুশূন্যতা, ক্ষতিকর বিকিরণ, চরম উত্তাপ তারতম্য, এগুলোতো বটেই তারপর পৃথিবীতে প্রবেশের সময় সরাসরি সেই ভয়ানক উত্তাপের মধ্য দিয়ে এসেও এগুলো সব বেঁচে ছিল। তাতে বোঝা গেল যে চরম পরিস্থিতিতে টেকার সক্ষমতা শুধু এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।

টার্ডিগ্রেড নামের ছোট প্রাণি
মহাশূন্যে উন্মুক্ত ঘুরে এসেও যেটি বেঁচে ছিল

দীর্ঘদিন চরম অবস্থায় বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার একটি কৌশল হলো স্পোর হয়ে যাওয়া– যার মানে নিজ থেকে জীবনের লক্ষণগুলো সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়ে (খুব সম্ভব ফ্রিজ ড্রাইড অবস্থা গ্রহণ করে) বাইরের শক্ত আবরণের সুরক্ষার ভেতরে গভীর নিদ্রায় চলে যাওয়া। ১৯৯৫ সালে কোষ্টারিকায় প্রাচীন বৃক্ষ নি:সৃত হলুদ রঙের অনচ্ছ রজন বা এম্বারের মধ্যে সম্পূর্ণ সীল হয়ে গিয়ে আটকা পড়া একটি মৌমাছির দেহ আবিষ্কৃত হয়েছিল। গবেষণায় দেখা গেছে যে এটি দেড় কোটি থেকে চার কোটি বছর আগে কোন দিন এভাবে এম্বারে আষ্টেপৃষ্ঠে ঢেকে গিয়ে ছিল, সম্পূর্ণ অবিকৃত মরদেহ নিয়ে এখনো হুবহু সেরকমই রয়েছে। এর অন্ত্রের মধ্যে পরীক্ষা করে সেখানে ব্যাকটেরিয়ার স্পোর পাওয়া গেছে

যেগুলোকে পরে পুষ্টি মাধ্যমে দিয়ে সম্পূর্ণ জীবন্ত হিসাবে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঐ এম্বারের অন্যান্য অংশ কিন্তু পুষ্টি মাধ্যমে দিয়ে সেখান থেকে কোন ব্যাকটেরিয়া কালচার করা সম্ভব হয়নি। স্পষ্টত: বুঝা গেছে যে এই ব্যাকটেরিয়া সেই কোটি বছরের পুরানো মৌমাছির অন্ত্রের ভেতর থাকা ব্যাকটেরিয়া। নিজকে স্পোরে পরিণত করে এটি এত বছর ধরে টিকে ছিল, এম্বারের মধ্যে জীবন ধারনের অনুকূল কিছুই না থাকা সত্ত্বেও।

পৃথিবীতে যে রকম প্রাণ, বাইরে সে রকম নাও হতে পারে

ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে সব রকমের জীবের কথা যখন বলি তখন আমাদের চিন্তায় থাকে পৃথিবীতে যেই সব জীব সম্পর্কে আমরা জানি সেগুলো। পৃথিবীর বাইরের কোন রকম কোন জীব এখনো আমাদের অভিজ্ঞতায় আসেনি। কিন্তু সেখানেও যে জীবের সম্ভাবনার কথা আমাদের গবেষণায় আসে তার মৌলিক জীবতাত্ত্বিক ভিত্তিও পৃথিবীর জীবের মত হবে এটিই আমরা ধরে নিই। তাই আমরা নিশ্চিত মনে করি জীব থাকতে হলে সেখানে তরল পানি থাকতে হবে, তার দেহ প্রধানত তৈরি হবে কার্বন ভিত্তিক নানা যৌগ দিয়ে, নানা রকম প্রোটিন হবে তার দেহের গঠন ও নানা দেহ-ক্রিয়ার জন্য দায়ী, ডিএনএ হবে তার জীবন বার্তার বাহক, ইত্যাদি।

আমরা যদি মহাবিশ্বময় প্রাণ-বীজের ধারণা মেনে নিই, তা হলে এমনটিই তো হবার কথা– একই ছাঁদের জীবই মহাবিশ্বের নানা জায়গায় বাসা বেঁধেছে মহাশূন্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বাহিত হয়ে। কিন্তু এমনতো নাও হতে পারে। পৃথিবীর বাইরে প্রথম জীবের সন্ধান আমরা যেদিন পাব, সেদিন হয়তো দেখবো এ জীব আদৌ পৃথিবীর জীবের মত নয়। ভিন্ন মৌলের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে তাদের দেহ, এমনকি তাদের জীবনের বার্তাবহও হয়তো হতে পারে ডিএনএ'র বদলে অন্য কিছু। যে রকম পরিস্থিতিতে যে রকম পরিবেশে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয়েছিল, অন্যত্র হয়তো ভিন্ন পরিবেশে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের প্রাণের সৃষ্টিও হতে পারে। আমরা শুধু তার কিছু কিছু সম্ভাবনা আন্দাজ করতে পারি, সত্যি সত্যি জীব খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এ প্রশ্নের সুরাহা হবেনা।

এই সেদিন ২০১০ সালের একেবারে শেষের দিকে পৃথিবীতেই একটি চমকপ্রদ আবিষ্কার ঘটেছে যাতে ভিন্ন রাসায়নিক গঠনের জীবের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়েছে। একটি চরমজীবি ব্যাকটেরিয়ার দেহের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অণুতে ফসফরাসের পরমাণুগুলো আংশিক ক্ষেত্রে আর্সেনিকের দ্বারা বদলে দেবার একটি প্রক্রিয়া সম্ভব হয়েছে। স্বাভাবিক ফসফরাসের বদলে অস্বাভাবিক আর্সেনিকের সহযোগে গঠিত

দেহ গঠন নিয়েও ঐ ব্যাকটেরিয়া যথারীতি তার ব্যাকটেরিয়ার জৈব গুণগুলো বজায় রেখেছে। এতে কিছুটা প্রমাণ হয়েছে আমাদের পরিচিত জৈব রাসায়নিক ব্যবস্থার বাইরেও জীবন সম্ভব হতে পারে।

এরকম একটি ভিন্ন ব্যবস্থা হতে পারে কার্বনের উপর ভিত্তি না করে, সিলিকনের ভিত্তিতে জীব গড়ে উঠা। পৃথিবীতে সব জীবের জৈব অণুগুলোর প্রায় সবই কার্বন যৌগ। এটি মহাবিশ্বের সব চেয়ে প্রচুর থাকা মৌলগুলোর একটি, যা অন্যান্য বহু রকম মৌলের সঙ্গে সহজে রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। রাসায়নিক যৌগ গঠনের ক্ষেত্রে কার্বন বেশি বৈচিত্র দেখাতে পারে, জৈব অণুর অংশ হিসাবে অনেক রকমের কার্যকর পরমাণু-দল গঠন করতে পারে। তাই জীবের গঠন সঙ্গে কার্বন-যৌগের রসায়ন প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কার্বনের এরকম বেশ কিছু গুণ সিলিকনেরও কিছুটা রয়েছে। সিলিকনের প্রাচুর্যও খুবই বেশি। এও অন্যান্য পরমাণুর সঙ্গে সহজ বন্ধন নিতে পারে, তবে কার্বনের মত এতটা বেশি নয় বা এতটা বৈচিত্রময় ভাবে নয়। পৃথিবীর সব জীবের অণুগুলোতে কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও সালফার এই কয়টি মৌলই সাধারণ ঘুরেফিরে থেকে নানা কার্যকর দল গঠন করে। এর সঙ্গে অবশ্য থাকে কয়েকটি ধাতুর মৌল– প্রধানত লোহা, ম্যাগনেশিয়াম ও দস্তা। মহাবিশ্বের অন্যত্র অন্য রকম জীবে এগুলোকেই যে সব ক্ষেত্রে থাকতে হবে এমন কি কথা আছে?

এই রকম ভিন্ন রাসায়নিক প্রকৃতির জীবের কথা কল্পনা করে বিজ্ঞানীরা সৌর জগতে এবং আরো দূরে এমন এমন জায়গায় জীবের সম্ভাবনা দেখছেন যেখানে পৃথিবীর মত জীব সম্ভব নয়। বৃহস্পতির উপগ্রহ টাইটান যেখানে পানি নেই কিন্তু কয়েক রকমের হাইড্রোকার্বনের প্রাচুর্য রয়েছে, এমনি একটি সম্ভাবনার জায়গা। তাছাড়া আজকাল দূর তারার যে সব বড় বড় গ্রহ অনেক সংখ্যায় আবিষ্কৃত হচ্ছে সেগুলো গ্যাসে গড়া সেখানকার গ্যাসের মধ্যে ভাসমান এমন জীবের আন্দাজ করা হচ্ছে যেগুলো হয়তো প্রধানত হাইড্রোজেনে গঠিত, এবং সে কারণে হালকা বলে ঐ গ্যাসের মধ্যে বিপুল সংখ্যায় ভাসমান থাকতে পারে। অবশ্য এর সবই নানা বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার ভিত্তিতে এখনো নেহাতই আন্দাজ মাত্র।

কিন্তু এ সম্পর্কিত গবেষণা ও সম্ভাব্যতা যাচাই আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে। এ কথা অবশ্য ঠিক যে পৃথিবী ছাড়িয়ে যদি আমরা বিস্তৃত হতে চাই তা হলে পৃথিবীর বাইরে যেখানে যাব সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই। বর্তমানে কোন ধরনের কোন জীব না থাকলেও আমরা হয়তো নিজেদের বসবাসের অনুকূল পরিস্থিতি সেখানে সৃষ্টি করে নিতে পারবো। কিন্তু যদি ইতোমধ্যে সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব থাকে, হোক না সে ব্যাকটেরিয়ার মত ক্ষুদ্র জীব, এমন কি পৃথিবীর

থেকে ভিন্ন ছাঁদের জীব, তা হলে সেখানে আমাদের বসবাসের অনুকূল পরিবেশ পাওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানি বেড়ে যাবে। তাছাড়া পৃথিবীর বাইরে জীবের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের বৈজ্ঞানিক কৌতুহলও অপরসীম। সৌর জগতের অন্যান্য জায়গায়তো বটেই, অনেক দূরে অন্য তারার যে অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহ রয়েছে সেখানেও জীবনের অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণা করতে আমাদের উৎসাহের কমতি নেই। বিষয়টি এখন এত গুরুত্ব পাচ্ছে যে এটি বিজ্ঞানের একটি আলাদা শাখাতেই পরিণত হয়েছে, যার নাম এ্যাষ্ট্রোবায়োলজি অর্থাৎ জ্যোতির্জীব বিজ্ঞান।

উচ্চতর জীব, বুদ্ধিমান প্রাণি

বিশ্বময় প্রাণের সন্ধানে কোথাও কোথাও ব্যাকটেরিয়া ধরণের ক্ষুদ্র জীব যে থাকতে পারে সেটি একেবারে প্রতিষ্ঠিত বিষয় না হলেও তার পক্ষে কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু এর থেকে উন্নত জীব, যেমন বহুকোষী জীবের অস্তিত্ব সম্পর্কে এতটুকু আলামতও এখানো কোথাও দেখা যায়নি। ব্যাকটেরিয়া জাতীয় জীব আদিতে থাকলে তার বিবর্তনের মাধ্যমে আরো জটিল ও উন্নত জীব সৃষ্টি হবার কথা। পৃথিবীর জীব বিবর্তনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অন্যত্রও তাই উদ্ভিদ, ফাঙ্গাস, প্রাণি ইত্যাদির অস্তিত্ব আশা করতে পারি, এমনকি আমাদের মত বুদ্ধিমান প্রাণিও। তবে উন্নত জীব হওয়ার দিক থেকে এগুলো যে পৃথিবীর মতই হতে হবে এমন কথা নেই। কোথাও বিবর্তন সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে এগুতে পারে, কোথাও বুদ্ধির অভিযাত্রায় পৃথিবী থেকে অনেক পিছিয়ে থাকতে পারে, আবার কোথাও অনেক এগিয়েও থাকতে পারে– এমনকি মানুষের থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান ও উন্নত সভ্যতার অধিকারী সেখানে থাকতে পারে। তবে এই সমস্ত কিছু নেহাৎ যুক্তিনির্ভর চিন্তা মাত্র, এর সপক্ষে এখনো বিন্দুমাত্র কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নাই। তাছাড়া যে সম্ভাবনার কথা আমরা বলছি তা শুধু সৌর জগতের বাইরে দূরবর্তী তারাগুলোর বসবাসযোগ্য গ্রহ-উপগ্রহের জন্যই প্রযোজ্য। সৌর জগৎ সম্বন্ধে আমাদের এখন এমন যথেষ্ট তথ্য উপাত্ত রয়েছে যে সেখানে আদৌ কোন জীব থাকলেও তা ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়ার থেকে উন্নত হবার সম্ভাবনা এখানে কম। কিন্তু সৌর জগতের বাইরের বিশ্বে আমাদের মত বা তার থেকেও অগ্রসর প্রাণি ও তাদের সভ্যতার অস্তিত্ব সম্পর্ক বিজ্ঞানীরা আশাবাদী। ওখানে সম্ভাব্য গ্রহ-উপগ্রহের সংখ্যা ও তাদের বৈচিত্র অসংখ্য, তাই সম্ভাবনাও অনেক। ওখানকার সম্পর্কে জানতে আমাদের এখনো অনেক বাকি। অনেক বিজ্ঞানী তাই ওখানে বুদ্ধিমান প্রাণির অস্তিত্ব আশা করে তাদেরকে উদ্ঘাটনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এমনটি ধরে নেয়ার ব্যাপারে অবশ্য সবাই একমত নন। এ সম্পর্কে আশাবাদী বিজ্ঞানীদের অনেকে গত ৫০ বছর ধরে এক ধরনের গবেষণায় ব্যস্ত আছেন যাকে বলা হয় 'পৃথিবীর বাইরে বুদ্ধিমান প্রাণের অনুসন্ধান' (সার্চ ফর এক্সট্রা টেরেসট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা সংক্ষেপে SETI)। এই গবেষণায় ধরে নেয়া হচ্ছে যে ঐ বুদ্ধিমান প্রাণিদেরও আমাদের মত বা তার থেকে অগ্রসর রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে, এবং তারা অন্যান্য তারাদের জগৎ লক্ষ্য করে রেডিও সিগন্যাল পাঠিয়ে থাকে। এভাবে ইচ্ছে করে পাঠানো কৃত্রিম সিগন্যালকে অন্য প্রাকৃতিক সিগন্যালের থেকে আলাদা ভাবে চেনা যায়। সেই ভরসায় SETI'র বিজ্ঞানীরা শক্তিশালী রেডিও টেলিস্কোপ ও অতি সংবেদনশীল সিগন্যাল গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে দিনের পর দিন এরকম বেতার তরঙ্গের অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। দিন দিন এই ব্যাপারে তাঁদের সক্ষমতা বাড়ছে, এবং তাঁরা আশা করছেন যে কোন দিন সেই সুসংবাদটি আসবে, আমরা পৃথিবীর বাইরের প্রথম বুদ্ধিমান প্রাণির খোঁজ পাব। এই গবেষণা সম্পর্কে প্রচেষ্টাগুলোকে আমরা আরো বিস্তারিত ভাবে এই বইয়ের শেষ দিকে দেখবো।

সৌর জগৎ সমীক্ষা

আপাতত সৌর জগতই লক্ষ্য

পুরো মহাবিশ্বটাই বহুদিন যাবত আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার অন্তর্ভূক্ত, এবং ইতোমধ্যে মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অভাবনীয় রকম এগিয়ে গেছে। কিন্তু আমরা যখন পৃথিবীর বাইরে বসবাসের কথা চিন্তা করি, এবং পৃথিবীর বাইরে জীবের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ পরীক্ষা নিরিক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে চাই, তখন আপাতত আমাদের গবেষণা ও পদক্ষেপগুলোকে সৌর জগতের উপরেই বিশেষভাবে নিবদ্ধ রাখতে হচ্ছে। এর কারণগুলো খুব স্পষ্ট। সৌরজগতের অনেকটা তুলনামূলকভাবে আমাদের কাছাকাছি রয়েছে। সেই ১৬০০ শতকের প্রথম দিকে গ্যালিলিওর আমল থেকেই আমরা এখানকার গ্রহ-উপগ্রহগুলোকে দূরবীণ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছি, এমন কি এদের অনেকগুলোর মধ্যে উঁচু-নীচু, খাদ, পাহাড় ইত্যাদি যে সব নানা বিচিত্র অঞ্চল রয়েছে তার বিভিন্নটার নামকরণ করে রীতিমত মানচিত্রও তৈরি করতে পেরেছি।

সেই থেকে এগুলো আমাদের তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি জানা জায়গা। তারপর সাম্প্রতিককালে এসে তো আমাদের মহাশূন্যযানগুলো সৌর জগতের নানা গ্রহ-উপগ্রহের একেবারে কাছে গিয়ে নানা তথ্য পাঠিয়েছে, ছবি পাঠিয়েছে, বেশ কয়েকটিতে সরজমিনে অবতরণ করে রীতিমত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরিক্ষা চালিয়েছে। অবশ্য চাঁদে সশরীরে নিজেরা যাওয়া বাদ দিলে বাকি সবগুলো অভিযান মনুষ্যবিহীন মহাশূন্যযানে ঘটেছে। এগুলোর অধিকাংশ আমাদের বর্তমান মহাশূন্যযানে কয়েক মাসের বা বড় জোর কয়েক বছরের ভ্রমণে পৌঁছার মত দূরত্বের মধ্যে রয়েছে। কাজেই এদিক থেকেও সৌর জগতই শুধু আপাতত আমাদের আওতার মধ্যে রয়েছে বলে মনে করা যায়। এর বাইরের কথা চিন্তা করলে, অর্থাৎ একেবারে নিকটতম অন্য তারার গ্রহের কথা চিন্তা করলেও আমাদের জ্ঞানের পরিধি তো অনেক কমে যায় বটেই, সেখানে যাওয়ার সম্ভাবনাও অনেক ক্ষীণ হয়ে আসে শুধু মাত্র দূরত্বের ও ভ্রমণের সময়ের কথাটি বিবেচনায়। আমাদের যাওয়ার জন্য বসত করার জন্য আপাতত সৌর জগতই যখন লক্ষ্য তখন সৌর জগতে কোন্ গ্রহ-উপগ্রহ কী পরিস্থিতিতে রয়েছে এ সম্পর্কে খোঁজ খবর করা আমাদের জন্য জরুরী বৈ কি।

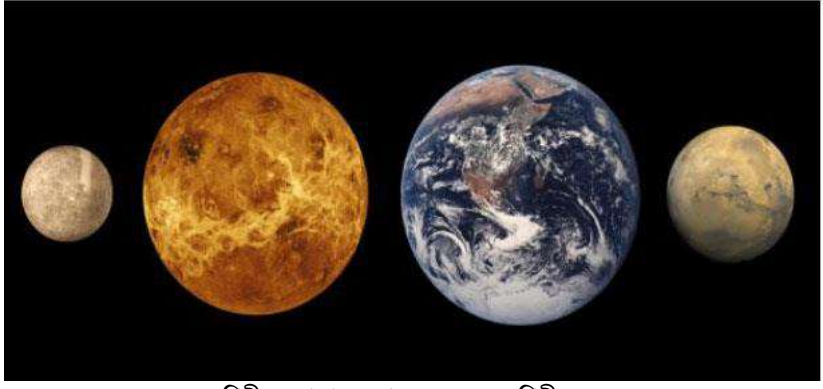

পৃথিবী-সদৃশ গ্রহগুলোঃ বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল
(বাম থেকে যথাক্রমে)

সৌর জগৎ সম্পর্কে সর্বাধুনিক তথ্যগুলো আমরা নানা ভাবে পাচ্ছি। মহাশূন্যযানে বাহিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে গ্রহ-উপগ্রহের পৃষ্ঠদেশ ও বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে অনেক ঘনিষ্ঠ অনুসন্ধান সম্ভব হয়েছে। এদের অভ্যন্তরের অবস্থা অনেকখানি আঁচ করা সম্ভব হয়েছে পৃষ্ঠদেশের পরিস্থিতি থেকে। তবে পৃথিবীর ক্ষেত্রে যেমনটি করা হয়েছে, অভ্যন্তর সম্পর্কে জানার প্রধান উপায় হলো কৃত্রিম ভূকম্পন তরঙ্গ এর মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে তার প্রতিফলনগুলো লক্ষ্য করে। এ তরঙ্গের গতি-প্রকৃতি যে মাধ্যমের ভেতর দিয়ে এটি যাচ্ছে সেগুলোর নানা স্তরের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে বলে এভাবে আমরা জানতে পারি ভেতরে বস্তু-স্তরগুলো কী অবস্থায় রয়েছে। অন্য যেখানে সম্ভব হয়েছে একই পদ্ধতি কিছুটা অনুসরণ করা হয়েছে, যেমন চাঁদের ক্ষেত্রে। অভ্যন্তর সম্পর্কে জানার অন্য আধুনিক পদ্ধতি হলো কম্পিউটার মডেলিং। পদার্থবিদ্যা ও ভূতাত্ত্বিক নিয়মগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত গাণিতিক মডেলে জানা উপাত্তগুলো দিয়ে উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করা হয় অভ্যন্তরে কী ঘটনা ঘটছে। পৃথিবীর মত অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

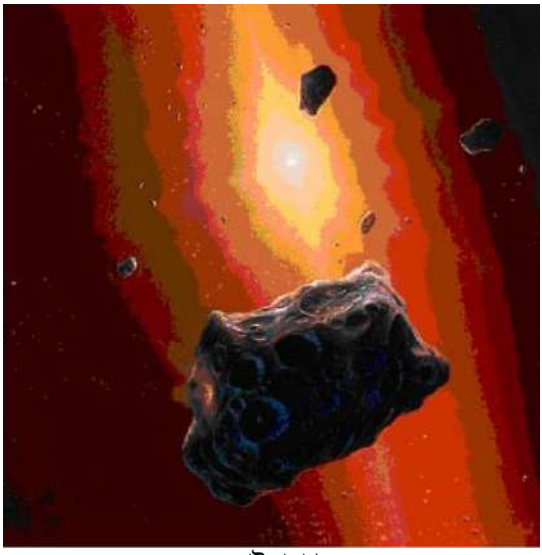

ছোট গ্রহাণু

মোটা হিসাবে সৌর জগতের গ্রহগুলোকে দুটি দলে ভাগ করা যায়। একটি দল হলো সূর্য থেকে বেশি দূরের গ্রহ বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুনকে নিয়ে। এদের বলা হয় প্রকাণ্ড গ্যাসীয় গ্রহের দল। এদের মধ্যে বৃহস্পতি সব চেয়ে প্রকাণ্ড, বাকিগুলোও নেহাৎ কম নয়। এরা আগাগোড়া খুব কম ঘনত্বের বস্তু দিয়ে গড়া, প্রায়

পুরোটাই গ্যাসীয় অবস্থায় রয়েছে। অন্য দলটি হলো সূর্যের অপেক্ষাকৃত কাছের চারটি গ্রহ নিয়ে বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল। এগুলোকে বলা হয় পৃথিবী-সদৃশ গ্রহ, কারণ বহু দিক থেকে এদের গঠন পৃথিবীর মত। অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট এই গ্রহগুলোর ঘনত্ব খুব বেশি– কঠিন পাথুরে বস্তুতে গড়া এরা। গ্রহ না হওয়া ও সূর্যের থেকে সবক্ষেত্রে এরকম কাছের দূরত্বে না থাকা সত্ত্বেও সৌর জগতের আরো কয়েকটি সদস্যকে আমরা এই পৃথিবী-সদৃশদের দলে অন্তর্ভূক্ত করতে পারি, তাদের গঠনের ও আকারের মিলের কারণে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখ করা যায় পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ এবং বৃহস্পতির উপগ্রহ ইয়ো ও ইউরোপাকে। স্বাভাবিক ভাবেই সৌরজগতের সমীক্ষায় আমাদের বিশেষ নজর রাখবে এই পৃথিবী-সদৃশদের উপর। পৃথিবীতে যেমন অণুজীব রয়েছে তার সদৃশ জীব থাকতে হলে, বা আমাদের নিজেদের বসত স্থাপনের উপযুক্ত হতে হলে, এগুলোরই কিছু সম্ভাবনা রয়েছে।

মঙ্গলের পৃষ্ঠে লোহার গঠিত উল্কাখণ্ড

সৌর জগতের আরেক ধরনের সদস্যকে আমরা আলোচনা থেকে বাদ দিতে পারিনা– সেগুলো হলো গ্রহাণু। নিজেদের খুব ছোট আয়তনের কারণে এদেরকে গ্রহের পর্যায়ে গণ্য করা যায়না, কিন্তু এগুলোও সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণ করে গ্রহের মতই। ছোট- খাট পাথর খণ্ডের মত সাইজ থেকে শুরু করে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত ব্যাসার্ধের অনেক গ্রহাণু রয়েছে। সব চেয়ে বড়টির ব্যাসার্দ্ধ ৪৫৭ কিলোমিটার। মঙ্গল আর বৃহস্পতির কক্ষপথের মাঝামাঝি কাছাকাছি অনেক গ্রহাণুর কক্ষপথ রয়েছে– যা একটি গ্রহাণু বলয় গঠন করে রেখেছে।

ধূমকেতুর লেজ

এ সব গ্রহাণু সম্পর্কে আমরা গ্রহ থেকে অনেক কম জানি। গ্রহাণু বলয়ের মধ্যে বা তার চেয়ে সূর্যের বেশি কাছে থাকা গ্রহাণুগুলো কঠিন পাথুরে বস্তুতে তৈরি– পৃথিবী-সদৃশদের মত। এদের মধ্যে কোন কোনটি কক্ষচ্যুত হয়ে মাঝে মাঝে পৃথিবী অথবা অন্য কোন গ্রহ বা উপগ্রহের গায়ের উপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেগুলোকে আমরা উল্কা বলি। গ্রহগুলো এবং গ্রহাণুগুলোর কক্ষপথ সবই মোটামুটি সমকেন্দ্রিক হলেও তাদের সঙ্গে তেরচা কক্ষপথে অনেক বেশি লম্বাটে উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে সৌরজগতের অন্য ধরনের কিছু সদস্য ধূমকেতু। ধূমকেতুর রয়েছে একটি কেন্দ্রীয় ঘন কঠিন অংশ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেটি কয়েক কিলোমিটার ব্যাসার্দ্ধের বেশি বড় নয়। এর উপরে রয়েছে হালকা গ্যাস ও ধূলা। সূর্যের আলো ধূলায় বিক্ষিপ্ত হয়ে এই বিশাল লেজটি ভাল দেখা যায় বলে এ সময় আমরা ধূমকেতুকে দেখতে পাই কোন কোন ক্ষেত্রে খালি চোখেও। উল্কার মত ধূমকেতুও কখনো কখনো কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীর উপর এসে পড়লেও আজকাল এমন ঘটনা বিরল।

গ্রহের ভেতর বাহির

পৃথিবী-সদৃশ গ্রহগুলো যখন সৃষ্টি হচ্ছিল তখন তাদের সঙ্গে চলছিল গ্রহের মত হয়ে উঠার প্রক্রিয়ায় থাকা অন্যান্য বস্তু খণ্ডের প্রচণ্ড সংঘর্ষ। তাছাড়াও এদের উপর চলছিল অবিরাম উল্কা ও ধূমকেতু আছড়ে পড়ার আঘাত। এ সবের ফলে এখন গ্রহের উপরিভাগ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে পড়েছিল এবং সে উত্তাপে এক সময় এর পুরোটাই গলিত রূপে চলে গিয়েছিল। এ অবস্থায় ধীরে ধীরে ভারী ধাতুগুলো বিশেষ করে লোহা গ্রহের একেবারে কেন্দ্রে গিয়ে জমেছে এবং অন্যান্য সব জিনিসগুলোও যার যার ভার অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়ে পুরো গ্রহে নানা স্তর বিন্যাস ঘটেছে। পৃথিবীর ক্ষেত্রে আমরা যেমন জানি একেবারে কেন্দ্রে অন্তস্থ কোর, তারপর বহিস্থ কোর, তারপর ম্যান্টল, তারপর ক্রাষ্ট (ভূত্বক) তেমনি পৃথিবী-সদৃশ অন্যান্য গ্রহেও স্তর বিন্যাস ঘটেছে। এর মধ্যে চাপ ও তাপের পারস্পরিক গুরুত্ব অনুযায়ী কোন স্তর কঠিন থেকেছে, কোন স্তর থেকেছে তরল, চটচটে, প্রবাহিত হবার মত। গ্রহের সার্বিক অবস্থা নির্ধারণে এসবের ভূমিকা অনেক।

পৃথিবী-সদৃশ কঠিন গ্রহ-উপগ্রহের পৃষ্ঠদেশের অনেকখানিই গড়ে উঠেছে অভ্যন্তরের সেই তরল চটচটে অংশের প্রভাবে, সেখানে আগ্নেয় সক্রিয়তার ফলে। আবার আরো অনেকখানি গড়ে উঠেছে তার উপর উল্কা, গ্রহাণু, ধূমকেতু ইত্যাদির ক্রমাগত আঘাতের ফলে যে বিশাল খাদ বা গর্ত ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে। এসব খাদের নিজস্ব এমন কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে যে তাদেরকে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের খাদ

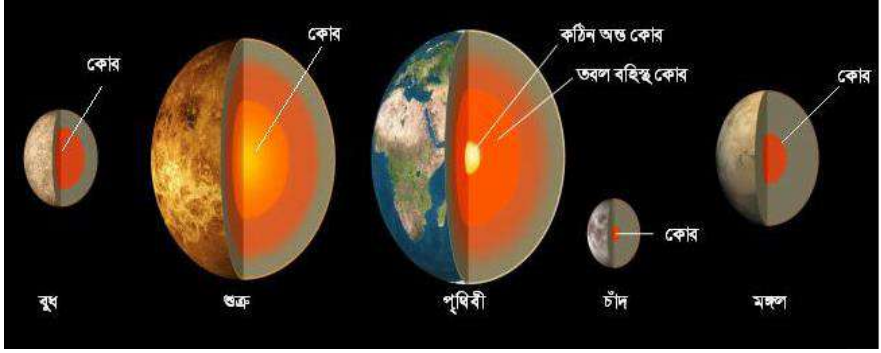

পৃথিবী-সদৃশ গ্রহগুলোর অভ্যন্তর

থেকে আলাদা ভাবে চেনা যায়। দূর থেকেও দূরবীক্ষণে বা মহাশূন্যযান থেকে তোলা ছবিতেও এ বৈশিষ্টগুলো বিশ্লেষণ করা যায়। তাদের আকার আকৃতি থেকে গ্রহের সুদূর অতীতের ইতিহাস জানতে পারা যায়। তবে পৃথিবী, মঙ্গল এ রকম কয়েকটি গ্রহের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরের আগ্নেয় সক্রিয়তায় ভূত্বকের যে ক্রমাগত নড়াচড়া ও পরিবর্তন ঘটেছে তাতে অপেক্ষাকৃত ছোট উল্কা-সৃষ্ট খাদগুলো মুছে গেছে। কিন্তু চাঁদের মত জায়গায় আভ্যন্তরীণ সক্রিয়তার অভাবে তা হয়নি, সব খাদগুলো সেখানে স্থায়ী হয়ে রয়ে গেছে। এক এক জায়গায় আকার অনুযায়ী খাদগুলো কী ভাবে বন্টিত রয়েছে তার সংখ্যাতত্ত্ব থেকে ঐ জায়গার পৃষ্ঠদেশের তুলনামূলক বয়স নির্ণয় করা যায়। অপেক্ষাকৃত নূতন অঞ্চলে খাদগুলো অবিকৃত থাকবে, পুরানো অঞ্চলে নূতন খাদ এসে পুরানো খাদের বন্টনকে বদলে দেয়। চাঁদে কোন খাদ মুছে যায়না বলে, চাঁদের পৃষ্ঠে খাদের বন্টনকে এই ব্যাপারে পরিমাপের মাপকাঠি (ক্যালিব্রেশন) হিসাবে ব্যবহার করা যায়। চাঁদের বুকে যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে ওখানকার পৃষ্ঠের বয়স অন্যভাবে তেজস্ক্রিয় অবক্ষয়ের মাধ্যমে আমরা নির্ণয় করতে পেরেছি, যেমন ভাবে পৃথিবীর ক্ষেত্রে পেরেছি। এই নির্ণিত বয়সের সঙ্গে খাদের বন্টনের প্রকৃতি মিলিয়ে আমরা এই মাপকাঠি পেয়ে যাই। এরপর অন্য গ্রহ-উপগ্রহে যেখানে ওভাবে তেজস্ক্রিয়তা মাপা সম্ভব হয়নি, সেখানেও দূর থেকে খাদের বন্টন দেখে এবং চাঁদের সঙ্গে তার তুলনা করে আমরা ঐ জায়গার পৃষ্ঠদেশের বয়স হিসেব করে বের করতে পারছি। পৃষ্ঠদেশের বয়স অনেকটা আবার নির্ভর করে অভ্যন্তরে আগ্নেয় সক্রিয়তার উপর।

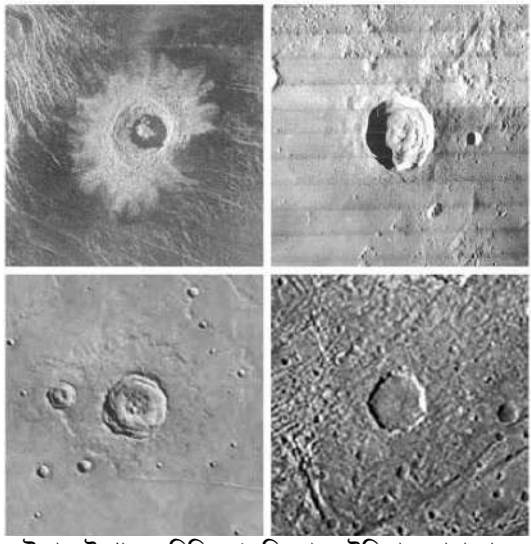

উল্কা-সৃষ্ট খাদের বিভিন্ন প্রকৃতি থেকে ইতিহাস জানা যায়

গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে যেগুলো অপেক্ষাকৃত বেশি ছোট, আর

নানা গ্রহাণু উল্কাখণ্ড ইত্যাদি সৌরজগতের খুব ছোট অংশগুলো, এগুলো সর্বাংশে শুধু পাথুরে জিনিস দিয়ে তৈরি। এগুলোর উপরে কোন বায়বীয় আবরণের লেশমাত্র নাই। আর অন্যদিকে প্রকাণ্ড গ্রহগুলো– বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন কেন্দ্রীয় কিছু পাথুরে অংশ ছাড়া আগাগোড়াই গ্যাসের গোলক বই নয়। ঐ পুরো গ্যাসীয় গোলকের উপাদান শুধুই হালকা হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম। আভ্যন্তরীণ কিছু তরল অংশ সহ পাথুরে কঠিন অবয়বের পৃথিবী-সদৃশ ও পৃথিবীর কাছাকাছি আকারের গ্রহগুলোর ক্ষেত্রেই শুধু বায়ুমণ্ডলের প্রশ্ন উঠে। এর মধ্যে শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব যথেষ্ট। শুক্রের ক্ষেত্রে এর চাপ পৃথিবীর থেকে ৯০ গুণ বেশি। মঙ্গলের ক্ষেত্রে অবশ্য বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর থেকে অনেক কম। সৌর জগতে নানা গ্রহের সব উপগ্রহের মধ্যে একমাত্র শনির একটি উপগ্রহ টাইটানেই যথেষ্ট ঘন বায়ুমণ্ডল রয়েছে। এ সব বায়ুমণ্ডলের গঠন অবশ্য এক এক ক্ষেত্রে এক রকম। তাছাড়া আদি থেকে এই গঠন ক্রমাগত পরিবর্তিতও হয়েছে। বিভিন্ন গ্রহের বায়ুমণ্ডলের গঠনের বিস্তারিত আমরা একটু পরে জানবো।

অভ্যন্তরে তাপের উৎস

অদ্ভুত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো সব গ্রহ-উপগ্রহের অভ্যন্তরের উত্তাপ তার পৃষ্ঠদেশের উত্তাপের চেয়ে বেশি। এই উত্তাপ এদের সৃষ্টির কাল থেকেই অভ্যন্তরে রয়েছে। ভেতরের তাপ একটু একটু করে বাইরে বাহিত হয়ে এসে হারিয়েও গেছে, এখানো যাচ্ছে। একই সঙ্গে নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে অভ্যন্তরে নূতন তাপ সৃষ্টিও হচ্ছে। পৃষ্ঠদেশে এভাবে যে তাপ ভেতর থেকে আসছে, আর যা সূর্যের বিকিরণ থেকে অর্থাৎ বাইরে থেকে আসছে, এই উভয়ের অবদানে পৃষ্ঠদেশ তার তাপ পায়। এই মোট তাপের কিছুটা আবার পৃষ্ঠদেশ থেকে বিকিরণের মাধ্যমে হারিয়ে যাচ্ছে। এসবের যোগ বিয়োগের ফলেই ঠিক হয় পৃষ্ঠদেশের প্রকৃত উত্তাপ। একটি গ্রহের গা কত গরম তা জানতে ভেতরের ঐ উত্তাপের উৎস, ভেতর থেকে তাপের বাইরে আসার প্রকৃতি ও হার –এসব জানাটি জরুরী।

প্রথমে গ্রহ-উপগ্রহগুলোর অভ্যন্তরে তাপের উৎসগুলো দেখা যাক। গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টিকালে ও শৈশবে এদের মধ্যে উত্তাপ সৃষ্টির দুটি প্রধান উৎস ছিল। এর একটি হলো বড় বড় উল্কা ইত্যাদির সঙ্গে এদের সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে এত উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছিল যে তাতে পুরো গ্রহ বা উপগ্রহ গলে গিয়েছিল। এরপর উপরের অংশ দ্রুত ঠান্ডা হয়ে পড়লেও ভেতরের অংশে ঐ উত্তাপ কিন্তু রয়েই গেছে। বরং উপরের পাথুরে অংশ কঠিন আবরণ গঠন করে তাপের অন্তরকের কাজ করেছে। তাই এটি ভেতরের উত্তাপকে অনেকাংশে ভেতরে রেখে দিতে সাহায্য করেছে। ঐ যে সংঘর্ষের

ফলে গ্রহ গলে গিয়েছিল তার ফলেই দেখা দিয়েছে উত্তাপের ঐতিহাসিক অন্য উৎসটি। গলন্ত অবস্থায় সব চেয়ে ভারী অংশটি একেবারে কেন্দ্রে চলে গিয়েছে, তার চেয়ে কম ভারি অংশ তার উপরে, তারো কম ভারি অংশ আরো উপরে। এভাবে গ্রহ-উপগ্রহে কমবেশি স্তরায়নের সৃষ্টি হয়েছে। ভেতরের স্তরগুলো আবার তাপ ও চাপের আনুপাতিক আধিক্যের উপর নির্ভর করে কোথাও কঠিন আর কোথাও তরল রূপ ধারণ করেছে। শুরুতে সম ঘনত্বে বন্টিত একটি জিনিস কখনো যদি ঘনত্ব অনুযায়ী নানা স্তরে স্তরে বিভক্ত হয়, তখন তাতে কিছু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি চলৎ শক্তিতে অর্থাৎ তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এও অতীতে আভ্যন্তরীণ তাপের একটি উৎস হিসেবে কাজ করেছিল।

মহাবিশ্বের ছড়িয়ে থাকা বস্তু উপাদান থেকে তারা ও গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টির সময় বিভিন্ন মৌলের সঙ্গে কিছু কিছু তেজস্ক্রিয় মৌলও এগুলোর মধ্যে চলে এসেছিল। কিছু কিছু মৌলের সাধারণ রূপের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় রূপ থাকে যাকে বলা হয় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। এদের পরমাণুকেন্দ্র নিউক্লিয়াস একটু একটু করে ভেঙ্গে গিয়ে একটি নির্দিষ্ট হারে সব সময় বিকিরণ করছে আলফা কণিকা, বিটা কণিকা আর গামা রশ্মি। এদের সবাই শক্তি বহন করে যা গ্রহের অভ্যন্তরকে উত্তপ্ত করে তুলতে পারে। এরকম কিছু তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের এমন অবক্ষয়ের হার খুব দ্রুত। কাজেই এদের আয়ুষ্কাল কম, এক সময় এদের সবই তেজস্ক্রিয়তা হারিয়ে অন্য মৌলে পরিণত হয়েছে এবং ওভাবে উত্তাপ উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু আবার অন্য কিছু তেজস্ক্রিয় মৌল রয়েছে যাদের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ, পরিমাণও বেশি। এগুলো থেকে তেজস্ক্রিয়তার ফলে তাপ উৎপাদনের প্রক্রিয়া এখনো চলছে। অপেক্ষাকৃত বড় গ্রহ পৃথিবী ও শুক্রে এরকম দীর্ঘ আয়ুষ্কাল সম্পন্ন তেজস্ক্রিয় বস্তু প্রচুর ছিল এবং এখনো রয়েছে, তাই এভাবে তাপ উৎপাদন এখানে বজায় রয়েছে। অন্য দিকে বুধ, মঙ্গল এগুলো ছোট বলে তেজস্ক্রিয় বস্তুর পরিমাণও কম ছিল। তাই অতীতে ওভাবে প্রচুর তাপ তৈরি হলেও এখন তেজস্ক্রিয় বস্তুর পরিমাণ কমে যাওয়াতে এভাবে তাপ এখানে আর তৈরি হচ্ছেনা।

কোন কোন গ্রহ-উপগ্রহের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ তাপ সৃষ্টির আর একটি চমকপ্রদ উৎস প্রধান হয়ে উঠেছে– সেটিকে বলা যায় জোয়ার ভাটার সৃষ্ট তাপ। এটি জোয়ার ভাটাতে নেহাৎ পানি উঠা-নামার ব্যাপার নয়, বরং গ্রহ বা উপগ্রহের নিজের কঠিন দেহ অন্যের মাধ্যাকর্ষণে ফুলে উঠা বা নেমে যাবার ব্যাপারও। পৃথিবীতেও এটি ঘটে– চাঁদের আকর্ষণে জোয়ারে পানি যেমন ফুলে উঠে তেমনি স্থল ভাগও ফুলে বিকৃত হয়। পৃথিবীর ক্ষেত্রে এ ভাবে স্থলের পৃষ্ঠদেশ ১০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বিকৃত হতে পারে। একই প্রক্রিয়ায় কোন গ্রহ বা উপগ্রহ অন্যের আকর্ষণে বার বার বিভিন্ন

দিকে বিকৃত হতে হতে ঐ মোচড়ামুচড়ির কারণে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এই উত্তাপ খুব সম্ভব ক্রাষ্ট এবং ম্যান্টলের উপরিভাগেই সৃষ্টি হয়ে সেখান থেকে অন্যান্য অংশে বিস্তৃত হয়। পৃথিবীর ক্ষেত্রে তেজষ্ক্রিয়তার সৃষ্ট উত্তাপ তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি বলে এখানে জোয়ার ভাটার সৃষ্ট উত্তাপের গুরুত্ব কম। তেজষ্ক্রিয়তার সৃষ্ট উত্তাপের এক শতাংশ থেকে এক দশমাংশের বেশি এটি নয়। তবে বৃহস্পতি ও শনির উপগ্রহগুলোর ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেগুলোর কয়েকটির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ব্যাপারটি আরো বিশদভাবে দেখবো।

বর্তমানে গ্রহ-উপগ্রহের অভ্যন্তরে তাপ সৃষ্টির প্রধান উৎস এই দুটিই– দীর্ঘ আয়ুষ্কাল সম্পন্ন তেজষ্ক্রিয় বস্তুর অবক্ষয়ে সৃষ্ট, এবং জোয়ার ভাটার বিকৃতিতে সৃষ্ট। অতীতে অবশ্য স্বল্প আয়ুষ্কালের তেজষ্ক্রিয়তা, পারস্পরিক সংঘর্ষে সৃষ্ট তাপ, স্তরায়নের ফলে সৃষ্ট তাপ–এগুলোও যথেষ্ট অবদান রেখেছে।

ভেতর থেকে বাইরে তাপের স্থানান্তর

একটি গ্রহ বা উপগ্রহের পৃষ্ঠের উত্তাপ সূর্যের বিকিরণ পাওয়ার উপর যেমন নির্ভর করে, তেমনি নির্ভর করে ভেতর থেকে তাপ কী হারে বাইরে আসছে তার উপরও। এজন্য এভাবে তাপ বাইরে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াগুলো গুরুত্বপূর্ণ। তাপের পরিচলন ও পরিবহন এই দুই প্রক্রিয়াই এ কাজে লাগে। অভ্যন্তরে কোন কোন স্তরে উত্তাপ, চাপ, এবং উত্তাপ-তারতম্যের হার পরস্পরিক এমন পরিস্থিতিতে থাকে যে সেখানে বস্তু প্রবহমান অবস্থায় থাকে, তরল অথবা প্রায় তরল চটচটে অবস্থায়। সেক্ষেত্রে তাপ স্থানান্তর হয় ঐ তরলের নিজের স্থানান্তরের মাধ্যমে– অর্থাৎ পরিচলনের মাধ্যমে। এই স্তরগুলোকে বলা হয় অ্যাসথেনোস্ফেয়ার অর্থাৎ দুর্বল অঞ্চল। সাধারণত এই চটচটে দুর্বল অঞ্চলের উপরে থাকে বাইরের কঠিন দৃঢ় অঞ্চল যাকে বলা হয় লিথোস্ফেয়ার বা পাথুরে অঞ্চল। এর মধ্যে দিয়ে তাপ স্থানান্তরিত হয় পরিবহন প্রক্রিয়ায়।

তবে যে সব গ্রহের অভ্যন্তরে এখনো আগ্নেয় সক্রিয়তা রয়েছে সে ক্ষেত্রে তলায় থাকা চটচটে অংশের উথাল-পাতালে কঠিন লিথোস্ফেয়ারের অংশ বিশেষও উপর নিচে নড়াচড়া করতে পারে– এবং সে ভাবেও ভেতরের উত্তাপ বাইরে আসতে পারে। যদিও নামটি পাথুরে, কোন কোন উপগ্রহের ক্ষেত্রে এই লিথোস্ফেয়ার জমাট বরফেও গড়া হতে পারে। সে ক্ষেত্রেও একই ভাবে তাপের স্থানান্তর ঘটে। পৃথিবীর ক্ষেত্রে এখন আমরা জানি যে এই লিথোস্ফেয়ার কতগুলো টুকরায় বিভক্ত হয়ে তলার চটচটে অংশের উপর দিয়ে এদিক ওদিক সরতে পারে। টুকরাগুলোকে বলা হয় টেকটোনিক প্লেইট। এই প্লেইটের কিনারায় লিথোস্ফেয়ার ভেদ করে গলন্ত উত্তপ্ত

ধাতু উপরে উঠে আসতে পারে এবং ঠাণ্ডা ও কঠিন হয়ে এখানে জমতে পারে। আর সে ভাবেও অভ্যন্তরের তাপ পৃষ্ঠদেশে আসতে পারে। অন্যদিকে প্লেইটের কিনারাটি গলন্ত অংশের ভেতর ডুবও দিতে পারে। এ যেন লিথোস্ফেয়ার প্লেইটের বার বার রিসাইক্লিং বা পুনরাবর্তিত হওয়া– নিচে গিয়ে গলিত হওয়া, আবার উঠে এসে কঠিন হওয়া। এটিও লিথোস্ফেয়ারের তাপ স্থানান্তরের একটি উপায় যেখানে এধরনের সক্রিয়তা রয়েছে। পৃথিবীতে প্লেইটগুলোর এই সরনকে আমরা মহাদেশের ধীর চলাচল হিসাবে দেখি। তাছাড়া এগুলোর কিনারায় জেগে উঠা বা ডুব দেয়াকে আমরা ভূমিকম্পের অঞ্চল হিসেবে পাই।

আভ্যন্তরীণ উত্তাপ যত কম হয় লিথোস্ফেয়ারের পুরুত্ব তত বেশি হয়। পৃথিবীর লিথোস্ফেয়ারের পুরুত্ব মহাদেশীয় অঞ্চলে ১০০-১৫০ কিলোমিটার আর সমুদ্রতলে ৭০-৮০ কিলোমিটার। শুক্রে এই পুরুত্ব আনুমানিক ৫০ কিলোমিটার। বৃহস্পতির উপগ্রহ ইয়োতে আনুমানিক ৫০ কিলোমিটার ও অন্য উপগ্রহ ইউরোপায় ১০-৩০ কিলোমিটার। এ গুলোর প্রায় সবগুলোকে অপেক্ষাকৃত কম পুরুত্ব বলে গণ্য করা যায়– এদের সবার ক্ষেত্রে অভ্যন্তর খুবই উত্তপ্ত। অন্যদিকে চাঁদের লিথোস্ফেয়ারের পুরুত্ব অনেক বেশি– ৮০০ কিলোমিটারের মত। স্পষ্টত চাঁদের ভেতরের উত্তাপ এখন অনেকটা স্তিমিত। লিথোস্ফেয়ারের পুরুত্ব কম বলে উপরে উল্লেখিত গ্রহ-উপগ্রহগুলোতে এটি ভেদ করে গলিত ধাতু উপরে উঠে আসতে পারে, কিন্তু চাঁদে সে রকম আগ্নেয় সক্রিয়তার কোন সুযোগ নাই। ভেতরে এই আগ্নেয় সক্রিয়তার কারণেই গ্রহ–উপগ্রহের পৃষ্ঠে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়।

আগ্নেয় সক্রিয়তা

গ্রহ-উপগ্রহের পৃষ্ঠদেশের গঠনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো এগুলোর অভ্যন্তরে আগ্নেয় সক্রিয়তার। পৃষ্ঠের উত্তাপ, এখানকার পরিবর্তন প্রবণতা এখানে জীবের বসবাস যোগ্যতা অনেকাংশে এই সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে। গ্রহে আগ্নেয় সক্রিয়তা থাকার

ইউরোপায় বরফ-উদ্গীরণশীল আগ্নেয়গিরি

দুটি শর্ত রয়েছে– একটি হলো এর অভ্যন্তরে উত্তাপের ভাল উৎস থাকতে হবে, আর অন্যটি হলো তাতে গলার মত বস্তু থাকতে হবে। এই গলার মত বস্তু বা লাভা হবার মতো কাঁচামাল নানা সিলিকেট ধরনের পাথুরে বস্তু যেমন হতে পারে, তেমনি পানির বরফ অথবা কঠিন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বরফ বা অন্য কোন উদ্বায়ী বস্তুর বরফ হতে পারে। পৃথিবী বা শুক্রের মত জায়গায় সিলিকেট লাভাই স্বাভাবিক। অভ্যন্তর যথেষ্ট উত্তপ্ত বলে এর গলিত লাভা সৃষ্টি সহজ। কিন্তু বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি সূর্য থেকে অনেক দূরবর্তী অত্যন্ত শীতল অঞ্চলের গ্রহের কিছু উপগ্রহ ভেতর বাহিরে যথেষ্ট বরফ সমৃদ্ধ। এদের আভ্যন্তরীণ উত্তাপ খুব কম হলেও ভেতরের বরফ গলাবার জন্য তাই যথেষ্ট। ঐ আভ্যন্তরীণ উত্তাপের একমাত্র উৎস শুধু জোয়ার ভাটার সৃষ্ট তাপ। সাম্প্রতিক কালে এ সব উপগ্রহের অঞ্চলে মনুষ্যবিহীন মহাশূন্যযান পাঠিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষার মাধ্যমে এসব তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের ক্ষেত্রেও এ ধরনের অনুসন্ধানে বাইরের অবয়ব দেখে তার আগ্নেয় সক্রিয়তা সম্পর্কে বেশ কিছু পরিচয় পাওয়া গেছে।

পৃথিবীর অবস্থা থেকেই অন্যদের অবস্থা কিছুটা বুঝা যায়। আজ পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের ৭০% অংশ ব্যাসাল্ট লাভায় ঢাকা। এদের প্রাচীনতমগুলো প্রায় ২০ কোটি বছর আগের আগ্নেয়গিরির দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে, আর বাদ বাকি আরো পরের আগ্নেয় সক্রিয়তার ফসল– যে প্রক্রিয়া এখনো চলছে। চাঁদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে এতে কোন আগ্নেয় সক্রিয়তা নেই বটে, কিন্তু অতি প্রাচীন কালের, প্রায় ৩০০ কোটি বছর আগের, লাভার নমুনা এতে রয়েছে। চাঁদে যে উদ্বায়ী বস্তু নেই, বায়ুমণ্ডল নেই– সে অবস্থার সঙ্গে এই আগ্নেয় সক্রিয়তার অভাবের যোগসূত্র রয়েছে। এই যে অতি

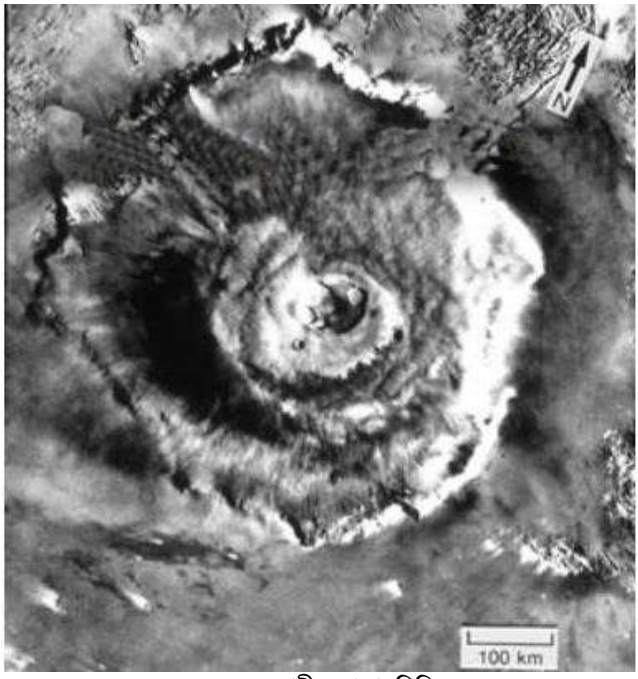

মঙ্গলের প্রাচীন আগ্নেয়গিরি

প্রাচীন লাভা তা হয়তো লিথোস্ফেয়ারের সরু ফাটল পথে নির্গত হয়েছিল। বুধ সম্পর্কে চাঁদের মত এতটা জানা না থাকলেও মনে হয় সেখানেও কোন আগ্নেয় সক্রিয়তা নেই– খুব ছোট আকারের এই গ্রহও উদ্বায়ী বস্তু শূন্য, বায়ুমণ্ডল শূন্য।

অন্য দিকে শুক্রে যেটুকু সীমিত অনুসন্ধান সম্ভব হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে অনেক ছোট ছোট আগ্নেয়গিরি, পৃষ্ঠদেশের অনেক জায়গা প্রাচীনতম ৫০ কোটি বছর পুরানো লাভায় ঢাকা। বর্তমান সক্রিয়তা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও, পৃথিবীর সঙ্গে সাদৃশ্যের কারণে তা থাকাটাই স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়। তবে এখানকার অতিরিক্ত বায়ুচাপ আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণে কিছু সীমাবদ্ধতা এনে দেয় বলে মনে করা হচ্ছে। তুলনামূলক ভাবে মঙ্গলের ক্ষেত্রে অনেক বেশি অনুসন্ধান সম্ভব হয়েছে। এখানে রয়েছে বিশাল সব প্রাচীন আগ্নেয়গিরি– যা পৃথিবীরগুলোর চেয়ে অনেক বড়। অতীত উদ্গীরণে এত বড় আগ্নেয়গিরি গঠনের কারণ খুব সম্ভব মঙ্গলে প্লেইট রিসাক্লিং না থাকা। এর ফলে প্লেইটের কিনারায় পৃষ্ঠদেশ অভ্যন্তরে চলে গিয়ে গলে যেতে পারেনি, আবার অন্যত্র আগ্নেয়গিরিতে নূতন করে উঠে আসতে পারেনি– বার বার পৃথিবীতে যা হয়ে চলেছে। মঙ্গলে বরং একই আগ্নেয়গিরিতে ক্রমাগত লাভা জমে উঁচু হয়েছে। তবে এসব অতীত সক্রিয়তার নমুনা থাকলেও বর্তমানে মঙ্গলে খুব সম্ভব আগ্নেয় সক্রিয়তা নেই– এর ছোট আকার ও সীমিত আভ্যন্তরীণ উত্তাপই তার কারণ। অন্য দিকে অবশ্য ছোট আকার ও অনেক শীতল পরিবেশ সত্ত্বেও, বৃহস্পতির উপগ্রহ ইয়োর ক্ষেত্রে আগ্নেয় সক্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। জোয়ার ভাটার সৃষ্ট যে সীমিত আভ্যন্তরীণ উত্তাপ– এতেই তা সম্ভব হয়েছে। মনে হচ্ছে এখানে উদ্বায়ী বস্তুর কাজ করেছে পাথুরে বস্তুতো নয়ই, পানিও নয়, বরং সালফার-ডাই- অক্সাইড।

অন্য গ্রহের তুলনায় পৃথিবীর বর্তমান আগ্নেয় সক্রিয়তা যে বেশি, এর অভ্যন্তরে যে গলিত তরল ধাতব স্তর রয়েছে, তার একটি বিরাট সুফল রয়েছে। এই তরল ধাতব বস্তুর ঘূর্ণনের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র যা আবার সূর্যের থেকে আসা আয়ন (বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত) কণিকায় গড়া গ্যাসের শিখা, মহাজাগতিক রশ্মি ইত্যাদি যা মারাত্মক হতে পারতো তার গতিপথ বাঁকিয়ে সরিয়ে দিয়ে পৃথিবীর জীব জগতকে সুরক্ষা দিচ্ছে।

নানা গ্রহের বায়ুমণ্ডল

আগেই বলেছি গ্রহ-উপগ্রহের পৃষ্ঠদেশের উত্তাপ নির্ভর করে ভেতর থেকে স্থানান্তরিত তাপ আর সূর্য থেকে পাওয়া বিকিরণের তাপ– এই দুইয়ের সম্মিলনে। কিন্তু এক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডলেরও একটি বড় ভূমিকা রয়েছে– যদি সে রকম বায়ুমণ্ডল থাকে। ভূমিকাটি

আসে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া থেকে। পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, জলীয় বাষ্প ইত্যাদিতে শোষিত হয়ে পৃষ্ঠদেশের উত্তাপ সহজে বাইরে যেতে পারেনা। ফলে উত্তাপ যা হবার কথা তার চেয়ে বেড়ে যায়। এটিই গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া যা আজ আমাদের জন্য বড় বিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বায়ুমণ্ডলের উপর নির্ভর করে একই ঘটনা পৃথিবীতে অতীতেও যথেষ্ট তীব্রভাবে ঘটেছে, অন্য গ্রহেও ঘটেছে এবং তার পরিবেশ পরিস্থিতির উপর বিরাট ভূমিকা রেখেছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি প্রায় নিঁখুত অনুপাতে দীর্ঘকাল ধরে রয়েছে। যদিও একেবারে অতীতে এর গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল কিন্তু শত কোটি বছরেরও বেশি সময় ধরে বায়ুমণ্ডলের এই অনুপাতে তেমন কোন নড়চড় হয়নি। এর কারণ হলো পৃথিবীর জীবজগৎ। জৈব প্রক্রিয়ায় কোন গ্যাস গ্রহণ করে, কোন গ্যাস ত্যাগ করে বিশাল জীবজগতই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে ভারসাম্যে রেখেছে– নইলে এই ভারসাম্য থাকার কথা নয়। অন্য গ্রহে তা থাকেওনি। অবশ্য অতি সাম্প্রতিক কালে মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেড়ে গিয়ে ভারসাম্য কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে এবং পৃষ্ঠদেশের উত্তাপ বাড়া শুরু হয়েছে, বর্তমান বিপত্তির কারণটি এখানেই।

নানা গ্রহের বায়ুমণ্ডলে মেঘ সৃষ্টির প্রক্রিয়া রয়েছে। পৃথিবীতে সেই মেঘ সৃষ্টি হয় পানি ও বরফ কণায়। কিন্তু শুক্রে সেটি হয় সালফিউরিক এসিডের কণায়। আর মঙ্গলের মেঘ হলো বরফ কণা, কার্বন-ডাই-অক্সাইড বরফ কণা, এবং ধূলিকণার সৃষ্ট। শুক্রের এসিড মেঘ তৈরি হয় সালফার-ডাই-অক্সাইড গ্যাস থেকে, খুব সম্ভব নাইট্রোজেন অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়ায়। তবে এ মেঘের উপর শুক্রের বায়ুমণ্ডল গড়া প্রধানত কার্বন-ডাই-অক্সাইডে। এই বায়ুমন্ডলের চাপ প্রচণ্ড– পৃথিবীর ৯০ গুণ। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ও এসিড মেঘের এই ঘন চাদর তীব্র গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ায় শুক্রকে অত্যন্ত উত্তপ্ত করে তুলেছে। এর পৃষ্ঠদেশের গড়পরতা উত্তাপ ৪৬০° সেলসিয়াস।

শুক্রের বায়ুমণ্ডল, ঘন এসিড মেঘ

অন্যদিকে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলও প্রধানত কার্বন-ডাই-অক্সাইডে গঠিত হলেও এটি একেবারেই পাতলা– চাপ পৃথিবীর এক শতাংশেরও কম। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে অবশ্য সামান্য নাইট্রোজেন অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাসও রয়েছে। বায়ুমণ্ডলের কিছু মৌসুমী পরিবর্তনও ধরা পড়েছে পরীক্ষা নিরিক্ষায়। মঙ্গলে পাঠানো মহাশূন্যযানগুলো এর মেরু অঞ্চলে পানির বরফ ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড বরফের চাদর আবিষ্কার করেছে। মঙ্গলে পাঠানো ভাইকিং মিশনের পরীক্ষণে ধরা পড়েছে যে গ্রীষ্মকালে এখানে উত্তর মেরু অঞ্চলের বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট জলীয় বাষ্প দেখা যায়, ওখানকার বরফের চাদর গলার ফলে। তুলনামূলকভাবে মঙ্গলের পৃষ্ঠের উত্তাপ খুব কম। গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া, আভ্যন্তরীণ উত্তাপ ইত্যাদির স্বল্পতার কারণে এখানে গড় উত্তাপ –৬৩° সেলসিয়াস।

পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলের যে স্তরগুলো রয়েছে তাদেরকে নিম্ন স্তর (ট্রপোস্ফেয়ার), মধ্য স্তর (স্ট্রাটোস্ফেয়ার) ও উচ্চ স্তর (থার্মোস্ফেয়ার) এই তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। শুক্র ও মঙ্গলেও তা করা যায়– তবে মধ্য স্তরটি বাদ দিয়ে। নিম্ন স্তরটি সব জায়গায় গ্রহের পৃষ্ঠের সংলগ্ন থাকে বলে পরিচলনের ফলে সেখান থেকে তাপ নিয়ে কিছু উত্তাপে থাকে। পৃথিবীর মধ্য স্তরে থাকে ওজোন স্তর যা সূর্যের আলট্রা-ভায়োলেট শোষণ করে, ও সেভাবে কিছুটা উত্তাপ লাভ করে। ওজোন স্তর মারাত্মক আলট্রা- ভায়োলেটকে শোষণ করে পৃথিবীর স্থলভাগের সকল জীবকে সুরক্ষা দিচ্ছে। অন্যান্য গ্রহে এর অনুপস্থিতি সেখানে বসবাসের জন্য একটি বড় সমস্যা হতে পারে। অতি সম্প্রতি ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে শুক্রের বায়ুমণ্ডলে কিছু ওজোন স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে, যদিও অবশ্য তা পৃথিবীর ওজোন স্তরের তুলনায় অনেক দুর্বল। তিনটা গ্রহেই অবশ্য বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তরে আলট্রা-ভায়োলেট সহ সৌর

বিকিরণ কিছুটা শোষিত হয়– পৃথিবীর ক্ষেত্রে অক্সিজেনের দ্বারা আর শুক্র ও মঙ্গলের ক্ষেত্রে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের দ্বারা। সেখানেও তাই বায়ু কিছুটা উত্তাপ লাভ করে। সবগুলোর ক্ষেত্রেই নিম্নস্তরে বায়ুচলাচল সৃষ্টি হয়– যার একটি কারণ গ্রহের ঘূর্ণন। চাঁদে আদৌ বায়ুমণ্ডল নেই বলে সেখানে সূর্যের বিকিরণ অবাধে প্রবেশ করে দিনে উত্তাপ নিয়ে যায় গড়পড়তা ১০৭° সেলসিয়াসে আর রাতে নামিয়ে আনে –১৫৩° সেলসিয়াসে। আর আলট্রা-ভায়োলেটের অবাধ প্রবেশ সেখানে জীবের জন্য মারাত্মক হুমকি।

প্রকাণ্ড গ্রহগুলো ও তাদের উপগ্রহ

সূর্য থেকে বেশি দূরে থাকা বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন হলো চারটি প্রকাণ্ড গ্যাসীয় গ্রহ। সাম্প্রতিক কালে সৌরজগতের এই সুদূর এলাকায়ও চলে গেছে আমাদের অনুসন্ধানী মহাশূন্যযান। যেগুলো থেকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে বিশেষ করে বৃহস্পতি ও শনির ভর, আভ্যন্তরীণ উত্তাপ, চৌম্বক ক্ষেত্র ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। সূর্য থেকে দূরত্বের কারণে স্বাভাবিক ভাবেই এগুলো অত্যন্ত শীতল গ্রহ। নিজেদের ঘন মেঘের উপরটায় এর গড় উত্তাপ –১৪৯° সেলসিয়াস। একই ভাবে শনির ক্ষেত্রে উত্তাপ –১৭৮° সেলসিয়াস, আর ইউরোনিয়াস ও নেপচুন

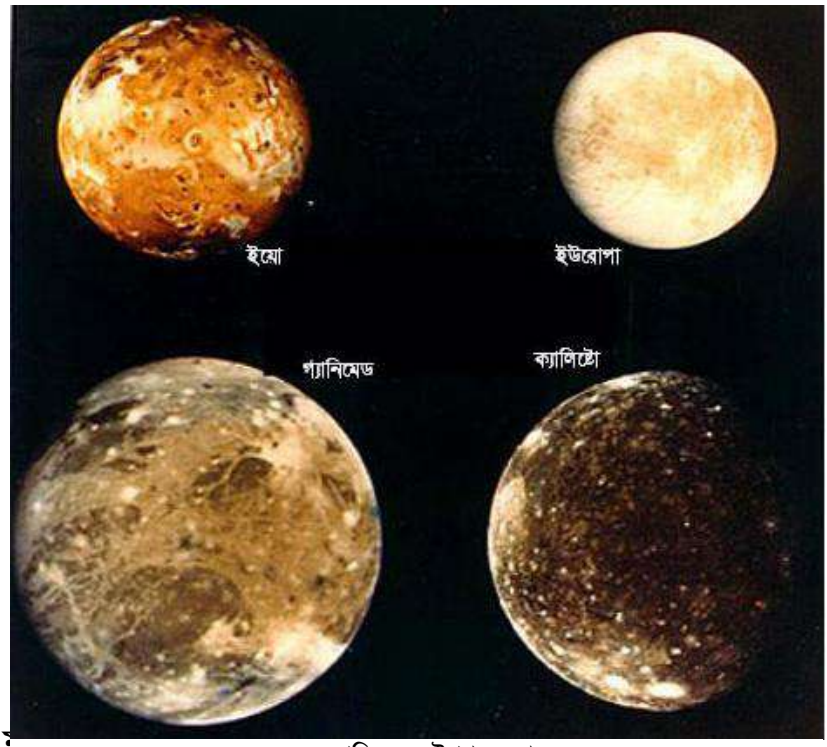

বৃহস্পতির বড় উপগ্রহগুলো

উভয়ের ক্ষেত্রে উত্তাপ –২১৪° সেলসিয়াস। এগুলো অসম্ভব নিম্ন উত্তাপ, কিন্তু সূর্যের থেকে এত বেশি দূরত্বে উত্তাপ আরো কম হবার কথা (ইউরেনাস ব্যতীত), যদি না গ্রহগুলোর অভ্যন্তরে উত্তাপের উৎস না থাকতো। আসলে বৃহস্পতির কেন্দ্রে কোরের মধ্যে উত্তাপ প্রায় ২০ হাজার ডিগ্রির মত। এর বিশাল গ্যাসীয় অবয়বের তুলনায় পাথুরে বস্তুতে গড়া এই কোরটি যদিও খুবই ছোট তবুও তা ১০ থেকে ২০টি পৃথিবীর সমান ভারী। এই কোরের বাইরে শুধুই হালকা হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম গ্যাস– কিন্তু সেটি এত বিস্তৃত পরিমাণে যে বৃহস্পতির বিরাট ভরের অধিকাংশ এই গ্যাসেরই ভর। এর সঙ্গে অবশ্য অল্প অনুপাতে মিথেন ও এমোনিয়া গ্যাসও রয়েছে। ঐ যে কোর তার পৃষ্ঠদেশ কোথায়, তা কঠিন না তরল, কোথায় কীভাবে শুরু হয়েছে গ্যাসীয় অংশ, এসবের কোন স্পষ্ট নিশানা অবশ্য পাওয়া যায়নি। শনির অবস্থাটিও প্রায় একই রকম– একই রকম কোর, তাতে তাপের উৎস, আর একই রকম বিশাল গ্যাসীয় গোলক।

জীবের উপযুক্ত আবাস থাকা, বা আমাদের বসত স্থাপন করা এসব দিক থেকে অবশ্য এই গ্রহগুলোর প্রতি আমাদের কোন আকর্ষণ নেই– কারণ সেখানে এর কোনটাই হবার নয়। আমাদের বরং লক্ষ্য হবে বৃহস্পতি ও শনির অনেকগুলো উপগ্রহের মধ্যে উপযুক্ত কয়েকটির উপর। বিভিন্ন গ্রহের উপগ্রহের মধ্যে আমাদের ভাল পরিচিতি আছে শুধু পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদের সঙ্গে। চাঁদ পাথুরে সিলিকেটে গড়া– সম্পূর্ণ বায়ুহীন, এবং উদ্বায়ী পদার্থহীন। অতীতে পানি নেই মনে করা হলেও খুব সম্প্রতি চাঁদের ভূমির পাথরের মধ্যে কিছু পানির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। মঙ্গলের দুটি খুব ছোট উপগ্রহ আছে– ফোবোস ও ডাইমোস। দুটারই ব্যাসার্দ্ধ মাত্র ৬ থেকে ১৪ কিলোমিটারের মধ্যে– গ্যাসহীন, কোন রকম উদ্বায়ী বস্তুহীন নেহাৎ পাথুরে খণ্ড মাত্র। তবে বৃহস্পতি ও শনির ব্যাপারটি আলাদা– তাদের উপগ্রহের সংখ্যা অনেক, এগুলোর কোন কোনটি গ্রহের সমান বড় ও আগ্রহ উদ্দীপক। বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ বেশ বড়– ইয়ো, ইউরোপা, গ্যানিমেড, ক্যালিষ্টো এবং আরো ১২টি অপেক্ষাকৃত ছোট। শনির সবচেয়ে বড় উপগ্রহ টাইটান চাঁদের প্রায় দ্বিগুণ বড়। তাছাড়া এর আরো সাতটি উপগ্রহ বড় ও অন্যান্য ১১টি অপেক্ষাকৃত ছোট।

বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপা আর ইয়ো অনেকটা পৃথিবী ও মঙ্গলের মত কঠিন পাথুরে বস্তুতে তৈরি। ইউরোপা আকারে প্রায় চাঁদের সমান। এর কঠিন অবয়বের উপরটা খুব সম্ভব আগাগোড়া পানির বরফে ঢাকা। এর মসৃণ পৃষ্ঠদেশের উপর পরিবর্তনশীল নানা ফাটল দেখা যায়। এসব সহ নানা পর্যবেক্ষণে মনে হচ্ছে যে এ বরফের তলাতেই তরল পানি থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা। বৃহস্পতির অন্য দুটি বড়

উপগ্রহ গ্যানিমেড ও ক্যালিস্টো প্রধানত বরফবস্তুতে গড়া। টাইটান সহ শনির সব উপগ্রহও তাই। টাইটানের বৈশিষ্ট হলো অন্য সব উপগ্রহের তুলনায় এর রয়েছে খুব ঘন বায়ুমণ্ডল যা প্রধানত নাইট্রোজনে গঠিত। এর মধ্যে রয়েছে প্রচুর ধূলি কণায় গড়া ধোঁয়াশা। টাইটানের গায়ের উত্তাপ যথারীতি অতি শীতল −১৮৮° সেলসিয়াস। স্বাভাবতই এই রকম উত্তাপে তরল পানি থাকার কথা নয়, কিন্তু তরল ইথেন যে রয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ইউরোপার আভ্যন্তরীণ উত্তাপ

ইউরোপার পৃষ্ঠদেশে বরফের তলাতেই তরল পানি থাকার কথা অনুমান করার কারণ হলো চাঁদের সমান আকৃতির হয়েও, অত্যন্ত শীতল পরিবেশ সত্ত্বেও এতে আভ্যন্তরীণ তাপের উৎস হিসাবে তার প্রতিবেশীদের মাধ্যাকর্ষণে জোয়ার-ভাটার চমকপ্রদ ভূমিকা। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে অধিকাংশ উপগ্রহ তার গ্রহের সঙ্গে জোয়ার ভাটার বিক্রিয়ায় স্থায়ীভাবে সুসংবদ্ধ হয়ে যায়। গ্রহের আকর্ষণ সব চেয়ে বেশি অনুভূত হয় উপগ্রহের যে অংশ তার সামনেই থাকে সেখানে, এর বিপরীত অংশে আকর্ষণ কিছুটা কম থাকে। তাই কাছের অংশে উপগ্রহের দেহ যেমন গ্রহের দিকে একটু ফুলে উঠে, দূরের অংশে তা কিছু কম

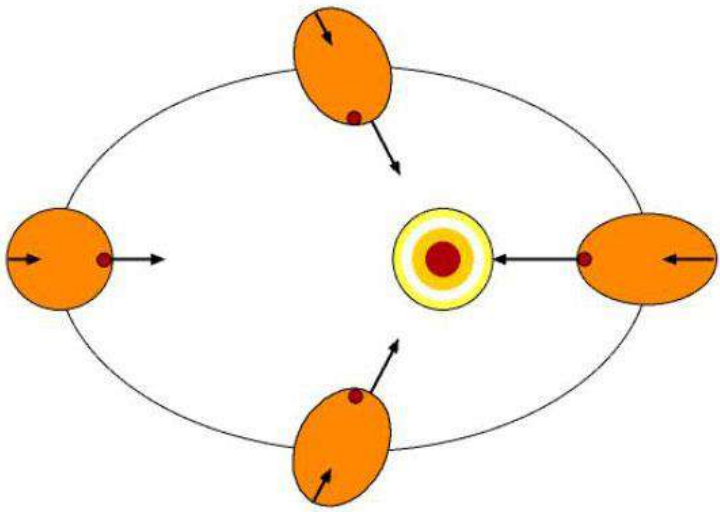

উপগ্রহে জোয়ার ভাটার সৃষ্ট তাপ। উপবৃত্তাকার কক্ষে কখনো গ্রহ থেকে দূরে, কখনো কাছে থাকে বলে জোয়ার ভাটার ফলে উপগ্রহের বিকৃতি কমবেশি হয়। এর ফলে নিজস্ব ঘষাঘষিতে তাপ সৃষ্টি হয়।

ফুলে। এই দুইয়ের পার্থক্যের কারণে ক্রমে উপগ্রহের নিজের অক্ষের উপর আবর্তনটি গ্রহের চতুর্দিকে তার পরিক্রমণের সঙ্গে সমলয়ে চলে আসে, যাকে বলা হয় উভয় গতির পরস্পর সিনক্রোনাইজ্‌ড হয়ে যাওয়া। ফলে এক বার গ্রহের চারিদিকে ঘুরে আসতে যে সময় লাগে ঐ সময়ে নিজের অক্ষের উপর উপগ্রহটি ঠিক একবার আবর্তিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে উপগ্রহের একটি দিক সব সময় গ্রহের দিকে মুখ করে থাকে, অন্য দিকটি সব সময় তার বিপরীতে থেকে যায়। এটিকেই বলেছি জোয়ার ভাটার কারণে গ্রহের সঙ্গে উপগ্রহের সুসংবদ্ধ হয়ে যাওয়া। আমাদের চাঁদের ক্ষেত্রে এটি হয়েছে। আমরা সব সময় চাঁদের একই অর্ধাংশ দেখতে পাই, বাকি অর্ধাংশ পৃথিবী থেকে কখনো দেখা যায় না। অন্যান্য গ্রহের উপগ্রহেরও একই অবস্থা। আসলে অন্যান্য তারার খুব কাছে থেকে যে গ্রহ তারাকে পরিক্রমণ করে সে রকম গ্রহের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। সে ক্ষেত্রে গ্রহটির যে অর্ধাংশ তারার দিকে সব সময় মুখ করে যাকে সেটি অসম্ভব উত্তপ্ত হয়ে উঠে, এবং অন্য অর্ধাংশ খুবই শীতল থেকে যায়।

ইউরোপা ও বৃহস্পতির সঙ্গে এই ভাবে জোয়ার ভাটায় সুসংবদ্ধ হয়ে থাকার ফলে তার একই দিক সব সময় বৃহস্পতির দিকে মুখ করে থাকে। ইউরোপার অভ্যন্তরে উত্তাপ সৃষ্টি হবার যে একটি মাত্র উৎস কাজ করতে পারে তা হলো জোয়ার ভাটার সৃষ্ট তাপ। কিন্তু একই দিকে মুখ করে থাকার ফলে তার দেহে জোয়ার-ভাটার মোচড়ামুচড়ির বিকৃতি সব দিকে সমান বন্টিত হবার কথা নয়। কিন্তু বৃহস্পতি ও তার অন্য দুটি উপগ্রহ ইয়ো ও গ্যানিমেডের সঙ্গে ইউরোপার একই সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণের আন্ত-ক্রিয়ার ফলে ইউরোপার কক্ষপথ বৃত্তাকার না হয়ে যথেষ্ট লম্বাটে উপবৃত্তাকার হয়ে পড়ে। এতে বৃহস্পতির সঙ্গে পরিক্রমণের নানা পর্যায়ে এর দূরত্ব কম বেশি হয়। ফলে সামনের দিককে আকর্ষণে বেশি ফুলিয়ে নেবার পরিমাণেও রদবদল ঘটে দূরত্বের তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে। এরকম রদবদলের সঙ্গে সঙ্গে জোয়ার ভাটার সৃষ্ঠ বিকৃতিতে তালে তালে এক ধরনের পাল্‌সের সৃষ্টি হয় যা উপগ্রহটির অভ্যন্তরে সর্বত্র তাপের সৃষ্টি করে। এই বিস্তৃত উত্তাপে ইউরোপার বরফের তলায় তরল পানি থাকার সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। অন্য উপগ্রহ ইয়োতেও একই ব্যাপার ঘটে। সেখানে অবশ্য এই উত্তাপ এত বেশি হয় যে পানি থাকলেও তা বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে যাবার কথা। কিন্তু ইউরোপায় উত্তাপটি পরিমিত বলে পানি বাষ্পীভূত হতে পারেনা। তা ছাড়া উপরে বরফ দিয়ে চাপে থাকে বলে তরল পানি বাষ্পীভূত হওয়ার সম্ভাবনা আরো কমে যায়। পরে আমরা দেখবো সেখানে অণুজীব থাকার সম্ভাবনার দিক থেকে এসব তথ্য কত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাণ-সম্ভবা গ্রহ ও উপগ্রহ

মঙ্গলের দিকেই দৃষ্টি বেশি

আমরা যখনই পৃথিবীর বাইরে নিজেদের আবাসের সম্ভাবনাটি নিয়ে ভেবেছি, তখন দুটি জিনিস বিশেষভাবে বিবেচনায় এসেছে। একটি হলো মানুষের বাসযোগ্যতার দিক থেকে জায়গাটির উপযুক্ততা কী রকম। আর অন্যটি হলো ইতোমধ্যে কোন প্রকারের কোন জীব সেখানে রয়েছে কিনা অথবা অতীতে ছিল কিনা। উভয় দিক থেকে তুলনামূলক বিচারে মঙ্গলই আমাদেরকে আশাবাদী করেছে সব চেয়ে বেশি। এটিও ঠিক যে মঙ্গলকেই আমরা অনুসন্ধান করতে পেরেছি বেশি– এদিক থেকে চাঁদের পরেই তার স্থান। পৃথিবী থেকে দূরবীক্ষণের সাহায্যে এ অনুসন্ধান অনেক দিন থেকেই করা হয়েছে। আমাদের মহাশূন্য অভিযানের যুগ শুরু হওয়ার পর থেকে মঙ্গলের কক্ষ পথে ঘুরে এবং মঙ্গলে অবতরণ করে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করার জন্য মনুষ্যবিহীন বেশকিছু মহাশূন্যযান পাঠানো হয়েছে। এর ফলে মঙ্গল সম্পর্কে আমাদের জানার পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়েছে, মানুষের বা এমনকি ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া জাতীয় জীব বাস করতে পারার মত কতখানি উপযুক্ততা সেখানে রয়েছে তারও কিছুটা আমাদের কাছে ধরা পড়েছে। বেশ কিছু বিষয়ে মঙ্গলের সঙ্গে পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ মিল রয়েছে। এর দিবারাত্রের দৈর্ঘ অনেকটা পৃথিবীর মত। এর বছর অর্থাৎ সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণকাল পৃথিবীর চেয়ে দীর্ঘতর হলেও কক্ষপথের সঙ্গে এর অক্ষের হেলে থাকার পরিমাণ প্রায় একই হাওয়াতে এখানেও ঋতু পরিবর্তন রয়েছে। এখানেও উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে জমা বরফ রয়েছে।

পৃথিবীর সঙ্গে মঙ্গলের পার্থক্যগুলো অবশ্য উত্তাপ, মাধ্যাকর্ষণ, বায়ুচাপ, তরল পানির উপস্থিতি ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সূর্য থেকে মঙ্গলের দূরত্ব পৃথিবীর তুলনায় কিছুটা বেশি, কাজেই সেখানে সূর্য কিরণ কিছুটা নিস্তেজ– কিন্তু আবার বায়ুমণ্ডলের চাপ অনেক কম বলে সেই কিরণের বেশি অংশ মঙ্গলের পৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। বায়ুমণ্ডল পাতলা হওয়াতে অবশ্য গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া তেমন সক্রিয় নয়। মঙ্গল পৃষ্ঠের উষ্ণতা খুবই শীতল, গড়পড়তা এটি –৬৩° সেলসিয়াস, নিম্নতম –৮৯.২° সেলসিয়াস। মঙ্গলের কক্ষপথ বেশি উপবৃত্তাকার বলে নানা মৌসুমে উত্তাপের উঠানামাটি বেশি। মঙ্গলে বায়ুচাপ মাত্র ৬ মিলিবার অর্থাৎ পৃথিবীর হাজার ভাগের ৬ ভাগ। তবে এই বায়ুমণ্ডল প্রধানত কার্বন-ডাই-অক্সাইডে গড়া। এই গ্যাসের আংশিক চাপ মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে পৃথিবীর থেকে অনেকগুণ

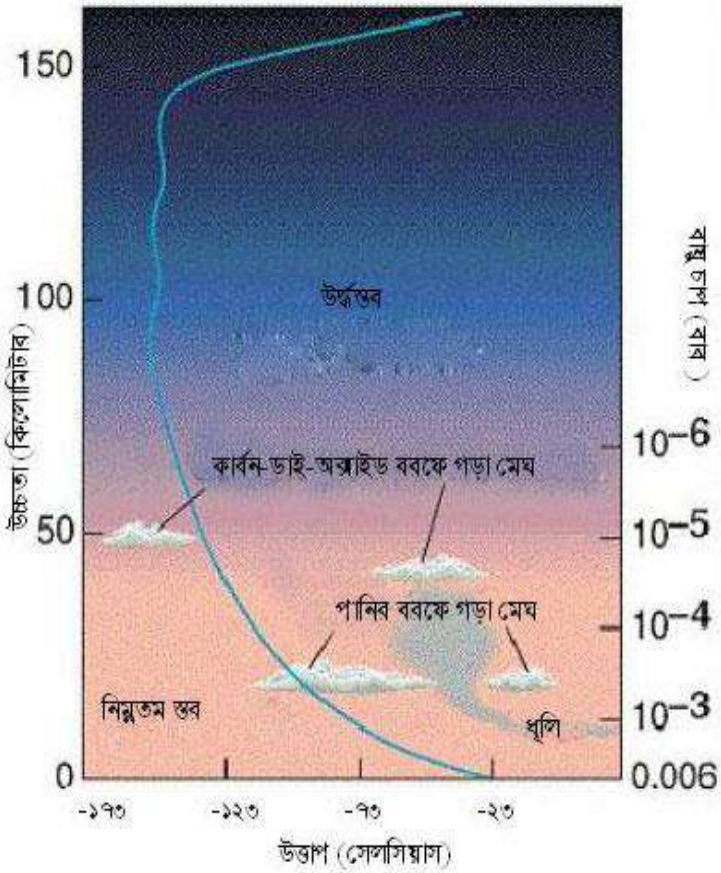

মঙ্গলের বায়ুমন্ডল
(বক্র রেখাটি বিভিন্ন স্তরের উত্তাপ সূচিত করছে)

বেশি। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে অনেকখানি জুড়ে ম্যাগনেটোস্ফিয়ার বলে একটি স্তর রয়েছে যেখানে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব খুব বেশি। আগেই দেখেছি এটি সৌর শিখায় নি:সৃত মারাত্মক সব বিদ্যুৎ চার্জ যুক্ত কণিকার স্রোত সব সময় পৃথিবী থেকে বাঁকিয়ে সরিয়ে দিয়ে এখানকার জীবজগতকে সুরক্ষা দেয়। মঙ্গলে এরকম ম্যাগনেটোস্ফেয়ার খুবই দুর্বল বলে ওখানে এরকম সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই। মঙ্গল অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়াতে এখানে মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশের মত, এর ০.৩৮ ভাগ। মঙ্গলে তরল পানির উপস্থিতির কোন সরাসরি প্রমাণ না থাকলেও বিষয়টি অনুসন্ধানে বিশেষভাবে এসেছে। অতি সাম্প্রতিক কিছু আবিষ্কারে এ সম্পর্কে যথেষ্ট আশারও সঞ্চার হয়েছে।

মোটের উপর মঙ্গলের পরিবেশ একটি অতি শীতল খটখটে শুষ্ক মরুভূমির মত। পৃথিবীর বুকে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তে চিলির আটাকামা মরুভূমির প্রকৃতির সঙ্গে অনেকে এর তুলনা করে থাকেন, যদিও আসলে মঙ্গল তার চেয়েও অনেক বেশি প্রতিকূল জায়গা। আর একটি দিক থেকেও পৃথিবীর যে কোন জায়গা থেকে

মঙ্গলের পরিবেশ অনেক বেশি প্রতিকূল, তা হলো সূর্য কিরণের মারাত্মক আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির অবাধ পতন। মঙ্গলের বাতাসে অক্সিজেন না থাকায় সেখানে ওজোন স্তরের বাধার কোন প্রশ্ন উঠেনা – তাই আলট্রা-ভায়োলেট অনায়াসে মঙ্গলের পৃষ্ঠে পৌঁছে যায়। এত সব সত্ত্বেও অবশ্য এ পর্যন্ত অন্তত ক্ষুদ্র জীবের থাকার যেটুকু সম্ভাবনা পৃথিবীর বাইরে কোথাও দেখা গেছে– তা এই মঙ্গলেই।

মঙ্গলের পানি নিয়ে গবেষণা

মঙ্গল সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণার একটি প্রধান অংশ এতে পানির উপস্থিতি নিয়ে– কারণ তরল পানির উপস্থিতি প্রাণের উপস্থিতির জন্য অপরিহার্য মনে করা হয়। ১৯৭০ এর দশকে ভাইকিং মহাশূন্যযান অভিযানের সময় মঙ্গলের উত্তর মেরুতে পানির বরফ আবৃত দেখা যায় (পোলার আইস ক্যাপ)। খুব সম্ভব উত্তর মেরুর চারপাশের অঞ্চল গ্রীষ্মকালেও যথেষ্ট শীতল থাকে বলে এই বরফ কখনো

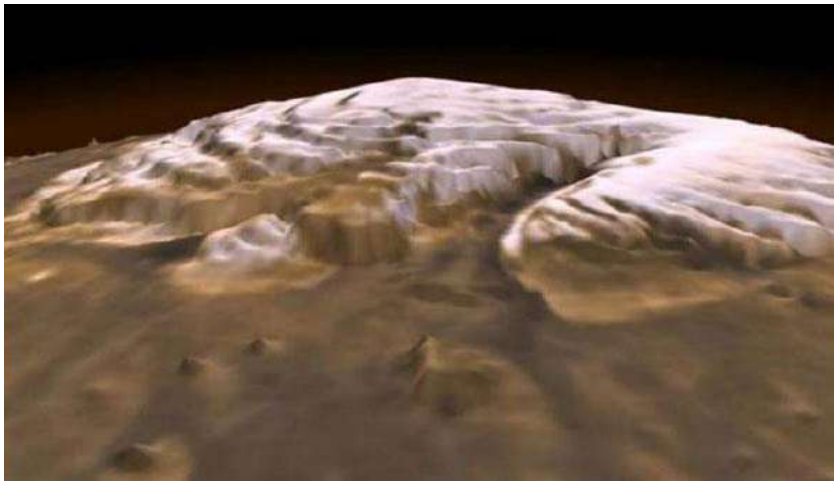

মঙ্গলের উত্তর মেরু অঞ্চলে বরফ স্তুপ

গলতে বা উবে যেতে পারেনি। পরে ২০০৪ সালে মার্স এক্সপ্রেস অরবিটার মহাশূন্যযান মঙ্গলের দক্ষিণ মেরুতেও পানির বরফ আবিষ্কার করেছে। তবে আমাদের আসল আগ্রহ হলো এ গ্রহে তরল পানির উপস্থিতির বিষয়ে। বিভিন্ন মারিনার মহাশূন্যযান মঙ্গল-পৃষ্ঠের যে সব ছবি পাঠিয়েছিল তাতে এখানে পানির দ্বারা অবক্ষয়িত ভূমির মত চিহ্ন বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এগুলো থেকে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে অতীতের কোন পানির স্রোত এখানে বিশাল সব চ্যানেল ও হাজার হাজার নিচু উপত্যাকা সৃষ্টি করে গেছে। অথচ অন্য সব পরীক্ষা নিরিক্ষায় মঙ্গলের পৃষ্ঠের উপর অন্তত তরল পানির সাক্ষ্য মেলেনি।

তরলের দ্বারা অবক্ষয়ের যে সব ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে কিছু বহির্মুখি চ্যানেল বা নদীখাতের মত জিনিস যেগুলো হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত লম্বা ও ৪০-৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রশস্ত হতে পারে। ম্যারিনার-৬ ও ম্যারিনার-৭ এর ছবিতে ধরা পড়েছে যে যেখান থেকে এই চ্যানেলগুলোর শুরু সেখানে ভূমি বেশ বিশৃঙ্খল উল্টে পাল্টে রয়েছে। চ্যানেলগুলো ক্রমাগত নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে পরে আবার একত্র হয়েছে। আরেক রকমের কতগুলো চ্যানেল অবশ্য দেখতে পৃথিবীর নদীর মত নয় মোটেই। ১০-১৫ কিলোমিটার চওড়া এসব চ্যানেলের তল অদ্ভূত রকম সমতল চ্যাপ্টা। আরো এক ধরনের চ্যানেল দেখা যাচ্ছে যেগুলো পৃথিবীর নদী অববাহিকায় প্রবাহিত নদী খাতের মত ছোট ছোট উপনদীতে শুরু হয়ে ক্রমে প্রশস্ত ও গভীর হয়েছে। এই চ্যানেলগুলোর উৎপত্তি সম্পর্কে নানা তত্ত্ব রয়েছে। একটি তত্ত্বে বলা হচ্ছে মঙ্গলের শৈশবে পৃথিবীর মত পানির সাগর থাকলেও পরে পানি খুব সম্ভব কিছু শুকিয়ে গেছে, বাকি ভূমির নিচে অভ্যন্তরে চলে গেছে। এই তত্ত্বের মতে এই অভ্যন্তরের পানিই কোথাও কোথাও বের হয়ে এসে অতীতে এই চ্যানেলগুলোর সৃষ্টি করেছিলো।

মারিনার-৯ মহাশূন্য মিশনের তোলা ছবিতে মঙ্গলের অতীত জলপ্রবাহ খাতের আভাস

চাঁদে এপলো মিশনগুলোর গবেষণার সময় চাঁদের বুকে ভূমিকম্প পরীক্ষণ থেকে জানা গিয়েছিল যে ওখানকার পৃষ্ঠদেশ থেকে ২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীরের শিলা অনেক ছোট ছোট খণ্ড দিয়ে তৈরি যার মধ্যে অনেক ফাটল। খুব সম্ভব অতীতে অসংখ্য উল্কা খণ্ডের অনবরত সংঘর্ষের ফলে এমনটি হয়েছে। মনে করা হচ্ছে যে মঙ্গলেরও একই রকম সংঘর্ষের ইতিহাসের কারণে এখানেও অন্তত কিছুটা গভীরতা পর্যন্ত এরকম সছিদ্র কঙ্করময় শিলা থাকার কথা। মাধ্যাকর্ষণ বেশি বলে এখানে এসবের গভীরতাটি হয়তো ১০ কিলোমিটারের মধ্যে থাকবে, কিন্তু তা বিপুল পরিমাণ তরল পানি জমা রাখতে পারে। আভ্যন্তরীণ তাপের কারণে এ পানি ওখানে তরল অবস্থায় থাকতে পারে। একেবারে উপরের দিকের পানি শীতল হয়ে জমে

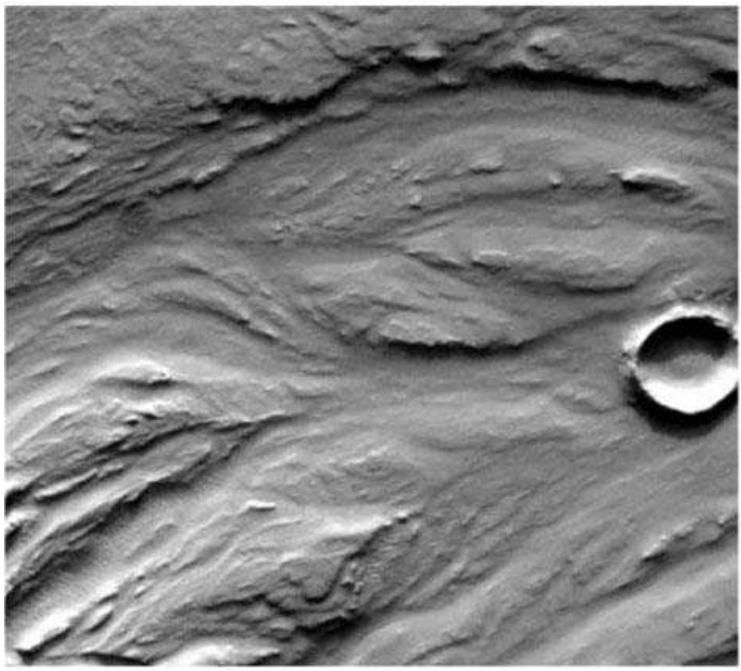

মঙ্গলের পৃষ্ঠে প্রশস্ড় বহির্মুখি চ্যানেলঃ
অতীত জলপ্রবাহের সাক্ষ্য

যাওয়ায় তা অন্তরক আবরণের কাজ করে নিচের পানিকে উবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছে।

মঙ্গলের পানি তার পৃষ্ঠের তলায় অভ্যন্তরে থাকাতে এটি রক্ষা পেয়ে গেছে বলা যায়। তা না হয়ে যদি এটি বাইরে থাকতো তা হলো পৃথিবীর মত জলচক্রে বায়ুমণ্ডলেও যেত এবং সেখানে উর্দ্ধাকাশে সূর্যের আলট্রা- ভায়োলেট রশ্মির প্রভাবে বিশ্লিষ্ট হয়ে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনে পরিণত হতো। মঙ্গলের কম মাধ্যাকর্ষণে এর হালকা হাইড্রোজেন অংশ সহজতর ভাবে উড়ে চলে যেতো। পৃথিবীতেও কিছুটা তাই হয়েছে। হাইড্রোজেনের অপেক্ষাকৃত ভারি আইসোটোপ অংশ ডিউটেরিয়াম (যাকে ভারী হাইড্রোজেন বলা হয়) এভাবে কম উড়ে যায় বলে পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলে এর অনুপাত স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি দেখা যায়। এভাবে বিশ্লিষ্ট হয়ে বায়ুমণ্ডলের পানির হাইড্রোজেন যত বেশি উঠে যাবে ডিউটেরিয়ামের অনুপাত তত বেশি হবে। মঙ্গলের ক্ষেত্রে আল্ট্রা-ভায়োলেটে বিশ্লিষ্ট হবার ঘটনা ঘটেছে বেশি, তাই উবেও গেছে বেশি, ডিউটেরিয়ামের অনুপাত আধিক্য তাই ওখানে পৃথিবীর চেয়ে ৫ গুণ বেশি। কিন্তু বিশ্লিষ্ট হয়ে উবে যাওয়ার মত পানি সেখানে বাতাসে বেশি ছিলনা, কারণ তার আগেই অনেক পানি অভ্যন্তরে চলে গেছে। নইলে ডিউটেরিয়ামের অনুপাত আধিক্য আরো অনেক বেশি হতো। শুক্রে এই আধিক্য পৃথিবীর থেকে

১০০ গুণ বেশি, কারণ শুক্রের সব পানিই জলচক্রের মধ্যে ছিল এবং এভাবেই উবে গেছে।

এখন চ্যানেলগুলোর উৎপত্তি সম্পর্কে তত্ত্বে আসা যাক। মঙ্গলের উচ্চ অঞ্চলের অভ্যন্তরে যে তরল জলতল তারও উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে ৪-৫ কিলোমিটার বেশি। এই উচ্চ জলতলের চাপ নিম্ন অঞ্চলের জলতল ও তা যে বরফের চাদরে আবৃত তার উপর প্রচণ্ড উর্দ্ধ চাপের সৃষ্টি করে। এই চাপে বরফ আবরণ ফুঁড়ে এই পানি পৃষ্ঠদেশে বের হয়ে এসেছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে এই স্রোত বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেনি জল চক্রের অভাবে। আর একটি বিকল্প তত্ত্ব হলো ভূমি ধসের ফলে বিচ্যুত শিলা খণ্ডগুলো উপরের উম্মুক্ত বরফ স্তরের পিছল হওয়ার সুযোগে গতি লাভ করেও ফাটল ও জলস্রোতের সৃষ্টি করতে পারে। এভাবে কোন না কোন ভাবে চাপের কারণে আভ্যন্তরীণ পানি বের হয়ে এসে কোথাও কোথাও সমুদ্রেরও সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তা শিগ্‌গির জমে বরফ হয়ে গেছে, যা পরে হাওয়া হয়ে উড়ে গিয়ে মেরু অঞ্চলে ও উচ্চ অঞ্চলে বরফের স্তুপ গড়েছে। অধিকাংশ জায়গায় অবশ্য পরে বরফের চাদর ধূলায় ও লাভায় ঢেকে গেছে। এই প্রক্রিয়াটি খুব সম্ভব অতীতে বার বার হয়েছে। ভাইকিং এর ছবির সঙ্গে মঙ্গলের দীর্ঘদিনে গড়ে তোলা ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ঐ প্রাচীন চ্যানেল ও উপত্যাকাগুলো শুধু মঙ্গলের প্রাচীনতম শিলার অঞ্চলেই দেখা যাচ্ছে। এতে মনে হচ্ছে ওভাবে পানির স্রোত বয়ে গিয়েছিল মঙ্গলের একেবারে শৈশবে। তারপর পানি শুকিয়ে গেছে ও অভ্যন্তরে চলে গেছে।

আরো সাম্প্রতিক গবেষণা বর্তমান তরল পানির উপস্থিতি সম্পর্কেও কিছুটা আশান্বিত করেছে। ২০০৪ সালে মহাশূন্যযান রোভার অপরচুনিটি এক সময় যে মঙ্গলের পানি পৃষ্ঠের উপরেই ছিল তার আরো সাক্ষ্য পেয়েছে। ২০০৬ সালে নাসার মার্স গ্লোবাল সার্ভেয়ারও দাবী করেছে যে পানির প্রবাহের নমুনা এখনই দেখা যাচ্ছে, এবং তা মাঝে মাঝে পরিবর্তনও হচ্ছে। তবে এগুলো এখনো সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য কেউ কেউ বলছেন এসব পর্যবেক্ষণ পানি প্রবাহ বলে যাকে সন্দেহ করছে, ধূলো-বালির প্রবাহেও এমনটি হতে পারে। এ সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। ২০১১ সালের জুলাই মাসে কিছু গবেষণার যে ফল প্রকাশিত হয়েছে তাতে বর্তমান পানির আরো অকাট্য প্রমাণ মনে হয় পাওয়া যাচ্ছে। সাম্প্রতিক মার্স রিকন্যাশান্স অরবিটারের তোলা নানা মৌসুমে তোলা একই জায়গার ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে অনেকগুলো স্পষ্ট জলরেখা, বাধা পেলে সেখানে বেঁকেও যাচ্ছে। তবে এ শুধু গরম কালে, শীতকালে রেখাগুলো থাকেনা। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন এটি লবণাক্ত পানি, তাই পানিকে তরল

রাখার মত উত্তাপ গরমকালেও না থাকা সত্ত্বেও এই জলরেখাগুলো জমাট বেঁধে একাকার হয়ে যাচ্ছেনা। কারণ লবণ পানি পানির হিমাংককে বেশ খানিকটা নামিয়ে ফেলে। গবেষণাটির সঙ্গে জড়িত বিজ্ঞানীরা একে মঙ্গলের পৃষ্ঠেই মৌসুমী তরল পানির উপস্থিতির খুব ভাল নমুনা মনে করছেন।

মহাশূন্যযান থেকে তোলা ছবির ভিত্তিতে ২০১১ সনের গবেষণা ফল: মঙ্গলে বর্তমান লবণাক্ত জলরেখার ইঙ্গিত

মঙ্গলে প্রাণের আলামত নিয়ে গবেষণা

প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে মানুষের ভাবনা অনেক দিন ধরে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে দূরবীক্ষণে মঙ্গলে অনেকগুলো কৃত্রিম খালের মত জিনিস দেখে বিজ্ঞানীরা সেখানে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব রয়েছে এমন ধারণা করেছিলেন। পরে বুঝা গেছে খালের মত জিনিসগুলো নেহাৎ দৃষ্টি বিভ্রম ছাড়া কিছু নয়।

ম্যারিনার মহাশূন্যযানগুলো মঙ্গলের কাছে দিয়ে ভ্রমণ করে অনুসন্ধান ও ছবি পাঠাবার কাল থেকেই আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে মঙ্গলে এখন সাগর নদী, খাল কিংবা কোন জলাধার নেই। জটিলতর কোন রকম জীবের উপস্থিতির ইঙ্গিত হতে পারে এমন কোন আলামতই এতে আবিষ্কৃত হয়নি। মঙ্গলের পুরো পৃষ্ঠদেশ ছোট বড় অসংখ্য উল্কা-খাদে ভর্তি। এতে প্লেইট টেকটোনিক বা আবহাওয়ার কারণে ভূমি অবক্ষয় বা পরিবর্তনের কোন চিহ্ন নাই। স্পষ্টত মহাজাগতিক রশ্মি অবাধে এর উপর এসে পড়ছে। এরকম অবস্থায় বহুকোষী জটিলতর জীবের তো নয়ই, পৃষ্ঠদেশে ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া থাকাও প্রায় অসম্ভব। কিন্তু মঙ্গলের মাটির নিচে তরল পানি থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা গবেষণায় ধরা পড়েছে। সেখানে অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া সদৃশ প্রাণি থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না।

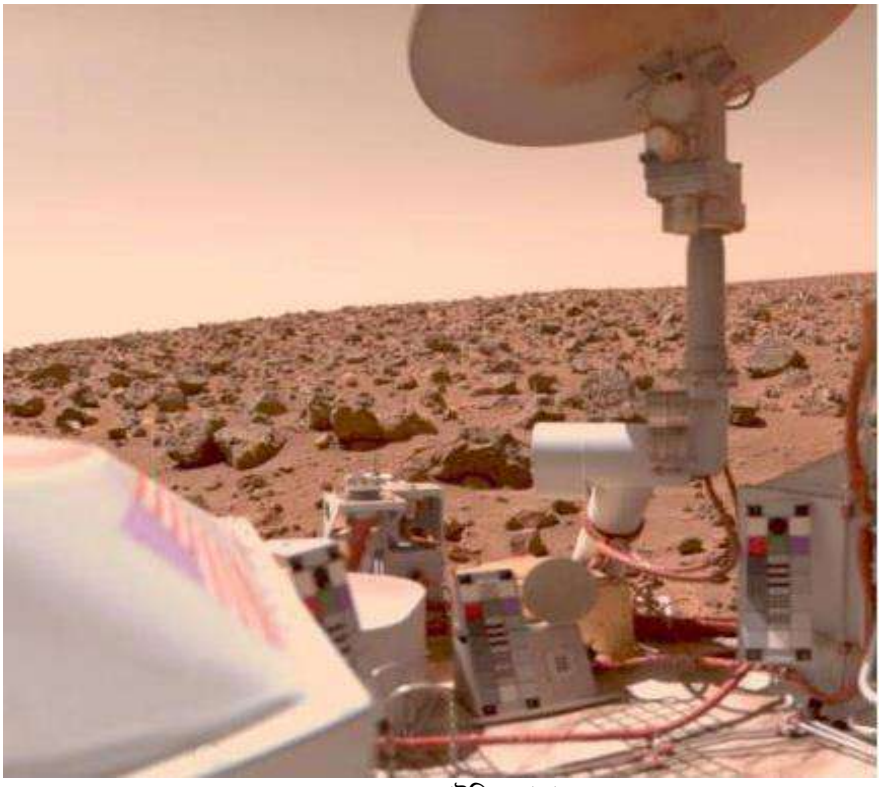

মঙ্গলের বুকে ভাইকিং ল্যান্ডার

১৯৭৬ সালে ভাইকিং ল্যাণ্ডার মহাশূন্যযান মঙ্গলে বুকে অবতরণ করার পর সেখানে মাটির নিচে ক্ষুদ্র জীবের কোন আলামত পাওয়া যায় কিনা দেখতে চারটি জীবতাত্ত্বিক পরীক্ষণ সম্পন্ন করেছিল। এর মধ্যে একটি ছিল জীবের সঙ্গে জড়িত জৈব অণুর অনুসন্ধান। খুব সূক্ষ্ম রাসায়নিক পদ্ধতি গ্যাস ক্রোমেটোগ্রাফি ম্যাস স্পেকট্রোমিটার এই কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। মঙ্গলের ভূমির পরিবেশে এরকম কোন অণু পাওয়া যায়নি। যদি পাওয়া যেত তা হলে সেখানে ক্ষুদ্র জীবের উপস্থিতির একটি প্রাথমিক সাক্ষ্য হতো এটি।

আর একটি পরীক্ষণ ছিল গ্যাস বিনিময় সংক্রান্ত। এতে মঙ্গলের মাটিকে একটু উত্তপ্ত করে তুলে তার সঙ্গে পানি ও নানা জৈব ও অজৈব পুষ্টি দ্রব্য মেশানো হয়েছে। মাটিতে যদি কোন অণুজীব থাকে তাহলে এরকম পরিবেশে তাদের পক্ষে এসব পুষ্টিদ্রব্যজাত হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন, মিথেন ইত্যাদি গ্যাসের মধ্য থেকে কোন কোনটি গ্রহণ করা ও ত্যাগ করার ঘটনা ঘটবে,

এবং তা গ্যাস ক্রোমেটোগ্রাফিতে ধরা পড়বে। এক্ষেত্রেও নেতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেছে, গ্যাস বিনিময়ের কোন নমুনা পাওয়া যায়নি।

মঙ্গলের বুকে করা আর একটি পরীক্ষা বেশ চমকপ্রদ। এতেও মঙ্গলের মাটিতে পানি ও কিছু পুষ্টিদ্রব্য মেশানো হয়েছে। তবে এসব পুষ্টিদ্রব্যের অণুতে যে কার্বন রয়েছে তাতে সাধারণ কার্বনের আইসোটোপ কার্বন-১২ গুলোকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কার্বন-১৪ দিয়ে বদলে দেয়া হয়েছে। এরপর ওখানে তেজস্ক্রিয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড পাওয়া যাচ্ছে কিনা তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। যদি ঐ মাটিতে অণুজীব থাকে তা হলে সেগুলো তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ সহ পুষ্টিদ্রব্যগুলো গ্রহণ করবে ও সে সব দ্রব্য হজম করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত করবে। কাজেই উদ্ঘাটনে যদি দেখা যায় যে এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড স্বাভাবিক কার্বন-১২ এর বদলে কার্বন-১৪ এ গড়া তাহলে বুঝা যাবে যে কোন জীব ঐ পুষ্টিদ্রব্যকে হজম করেছে। এই ধরনের পরীক্ষণকে বলা হয় 'লেবেল লাগানো গ্যাস ত্যাগ'– সেভাবে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে চিহ্নিত করার জন্য তাতে যেন তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ এর লেবেল লাগানো হয়েছে– সেই কারণেই এই নাম। সত্যি সত্যি এরকম লেবেল লাগানো কার্বন-ডাই-অক্সাইড এ পরীক্ষায় পাওয়া গেছে। ভাইকিং ল্যাণ্ডারের নেয়া মঙ্গলের বুকে এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় ইতিবাচক ফল আসায় বিজ্ঞানীরা মঙ্গলের

মঙ্গলে জীবের উপস্থিতি নিয়ে পরীক্ষার জন্য
ভাইকিং এর নিয়ে যাওয়া যন্ত্রপাতি

মাটির ভেতর অণুজীব থাকা নিয়ে বেশ আশান্বিত হয়েছেন। তবে কিছু বিজ্ঞানী আবার এই সাফল্যের একটি বিকল্প ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে মঙ্গলের মাটিতে যদি খুব জোরালো অক্সিডেন্ট দ্রব্য থাকে তা হলে অজৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেই ঐ লেবেল লাগানো কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরি হতে পারে– অণুজীবের সাহায্য ছাড়াই। সেক্ষেত্রে মেশানো পানির সঙ্গে ঐ অক্সিডেন্ট বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস সৃষ্টি করবে যা কার্বন-১৪ সম্বলিত পুষ্টিদ্রব্যের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বন-১৪ দিয়ে গড়া কার্বন-ডাই অক্সাইড তৈরি করতে পারে। তাঁদের মতে মঙ্গলের আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি যেভাবে অবারিত ভাবে পড়ছে তার প্রভাবে মাটিতে ওরকম জোরালো অক্সিডেন্ট সৃষ্টি বিচিত্র নয়। কাজেই এ পরীক্ষায় অণুজীবের উপস্থিতি যে নিশ্ছিদ্র ভাবে প্রমাণিত হয়েছে তা বলা যাবেনা।

মঙ্গলের বুকে নেয়া চতুর্থ জীবতাত্ত্বিক পরীক্ষণটি ছিল ওখানে কোন ব্যাকটেরিয়া সালোক সংশ্লেষণ ক্রিয়া করছে কিনা তা বুঝার চেষ্টা করা। এতে মাটিতে কার্বন–মনো-অক্সাইড এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে এই গ্যাসে স্বাভাবিক কার্বন-১২ কে তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ দিয়ে বদলে নেয়া হয়েছে। এখন যদি যেখানে সালোক সংশ্লেষণ করার মত কোন ব্যাকটেরিয়া থাকে তা হলে তা সূর্যালোকের সাহায্যে যথারীতি কার্বোহাইড্রেট তৈরি করবে। এই কার্বোহাইড্রেটের কার্বন অবশ্য কার্বন-১২ এর বদলে কার্বন-১৪ হবে। এটি হতে পারার মত সময় দিয়ে তারপর ঐ মাটিকে উত্তপ্ত করা হয়েছে যাতে সত্যিই কার্বো-হাইড্রেট গঠিত হয়ে থাকলে উত্তাপের ফলে তার থেকে কার্বন-১৪ বেরিয়ে আসবে। তেজস্ক্রিয় বলে এরকম কার্বন-১৪ উদ্ঘাটন সহজ। কিন্তু এই পরীক্ষার ইতিবাচক ফলে পাওয়া যায়নি। এভাবে ভাইকিং ল্যাণ্ডারের করা চারটি জীবতাত্ত্বিক পরীক্ষণের শুধু একটিতেই অণুজীব থাকার কিছু আলামত পাওয়া গেছে, যেটি সম্বন্ধেও সব বিজ্ঞানী নিশ্চিত নন।

তবে ভাইকিং ল্যান্ডারের কাল সেই ১৯৭৬ এর পরবর্তী সময়ের কিছু পরীক্ষণও গুরুত্বপূর্ণ মঙ্গলে অণুজীবের অনুসন্ধানে। বিশেষ করে ২০০৮ সালের মহাশূন্যযান ফিনিক্স ল্যান্ডার মঙ্গলে অবতরণ করে এ সম্পর্কে মূল্যবান কিছু তথ্য দিতে পেরেছে। রবোটিক যন্ত্রপাতি সহ এই মহাশূন্যযান ২০০৮ সালের ২৫শে মে মঙ্গলে নেমে ঐ বছরের ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত তার কাজ করে গেছে। একটি উদ্দেশ্য ছিল মঙ্গলের মাটির নিচে জীবের বসবাসযোগ্য পরিবেশ রয়েছে কিনা তা নির্ণয় করা। এ জন্য ঐ রোবটের ছিল আড়াই মিটার দীর্ঘ একটি হাত যা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে ভেতরটা বিশ্লেষণ করতে পেরেছে। এভাবে সেখানে দেখা গেছে যে মাটির ভেতরের অম্লতা, লবণাক্ততা, সেখানে আবদ্ধ পানি ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি অণুজীবের

উপস্থিতির অনুকূল। তবে একই সঙ্গে কিছু পারক্লোরেটের উপস্থিতিও পাওয়া গেছে যা অনুকূল নয়। মাটির নিচে বরফের উপস্থিতিও দেখা গেছে যা বাইরে আনার পর আস্তে আস্তে কর্পূরের মত উবে গেছে গলে যাওয়ার বদলে।

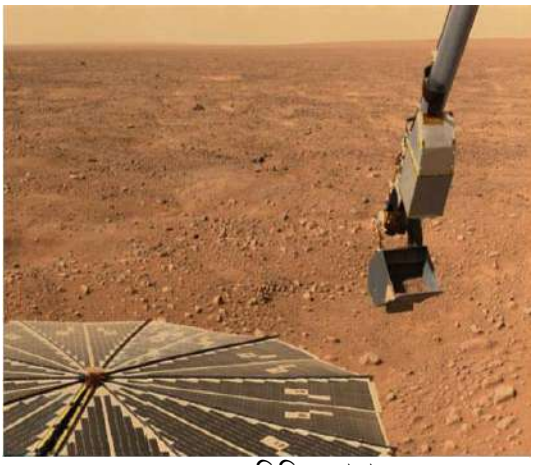

মঙ্গলের বুকে ফিনিক্স ল্যান্ডারঃ রোবট-হাতের মাধ্যমে ভূমি খনন

ফিনিক্স ল্যান্ডারের দ্বারা জৈব অণুর উপস্থিতি নিয়ে নূতন পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এর উপস্থিতির সম্ভাবনা নাকচ করা যাচ্ছেনা। ফলে ভাইকিং এর নেতিবাচক ফলাফলগুলোকে এখন পুনর্মূল্যায়ন করা হচ্ছে। একটি সন্দেহ হলো যে ভাইকিং ল্যান্ডার মঙ্গলে নামার সময় তার রকেটের থেকে বের হওয়া এক্সসট গ্যাসের প্রভাবে অবতরণ অঞ্চলের কাছাকাছি কিছুটা জায়গার অণুজীব ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। পরবর্তী কালের কিছু কিছু মহাশূন্যযান যেমন মার্স পাথ ফাইন্ডার, মার্স এক্সপ্লোরেশন রোভার ইত্যাদি নামার সময় গতি কমিয়ে আনতে রকেট ব্যবহার করেনি, বরং প্যারাসুটের সাহায্যে নেমেছে এবং তার যন্ত্রপাতিকে এয়ারব্যাগ দিয়ে ঘিরে পতনের আঘাত থেকে সুরক্ষা দিয়েছে। ফিনিক্স সহ পরের মিশনগুলোতে রকেটের জ্বালানিও বদলে ফেলা হয়েছে– যাতে হাইড্রোজেন জাতীয় এমন জ্বালানি ব্যবহার করা হয়েছে যার এক্সস্ট গ্যাস অণুজীবের জন্য ক্ষতিকর হবেনা। এ কারণে পরের দিকের পরীক্ষাগুলো বেশি নির্ভরযোগ্য হবার কথা।

অনেক বিজ্ঞানী মনে করছেন প্রাণের আলামত খোঁজার জন্য মঙ্গলের মাটিতে পরীক্ষা না চালিয়ে এর বায়ুমণ্ডলে তা চালালেই বরং ভাল হবে। বায়ুমণ্ডলে যে গ্যাসগুলো রয়েছে সেগুলো একটি ভারসাম্যে রয়েছে, তাই এগুলোর অনুপাত মোটামুটি একই থেকে যার। এখন এই ভারসাম্য সৃষ্টির দুটি উপায় থাকতে পারে। একটি হলো রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়ায় গ্যাসগুলো পরস্পর এরকম ভারসাম্যে উপনীত হয়। কিন্তু কোন গ্যাস যদি এমন হয় যা অন্যগুলোর সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এরকম ভারসাম্যে থাকার কথা নয়, তখন মনে করতে হয় যে জীবের উপস্থিতির জন্যই এমনটি ঘটেছে। জীব গ্যাস গ্রহণ করে, আবার গ্যাস ত্যাগও করে। সেক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়াটি বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য রাখতে সাহায্য করে। ২০০৩ সালে মঙ্গলের বাতাসে

মিথেন গ্যাসের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে। মিথেন একটি অস্থিতিশীল গ্যাস। বাতাসে এর পরিমাণ স্থিতিশীল রাখতে গেলে কোন না কোন উৎস থেকে নিত্য এটি কিছু কিছু উৎপন্ন হতে হবে। আর মিথেনের উৎস সাধারণত জৈব কিছুই হয়ে থাকে। মঙ্গলের বাতাসে যে পরিমাণ মিথেনের সন্ধান মিলেছে তাতে বছরে ২৭০ টন মিথেন নিয়মিত তৈরি হওয়া দরকার। এর একটি উৎস হতে পারে পতিত উল্কা দিয়ে বাহিত হয়ে। কিন্তু হিসাবে দেখা যায় প্রয়োজনের এক শতাংশেরও কম মিথেন এভাবে আসতে পারে। যদি মঙ্গলে আগ্নেয় সক্রিয়তা বা সমুদ্র অভ্যন্তরের গ্যাস উদ্গীরণ থাকতো তা হলে ওটাও একটি উৎস হতে পারতো। কিন্তু মঙ্গলে তা নেই। কাজেই অণুজীবই এর উৎস হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। ভবিষ্যতের মঙ্গল-অভিযান গুলোতে আরো বেশ কিছু সূক্ষ্ম পরীক্ষা চলাবার সিদ্ধান্ত হয়েছে, যা মঙ্গলে অণুজীবের উপস্থিতির বিষয়টি আরো ভালভাবে ফয়সালা করতে পারবে।

মঙ্গল থেকে আসা উল্কায় প্রাণের চিহ্ন

১৯৮৪ পৃথিবীতে একটি উল্কাখণ্ড আবিষ্কৃত হয় আন্টার্কটিক অঞ্চলে যাকে মঙ্গল থেকে আসা বলে সাক্ষ্য-প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত করা গেছে। চমকপ্রদ বিষয় হলো এই উল্কাখণ্ডে অতীত অণুজীবের কিছু আলামত রয়েছে বলে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন। আসলে এটি সহ মোট ১২টি উল্কাখণ্ড বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া গেছে যেগুলো মঙ্গল থেকে ছিটকে পৃথিবীতে এসেছে বলে মনে করা হয়। এর মধ্যে এই বিশেষ উল্কাটির সাংকেতিক নাম দেয়া হয়েছে ALH840001। প্রথমত প্রশ্ন উঠে আমরা কী ভাবে বুঝলাম যে উল্কাখণ্ডটি মঙ্গল থেকে এসেছে। এ বাকি ঐ ১১টার মত এটি আগ্নেয় শিলায় গঠিত– অর্থাৎ এটি এমন কোন জায়গার অংশ ছিল যেখানে আগ্নেয় সক্রিয়তা ছিল এবং তার ম্যাগমা থেকে খণ্ডটি তৈরি হয়েছে– যা

মঙ্গল থেকে আসা উল্কাখণ্ড: ALH840001
(নিচে ইঞ্চি রুলার স্কেলে আয়তন বুঝা যাচ্ছে)

একমাত্র গ্রহ সাইজের জিনিসেই সম্ভব। যে অসংখ্য উল্কাখণ্ড পৃথিবীতে সব সময় পাওয়া যায় সেগুলো সৌর জগতে বিচরণশীল ছোটখাট গ্রহাণু বা তার অংশ। সেগুলো আগ্নেয় শিলায় গঠিত হয়না। তাছাড়া এই বিশেষ উল্কাখণ্ডগুলোতে ফেরিক আয়রন রয়েছে ও পানি সহ কিছু উদ্বায়ী বস্তু ভেতরে আটকানো রয়েছে– যার থেকেও মনে হয় যে এরা গ্রহের অংশ, গ্রহাণুর নয়। হঠাৎ ধাক্কায় অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে পড়ার (শক্ হীটিং) চিহ্ন এই ১২টির প্রত্যেকের গায়ে রয়েছে। এরকম শক্ হীটিং ঘটতে পারে কোন কারণে খুব সজোরে উৎক্ষিপ্ত হবার সময়– গ্রহ থেকে মহাশূন্যে বস্তুখণ্ডটি উৎক্ষিপ্ত হবার সময় যেমনটি হতে পারে। এদের একটি নমুনায় গ্যাসের বুদবুদ সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেছে– যার বিশ্লেষণে এর উপাদানগুলো ঠিক মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের উপাদানের মতই পাওয়া গেছে। এই বারটি উল্কা যেহেতু নানা দিক থেকে একই রকম এবং সবই গ্রহজাত বলে প্রমাণিত, তাই এদের একটি মঙ্গল থেকে এসেছে বলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাওয়ায় বাকিগুলোও তা হবার সম্ভাবনা খুব বেশি।

ALH840001 উল্কা খন্ডটি ১৯৮৪ সালে আবিষ্কৃত হলেও পতনের চিহ্নগুলোর বয়স থেকে জানা গেছে যে এটি পৃথিবীতে এসে পড়েছিল ১৩ হাজার বছর আগে। ১.৯ কিলোগ্রাম ওজনের এই উল্কাখণ্ডটি শিলা গঠনের বয়স নির্ণয় করে বুঝা গেছে যে মঙ্গলের বুকে এর জন্ম হয়েছিল সাড়ে চারশত কোটি বছর আগে– অর্থাৎ মঙ্গলের একেবারে সৃষ্টির সময়ে। ওভাবেই এটি মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশে ছিল। কিন্তু খুব সম্ভব ওখানে কোন উল্কার আঘাতে খণ্ডটি ফেটে গিয়েছিল আরো ৫০ থেকে ১০০ কোটি বছর পর। এর ফলে এতে যে ফাটলগুলো দেখা দেয় তাতে পানি ঢুকে এবং কার্বনেট খনিজ জমে তা আদি অণুজীবের বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠেছিল। বর্তমানে তার মধ্যে এক কালে অণুজীব থাকার চিহ্ন পাওয়া যাওয়াতেই বিজ্ঞানীরা এমনটি ভাবছেন। অবশেষে ১.৬ কোটি বছর আগে একদিন বড় ধরনের কোন উল্কাপাতের আঘাতে এর একটি টুকরা খুব সজোরে মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। এসবের প্রমাণ তার গায়ে রয়েছে। এই উৎক্ষেপনের বয়সটি পাওয়া গেছে তার গায়ে মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবগুলোর বিশ্লেষণ থেকে। মূল শিলা থেকে খসে মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হবার পর থেকে সেখানকার অবারিত মহাজাগতিক রশ্মি খণ্ডটিকে জর্জরিত করেছে। ও ভাবেই এটি মহাশূন্যে গতিশীল থেকেছে যতক্ষণ পর্যন্ত না ১৩ হাজার বছর আগে পৃথিবীর আন্টার্কটিক অঞ্চলে পতিত হয়েছে।

আবিষ্কারের পর থেকে উল্কাখণ্ডটির উপর প্রচুর গবেষণা হয়েছে। বিশেষ করে এতে প্রাণের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা সেই ব্যপারে বিজ্ঞানীদের প্রচুর কৌতুহল ছিল। একসময় এতে অণুজীবের অস্তিত্ব ছিল এমন কিছু পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

আবার এমন কিছু চিহ্ন দেখা গেছে যাকে আরো প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে মনে করছেন কোন কোন বিজ্ঞানী। সাধারণ যে কোন শিলায় যে কার্বন থাকে তাতে কার্বনের দুটি ভিন্ন আইসোটোপ কার্বন-১২ ও কার্বন-১৩ এর একটি নির্দিষ্ট অনুপাত থাকে। কিন্তু ওতে যদি জীবের সক্রিয়তা থাকে তা হলে এই অনুপাত খনিকটা বদলে যায়। উল্কাখণ্ডটিতে অনুপাতটি এমনভাবে পাওয়া যাচ্ছে যে তাতে অতীত অণুজীবের অস্থিত্বের দিকে কিছুটা ইঙ্গিত করে। ব্যাকটেরিয়ার দেহজাত অণু ভেঙ্গে যে ধরনের হাইড্রোকার্বন সাধারণত তৈরি হতে দেখা যায় এমন কিছু অণু ঐ উল্কা খণ্ডে পাওয়া গেছে। তাছাড়া ব্যাকটেরিয়ার সক্রিয়তা খনিজের মধ্যে যে ধরনের পরিবর্তন আনে অনেকটা সে রকম কিছু পরিবর্তন এর মধ্যে দেখা গেছে। এসবকে অণুজীবের অতীত উপস্থিতির পরোক্ষ সাক্ষ্য বলে মনে করা যেতে পারে। আণুবীক্ষণিক ভাবে এর মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে ক্ষুদ্র কার্বোনেট দানার এমন বিন্যাস যাতে একের পর এক নানা অংশে (সেগমেন্ট) গড়া এক রকম ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়ার প্রতিকৃতি ফুটে উঠে। অনেক বিজ্ঞানী একে ব্যাকটেরিয়ার ফসিল বলে সন্দেহ করছেন।

১৯৯৬ সালে এই উল্কাখণ্ডের মধ্যে আরো চমকপ্রদ আবিষ্কার হয়েছে ইলেকট্রন-মাইক্রোস্কোপ ছবিতে অতি ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়ার মত অবয়ব ফুটে উঠেছে ঐ উল্কাখণ্ডের একাংশে। এটি বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে সবার মধ্যে। তবে শিগ্‌গির অন্য বিজ্ঞানীদের থেকে এমন মতও আসলো যে আসলে অনেক জৈব অণুর সাধারণ প্রতিকৃতিও এরকম হতে পারে– একে ব্যাকটেরিয়ার ফসিল হতে হবে কোন এমন কথা নাই।

২০০৯ ফলে আরো সূক্ষ্ম নূতন পরীক্ষায় অণুজীবের আরো ভাল সাক্ষ্য পাওয়া গেছে ঐ উল্কাখণ্ডের মধ্যে। এতে ম্যাগনেটাইট নামক লোহা সম্বলিত খনিজ পাওয়া গেছে– যার চৌম্বক গুণ রয়েছে। ওখানে এই ম্যাগনেটাইট যে রকম স্ফটিকের আকারে পাওয়া গেছে সেরকমটি অবাত অণুজীবের মধ্যে সাধারণত দেখা যায়।

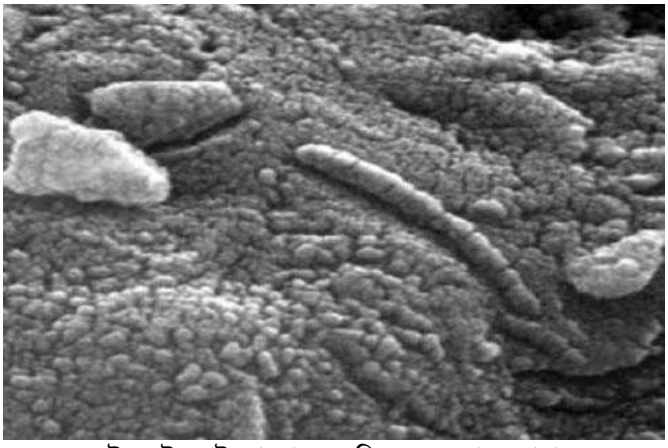

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের ছবিতে মঙ্গল থেকে আসা উল্কাখন্ডে (ALH840001) ব্যাকটেরিয়া ফসিলের আভাস

আমরা সবাত এবং অবাত (এরোবিক ও এনোরোবিক) এই দুরকম অণুজীবের সঙ্গেই পরিচিত। সবাতগুলোতে অক্সিজেন দরকার হয় তাই এরা শুধু বাতাসের মাধ্যই বাড়তে পারে। অবাত অণুজীবগুলো খুব কম অক্সিজেনের পরিবেশে থাকে বদ্ধ জায়গায়, সুইয়ারেজে। বেঁচে থেকে বংশ বৃদ্ধির জন্য এরা সব সময় অক্সিজেন-ঘাটতির জায়গাগুলোর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং এ কাজে পৃথিবীর ভূ-চুম্বকত্বকে ব্যবহার করে নিজের গতিপথের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে। সেটি যেন করতে পারে এ জন্যই অবাত ব্যাকটেরিয়া নিজের দেহে ম্যাগনেটাইট তৈরি করে। সেক্ষেত্রে ম্যাগনেটাইটের স্ফটিক কণা যে ধরনের হয়ে থাকে ঐ উল্কাখণ্ডে পাওয়া ম্যাগনেটাইট অনেকটা সেরকম। এটি তাই এতে এই উল্কায় এক সময় অবাত ব্যাকটেরিয়া থাকার একটি সাক্ষ্য হিসাবে মানা যেতে পারে। আর মঙ্গলের অক্সিজেনহীন পরিবেশে সেখানকার ব্যাকটেরিয়াতো অবাত ধরনেরই হবার কথা।

মোটের উপর মঙ্গলে অণুজীবের বর্তমান বা অতীত উপস্থিতি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা নানা সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যথেষ্ট আশাবাদী। কিন্তু এর চূড়ান্ত প্রমাণ পেতে এখনো বাকি। পৃথিবীর বাইরে অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্বের সে রকম কোন চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি এখনো।

ইউরোপায় প্রাণের সম্ভাবনা

মঙ্গলের পরেই সৌরজগতের যেখানে প্রাণের সবচেয়ে ভাল সম্ভাবনা রয়েছে যে জায়গা আমাদের কাছ থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি দূরে– তা হলে বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপা। ইউরোপা চাঁদের চেয়ে কিছুটা ছোট, পাথুরে সিলিকেটে গড়া হলেও একেবারে কেন্দ্রে লোহা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিক থেকে একে পৃথিবী-সদৃশ গ্রহগুলোর সমপর্যায়ের মনে করা যায়। সমস্যা হলো এটি রয়েছে সৌর জগতের শীতল অঞ্চলে, এর পৃষ্ঠদেশের গড়পড়তা উত্তাপ -১৬০° সেলসিয়াস। পৃথিবী-সদৃশ গ্রহগুলোর সঙ্গে তার আর একটি অমিল হলো এতে উল্কা সৃষ্ট বা অন্য কোন রকম খাদ, উঁচু-নীচু ভূমি এসব নেই। বরং পুরো সৌর জগতের মধ্যেই এর গা হলো সব চেয়ে মসৃণ। এর এই মসৃণতা অনেকদিন ধরেই বিজ্ঞানীদের জানা রয়েছে। ১৯৯৭ সালে 'গ্যালিলিও' মহাশূন্যযান বৃহস্পতি অঞ্চলে পৌঁছে কাছে থেকে ইউরোপার ছবি নিতে সক্ষম হয়। তার পাঠানো ছবিতে এর খুবই মসৃণ তলে সরু কিছু ফাটল রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেখানে খানিকটা খাদের মত আছে তা অত্যন্ত অগভীর। পৃথিবীতে পানিতে ভাসা বরফের চাঁইগুলো উপর থেকে যেমনটি দেখতে অনেকটা তাই। ইউরোপার পৃষ্ঠদেশ যে বরফে ঢাকা ও তাই এমন মসৃণ-সেটি প্রায় নিশ্চিত। গ্যালেলিওর পাঠানো ছবি থেকে মনে হচ্ছে এ বরফ

গ্যালিলিও মিশন

বড় বড় টুকরায় বিভক্ত। পৃথিবীতে সমুদ্রতলে ভূত্বকের বড় বড় প্লেইটগুলোর কিনারা যেমন ছেনি আকৃতিতে তেরচা হয়ে নেমে যায় ইউরোপার এসব ফাটলেও তেমনটি দেখা যায়। ভূত্বকের টুকরাগুলো নিচে তরল জিনিসের উপর ভাসছে বলে এমন হয়। তার পুরো বয়সে বহু উল্কাপাতের আঘাতে জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও খাদের সংখ্যা যে নগণ্য তার কারণ অভ্যন্তরের সক্রিয়তা। ভিন্ন বস্তুতে হলেও এখানেও পৃথিবীর মত আগ্নেয় সক্রিয়তা ও টেকটোনিক প্লেইটের গঠন পুনর্গঠন রয়েছে, যার ফলে খাদগুলো কিছু সময় পর পর মুছে গেছে।

সবকিছু নির্দেশ করছে যে ইউরোপার পৃষ্ঠে বরফের তলায় পানি রয়েছে। উপরে শীতল আবহাওয়া পানির বরফ জমিয়ে রাখলেও ভেতরটায় কিন্তু জোয়ার-ভাটার সৃষ্ট আভ্যন্তরীণ বরফ গলে পানি হয়ে আছে। ছবিতে ঐ যে ফাটলগুলো তা তলার পানি বা প্যাঁজা গলন্ত বরফের উপরে উঠে আসার চেষ্টার ছবি, যা অবশ্য উপরে এলেই বরফ হয়ে যায়। ফাটলগুলোর প্রশস্ততা ২০ কিলোমিটারের মত। উপর থেকে ছবিতে দেখা যায় ফাটলের কিনারাগুলো গাঢ় রঙের ফিতার মত কিন্তু মাঝখানটা হালকা রঙের ফিতার মত। ঐ প্যাঁজা বরফ উঠে আসা ধরে নিলে এই ইমেজগুলো ব্যাখ্যা করা যায়। গ্যালিলিও মিশনের ছবিতে ইউরোপার কোন কোন বিস্তৃত জায়গা অপেক্ষাকৃত একটু গাঢ় দেখা যায়। এসব জায়গায় বরফের সঙ্গে খনিজ মেশানো আছে বলে মনে হয়। তাছাড়া গ্যালিলিওর থেকে পাওয়া উপাত্ত অনুযায়ী ইউরোপায় একরকম আবিষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে। এরকম চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হতে পারে ভেতরে বিদ্যুৎ পরিবাহী তরলের ঘূর্ণন প্রবাহ থাকলে। মনে হচ্ছে যে বরফের তলার পানি আসলে একরকম লবণ পানি যা বিদ্যুৎ পরিবাহী। উপরের বরফ ও তলার পানি মিলে স্তরটির পুরুত্ব ১০০ কিলোমিটারের মত হতে পারে বলে মনে হচ্ছে। কাজেই পানির পরিমাণ বিশাল। বরফ পৃষ্ঠের উপরে একটি বায়ুমণ্ডল রয়েছে বটে তবে তা

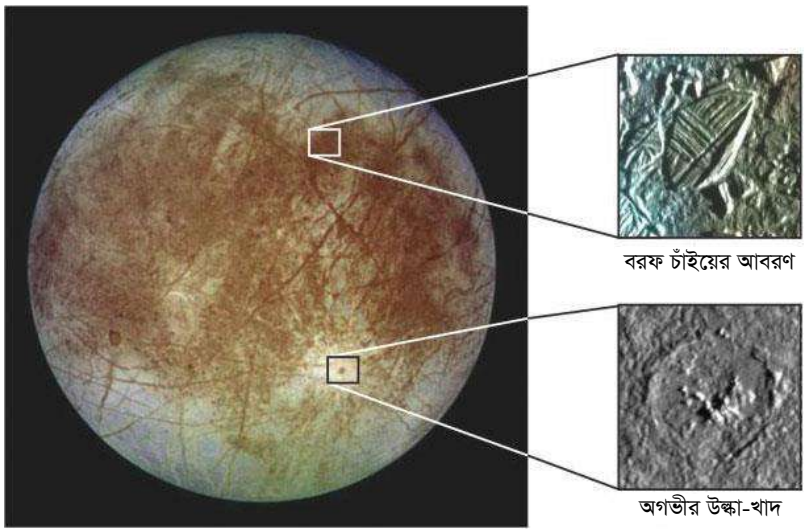

গ্যালিলিও মিশনের ছবিতে ইউরোপা

এতই পাতলা যে পৃথিবীর বায়ুম্ণ্ডলের তুলনায় একেবারে নগণ্য। বায়ুচাপ পৃথিবীর মাত্র ১০$^{-১২}$। এই বাতাস প্রায় পুরোটা অক্সিজেনে গড়া। সূর্যের আলট্রা ভায়োলেট রশ্মিতে বরফের পানি অণু বিশ্লিষ্ট হয়ে এই অক্সিজেন সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই জীবের কাজের দ্বারা অক্সিজেন সৃষ্টি হয়েছে এ কথা বলা যাবেনা, যেমনটি পৃথিবীতে হয়েছে। তা না হলেও ইউরোপায় অণুজীব থাকার ভাল পরিবেশ রয়েছে বৈকি।

ইউরোপার এই জীবন-অনুকূল জায়গাটি হলো বরফের নিচে সেই পানির বিরাট সঞ্চয়ে– যা কিনা পুরো উপগ্রহ জোড়া এক বিশাল সমুদ্র। একটি জিনিস অবশ্য লক্ষ্যণীয় যে এখানকার সম্ভাব্য অণুজীব বাইরে সূর্যালোকের ছোঁয়া পায়না– তাই তারা সালোক সংশ্লেষণে খাদ্য তৈরি করতে পায়না। তার বিকল্প পদ্ধতি হতে পারে পৃথিবীর মতই সমুদ্র তলের আগ্নেয় সক্রিয় অঞ্চলে হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি গ্যাস নির্গমণ। আর ইউরোপার বরফতলার সমুদ্রে প্রাণকে যে অক্সিজেনের অভাবে অবাত ব্যাকটেরিয়া হতে হবে এমন কথা নাই। বাইরের আলট্রা-ভায়োলেট, মহাজাগতিক রশ্মি ইত্যাদির কারণে বরফের পানির অণু বিশ্লিষ্ট হয়ে যে অক্সিজেন সৃষ্টি হয়েছে তার একটি বড় অংশ ক্রমে ক্রমে তলার পানিতে দ্রবীভূত হয়ে জমেছে। এভাবে পৃথিবীর সব সমুদ্রের চেয়ে অনেক বেশি অক্সিজেন এই পানিতে রয়েছে– যা সেখানে দ্বিগুণ পরিমাণ জীব পোষণে সমর্থ। অনেকে মনে করেন শুধু ব্যাকটেরিয়া নয়, নানা জলজ জীবের বৈচিত্রময় ইকোসিষ্টেমও সেখানে থাকা সম্ভব।

যদিও সম্ভাবনাগুলো খুব উজ্জ্বল তবুও এখনো তা বৈজ্ঞানিক অনুমান মাত্র। একে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করতে হলে আমাদেরকে ইউরোপায় আমাদের কোন রোবট দূতকে নামাতে হবে, যাতে করে সরজমিনে ঐ বরফ-তলার সমুদ্রের উপস্থিতি

নিশ্চিত করতে পারে, এবং সেখানে প্রাণের অস্তিত্বও উদ্ঘাটন করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের মহাশূন্য সংস্থা নাসা আর ইউরোপীয় মহাশূন্য সংস্থা এসা উভয়েরই এ ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে। বিচরণকারী রোবট ইউরোপায় ঘোরাফেরা করে অনুসন্ধান করবে এমন পরিকল্পনা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে সজোরে এক ধরনের ক্ষেপনাস্ত্র দিয়ে আঘাত করে উপরের বরফ নিয়ন্ত্রিত ভাবে ভেঙ্গে বা ভেদ করে নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পরিকল্পনা। ওভাবেই নিশ্চিত জানা যাবে ইউরোপায় প্রাণ সম্পর্কে আমাদের আশাবাদ কতখানি সঠিক।

টাইটানে ভিন্ন ছাঁদের প্রাণ?

সৌর জগতের সব চেয়ে বড় উপগ্রহ শনির টাইটানে প্রাণের সম্ভাবনা নিয়ে অতি সাম্প্রতিক কিছু আবিষ্কার বেশ আশার সঞ্চার করেছে। তবে সেখানে প্রাণ থাকলে তাকে হতে হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছাঁদের। এই উপগ্রহ বুধ গ্রহের চেয়েও বড়, তাই এর ঘন বায়ুমণ্ডল রয়েছে যা নাইট্রোজেন ছাড়াও মিথেন ইথেনসহ নানা রকম হাইড্রোকার্বনে সমৃদ্ধ। বায়ুমণ্ডলে এবং তার নিচে এসব জৈব যৌগের প্রচুর উপস্থিতিই এতে প্রাণের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছে।

১৯৭৯ সলে পাইওনিয়ার-১১ ছিল শনি গ্রহের অঞ্চলে পৌঁছানো প্রথম মহাশূন্যযান। তখনই কিছুটা কাছে থেকে টাইটানের ছবি প্রথম পাওয়া যায়। এরপর ১৯৮০ সালে ভয়েজার-১ এবং ১৯৮১ সালে ভয়েজার-২ টাইটানের পাশ দিয়ে চলে গিয়ে এর কিছু অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছে। কিন্তু টাইটানের বায়ুমণ্ডল ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন থাকে বলে তার ভেতর সম্পর্কে বেশি কিছু জানা তখন সম্ভব হয়নি। এই অবস্থার অবসান হয়েছে ২০০৪ সালে ক্যাসিনি হাইগেন নামক মহাশূন্যযান টাইটানের অঞ্চলে পৌঁছার পর। এতে ক্যাসিনি টাইটানকে বাইরে সর্বনিম্ন ৮৮০ কিলোমিটার দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করলেও তার থেকে অনুসন্ধানী যান হাইগেন এর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে টাইটানের গায়ে অবতরণ করেছে ২০০৫ সালের ১৪ জুন। আর ২০১০ সালে

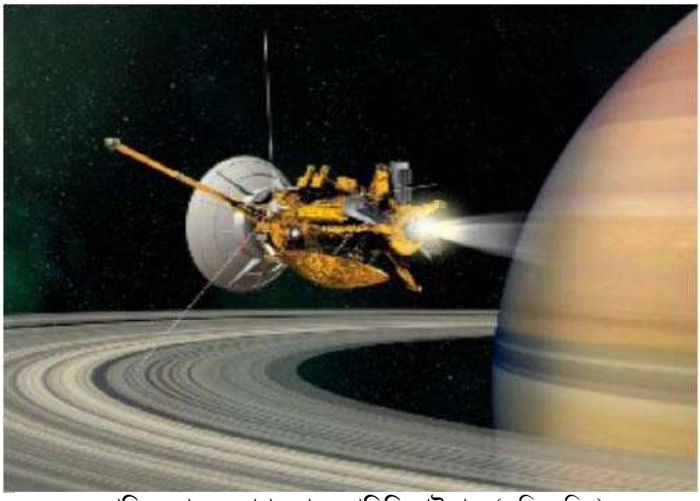

শনির জগতে মহাশূন্যযান ক্যাসিনি-হাইগেন্স (কল্পিত চিত্র)

এর তথ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন প্রাণের সম্ভাবনা নিয়ে সব চেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য।

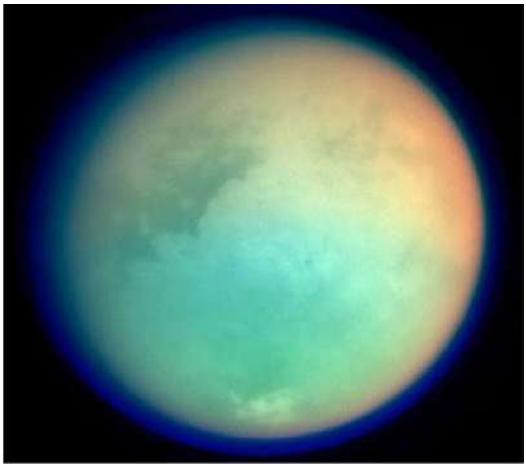

টাইটানের মেঘ

টাইটান মূলত গড়া পানির বরফ ও পাথুরে শিলা দিয়ে। ক্যাসিনি মিশন টাইটানের উত্তর মেরু অঞ্চলে তরল হাইড্রোকার্বনের (ইথেন ইত্যাদি) হ্রদ খুঁজে পেয়েছে। ক্যাসিনির রাডার ইমেজে মসৃণ কিছু অঞ্চল মিথেনের হ্রদ বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া দৃশ্য আলো ও ইনফ্রা-রেড ম্যাপিং স্পেকট্রোমিটারে স্পষ্টত তরল ইথেন উদ্ঘাটিত হয়েছে। এর ফলে এটিই হয়েছে পৃথিবীর বাইরে আবিষ্কৃত কোন জায়গায় পৃষ্ঠদেশে তরলের একমাত্র উপস্থিতি। টাইটানের বায়ুচাপ পৃথিবীর প্রায় দেড় গুণ। এতে মিথেন ও ইথেনের ঘন কুয়াশাটি খুবই উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে বায়ুস্রোত ও এসিড বৃষ্টি সাধারণ ব্যাপার। টাইটানের পৃষ্ঠেও তাই মিথেন ও ইথেনের হ্রদ, সাগর, নদী ইত্যাদি যথেষ্ট থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। খুব সম্ভব পৃষ্ঠের গঠনের অনেকখানিই পৃথিবীর মত– শুধু পানির বদলে তরল হাইড্রোকার্বন, আর বাতাসেও হাইড্রোকার্বনের কুয়াশা। উত্তাপ খুব কম হওয়া সত্ত্বেও বাইরে হাইড্রোকার্বন তরল থাকতে পারে। অন্য দিকে পাথুরে অভ্যন্তরের ফাঁকে ফাঁকে পানির বরফ

প্যারাসুটের সাহায্যে হাইগেন্সের টাইটানে অবতরণ
(কল্পিত চিত্র)

থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে কোথাও কোথাও তরল পানি ও এমোনিয়ার মিশ্রণে ম্যাগমা রয়েছে। এমোনিয়া থাকার কারণে পানি −৯৭° সেলসিয়াস উত্তাপেও তরল থাকতে পারে।

টাইটানের অভ্যন্তরের এই বিষয়গুলো বুঝা গেছে মহাশূন্যযান ক্যাসিনি থেকেই। সেখান থেকে পাঠানো অত্যন্ত নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে আসতে দেখে এটি ধরা পড়েছে। এরকম প্রতিফলন টাইটানের পৃষ্ঠ থেকে ঘটার কথা নয়। বরং ভেতরে তরল আর বরফের মধ্যে সীমানা থেকেই এটি সম্ভব। এভাবে ভেতরে তরল পানির উপস্থিতি আন্দাজ করা যাচ্ছে। তাছাড়া অন্য উপগ্রহগুলোর মত টাইটানও বৃহস্পতির সঙ্গে জোয়ার-ভাটা দিয়ে সুসংবদ্ধ রয়েছে– অর্থাৎ এর এক দিক সব সময় স্থির বৃহস্পতির দিকে মুখ করে রয়েছে। তা সত্ত্বেও ২০০৫ ও ২০০৭ সালের মধ্যে ক্যাসিনি থেকে ধরা পড়েছে যে এই দু'বছরে

নামার পর হাইগেন্স থেকে তোলা টাইটান পৃষ্ঠের ছবি

টাইটানের পৃষ্ঠদেশ বৃহস্পতির নিরিখে ৩০ কিলোমিটারের মত সরে গেছে। এতেও মনে হচ্ছে টাইটানের যে কঠিন পৃষ্ঠদেশ ও তার কেন্দ্রীয় কঠিন কোর, তাদের মাঝে একটি তরল স্তর থাকার মাধ্যমে উভয়ে কিছুটা পরস্পর বিযুক্ত অবস্থায় রয়েছে।

২০১০ সালের জুনের সেই চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারটির একটি তথ্য হলো দেখা যাচ্ছে টাইটানের বায়ুমণ্ডল থেকে হাইড্রোজেন অণু নিচের দিকে অর্থাৎ পৃষ্ঠের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে আর পৃষ্ঠদেশে পৌঁছেই হারিয়ে যাচ্ছে। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব বুঝতে হলে আমাদেরকে পূর্ববর্তী একটি তত্ত্বের কথায় আসতে হবে– তা হলো পানির বদলে মিথেনের ভিত্তিতে গড়া জীবের সম্ভাবনা। মিথানোজেন নামে কথিত সম্পূর্ণ ভিন্ন ছাঁদের এরকম জীবের সম্ভাবনা তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। টাইটানে বাতাসের হাইড্রোজেন নিচে গিয়ে পৃষ্ঠে পৌঁছে হারিয়ে যাবার ব্যাখ্যা করা যায় এ ভাবে যে সেখানে মিথানোজেন জীব এটি নিয়ে নেয়, যে ভাবে পৃথিবীর জীব অক্সিজেন গ্রহণ করে অনেকটা সেভাবে। এসম্পর্কে দ্বিতীয় সাক্ষ্যটি এসেছে টাইটানের হাইড্রোকার্বন সমৃদ্ধ ঐ বায়ুমণ্ডলে যে অনুপাতে এসিটিলিন থাকার কথা তার চেয়ে কম থাকাটি। এই এসিটিলিন আবার তাত্ত্বিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত মিথানোজেন জীবের জন্য সব চেয়ে ভাল 'খাদ্য' (দেহে শক্তির উৎস) হবার কথা। এটি ইঙ্গিত করছে যে ঐ জীব সব সময় কিছুটা এসিটিলিন ব্যবহার করে ফেলছে বলে বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্যে এসিটিলিনের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে।

টাইটানের বায়ুমণ্ডলের আরো একটি বিষয় এতে প্রাণের উপস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে। আমরা আগেও দেখেছি বায়ুমণ্ডলে মিথেনের একটি স্থায়ী ভারসাম্যকে জীবের

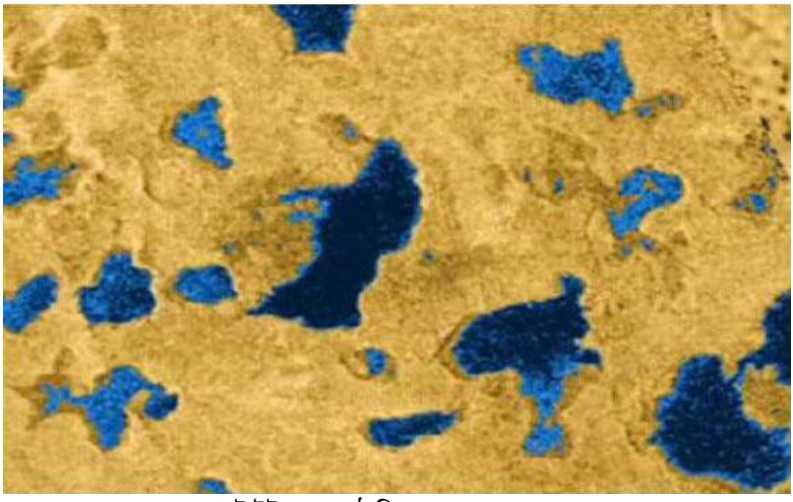

টাইটানের পৃষ্ঠে মিথেন হ্রদের আভাস

উপস্থিতি ছাড়া ব্যাখ্যা করা কঠিন, অথচ টাইটানের বায়ুমণ্ডলে তাই রয়েছে। সূর্য রশ্মির প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের মিথেন ক্রমাগত জটিলতর হাইড্রোকার্বনে (ইথেন ইত্যাদি) পরিণত হয়। তাই বায়ুমণ্ডলে তার স্থিতিশীলতা বজায় থাকতে হলে তার অন্য কোন উৎস প্রয়োজন। টাইটানের বায়ুমণ্ডলে ৯৮.৪% নাইট্রোজেন, এবং বাকি ১.৬% এর মধ্যে ১.৪% মিথেন ও বাকিটা প্রধানত হাইড্রোজেন। এই ১.৪% ধরে রাখতে হলে ক্রমাগত সরবরাহ করার জন্য মিথেনের একটি উৎস প্রয়োজন যা জীব হওয়াটিই স্বাভাবিক। এর অন্য একটি বিকল্প উৎস হতে পারতো বাইরে থেকে ধূমকেতু বাহিত হয়ে মিথেন আসা। কিন্তু সেই সম্ভাবনা অপ্রমাণিত হয়েছে কারণ ধূমকেতুতে মিথেনের সঙ্গে সব সময় কার্বন-মনো-অক্সাইড থাকে। অথচ টাইটানে মিথেনের পরিমাণ কার্বন-মনো-অক্সাইডের চেয়ে হাজার গুণ বেশি। সব দিক বিবেচনায় তাই মনে হচ্ছে মঙ্গল গ্রহ ও বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপার মত সৌর জগতে জীবের উপস্থিতির সম্ভাবনা উজ্জ্বল শনির উপগ্রহ এই টাইটানে। অবশ্য এখানকার জীব আমাদের পরিচিত জীবের চেয়ে ভিন্ন ছাঁদের হবার কথা।

গ্রহকে গড়ে নেয়া

বড় মাপের আয়োজনঃ ভূ-পরিবর্তন

পৃথিবীর বাইরে গিয়ে বসত স্থাপন করার জন্য সুবিধাজনক জায়গাগুলো হতে পারে যেখানে ইতোমধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে সেখানে। কারণ সেখানে জীবের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু আমরা দেখেছি সে রকম প্রাণের অস্তিত্ব থাকলেও তা অণুজীব হবারই সম্ভাবনা বেশি, আমাদের বসবাসের জন্য সব দিক থেকে অনুকূল তা নাও হতে পারে। আর যেখানে বর্তমানে প্রাণের অস্তিত্ব নেই সেখানেও যে আমরা নিজেদের জন্য উপযুক্ত বসত গড়ে নিতে পারবোনা সে কথাও ঠিক নয়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই নিজেদের বসত স্থাপন করার সময় আমাদেরকে সে বসতের পরিবেশ নিজেদের মত করেই গড়ে নিতে হবে। তবে এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কিছু ব্যাপক মাপের চিন্তা ভাবনা রয়েছে যাতে কোন গ্রহ বা উপগ্রহের ভূমি, বায়ুমণ্ডল ইত্যাদিকে সার্বিক ভাবে দীর্ঘ মেয়াদী বিশাল কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেব আমরা নিজেরা। কোন কোন ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দ্রুত পরিবর্তন এভাবে এলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি সম্পন্ন হবে ধীরে ধীরে বহুকাল ধরে। লক্ষ্যটি হলো এভাবে একে ক্রমে ক্রমে আমাদের বসবাসের জন্য বেশি বেশি উপযুক্ত করে গড়ে নেয়া হবে। এই কার্যক্রমকে বলা হয় টেরাফর্মিং বা ভূ-পরিবর্তন।

এটি এখনো ভবিষ্যতের জন্য আ্মাদের পরিকল্পনার একটি বিষয় মাত্র। কিন্তু এই অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্খী চিন্তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে ঐ জায়গাগুলোর বর্তমান পরিস্থিতি ভালভাবে জানার ও অনুধাবন করার চেষ্টা, এবং সেখানে পরিবর্তনের সুযোগ কী ধরনের রয়েছে তার বৈজ্ঞানিক সম্ভাব্যতা যাচাই। আমাদের বর্তমান প্রযুক্তি এবং অদূর ভবিষ্যতের প্রযুক্তিগুলোকে এই কাজের উপযোগী করে তুলতে হলে সেগুলোকে কীভাবে সক্ষম করে নিতে হবে, এত বিশাল কর্মযজ্ঞে কী ধরনের অর্থনৈতিক বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে, এবং সেটি আমাদের সাধ্যের মধ্যে থাকবে কিনা– ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়েও এখনই প্রচুর গবেষণা চলছে। টেরাফর্মিং বিজ্ঞানীদের কাছে এখনই তাই তাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও বাস্তব পরীক্ষণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

স্বাভাবিক ভাবেই এ নিয়ে সব চেয়ে বেশি চিন্তা ভাবনা হচ্ছে মঙ্গল গ্রহকে ঘিরে। পৃথিবীর সঙ্গে এর সাদৃশ্য, এর তুলনামূলক নৈকট্য, এবং অপেক্ষাকৃত 'অল্প' পরিবর্তনেই একে বসবাসের জন্য গড়ে নেয়া যাবে এমন ধারণাই মঙ্গলের ভূ-পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা বেশি হচ্ছে।

মঙ্গলের উত্তাপ কীভাবে বাড়াবো ?

আমাদের বসবাসের জন্য মঙ্গলকে গড়ে নিতে হলে মোটা দাগে প্রধান কাজগুলো হবে মঙ্গল পৃষ্ঠের উত্তাপ বাড়ানো, এখানে তরল পানির সৃষ্টি করা, এবং বায়ুমণ্ডলের চাপ ও গঠনকে মানুষের উপযোগী অবস্থায় পরিবর্তিত করা। এই তিনটি জিনিসই এখন স্বাভাবিক ভাবে মঙ্গলে বসবাসের পথে বড় বাধা। মঙ্গলের পৃষ্ঠ খুবই শীতল, মানুষের বসবাসের জন্য অনুপযুক্ত। পৃষ্ঠদেশের কোথাও কোথাও বরফ চাদর থাকলেও এখানে তরল পানি নেই, যদিও মাটির নিচে তা থাকতে পারে। বায়ুমণ্ডলের চাপ খুব কম– এই চাপে কৃত্রিম ব্যবস্থা ছাড়া আমরা বাঁচবোনা। তাছাড়া এই বায়ুমণ্ডলের গঠনও মানুষের জীবনের অনুকূল নয়। উত্তাপ, পানি, বায়ুমণ্ডল ইত্যাদির সুরাহা হলে হয়তো একদিন খোলামেলা মঙ্গলে একটি অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে মানুষ ও অন্যান্য জীবের জন্য। তবে আরো নানা সমস্যারও সমাধান করতে হবে। মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর চেয়ে অনেক কম। আমাদের শারীরতত্ত্বে এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। সূর্যের আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি– জীবদেহের জন্য এ সকল ক্ষতিকর বিকিরণের বিরুদ্ধে মঙ্গলে কোন সুরক্ষা নেই। টেরাফর্মিং এর ফলে এই দিকটিতেও পরিবর্তন আসা প্রয়োজন হবে।

কক্ষপথে বিশাল আয়না স্থাপন করে মঙ্গলের উত্তাপ বৃদ্ধি ও ভূ-পরিবর্তন
(কাল্পনিক চিত্র)

উত্তাপ বাড়ানোর বিষয়টিকেই প্রথমে আলোচনায় আনা যাক। এর জন্য কয়েকটি উপায় সম্ভব হতে পারে। মঙ্গলকে পরিক্রমণ করবে এমন বিশাল কিছু আয়না মহাকাশে স্থাপনের মাধ্যমে এই কাজটি করা যেতে পারে। আয়নায় অতিরিক্ত সূর্যালোক প্রতিফলন করে এবং মঙ্গলের উপর তা কেন্দ্রীভূত করে উত্তাপ বাড়িয়ে নেয়া যাবে। আয়নাগুলো অনেক বড় হতে হবে, তাই এগুলোকে হালকা পাতলা একটাকে ধাতব পাতের মত করে তৈরি করতে হবে। এগুলোকে অন্যত্র তৈরি করে তারপর মহাশূন্যযান দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে সঠিক জায়গায় কক্ষপথে স্থাপন করতে হবে। এভাবে নিয়ে যাওয়ার সহজতর পন্থা হতে পারে এগুলোকে সৌর পাল (সোলার সেইল) হিসাবে ব্যবহার করে। সূর্যের বিকিরণ ও এর থেকে নির্গত কণিকা সমূহের স্রোতের ('সৌর বায়ু') চাপে এরকম পাতলা জিনিস অনেকটা পালের মতোই গতি লাভ করে এবং সেই শক্তিতে তা মহাশূন্যে স্থানান্তরিত হতে পারে।

উত্তাপ বাড়ানোর জন্য অবশ্য এরকম আয়না ব্যবহারই একমাত্র উপায় নয়। আর একটি উপায় হলো মঙ্গলের পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে যে সূর্য কিরণ আবার বাইরে চলে যায় তাকে কমাবার চেষ্টা করা। এভাবে প্রতিফলিত অংশটি মঙ্গলের পৃষ্ঠে শোষিত হয়না বলে উত্তাপ সৃষ্টিতে কাজে লাগেনা, তাই এই অংশ কমালে উত্তাপ বাড়বে। বিশেষ করে মেরু অঞ্চলে ও অন্যত্র বরফের যে আবরণ রয়েছে চকচকে সেই আবরণ থেকে প্রচুর প্রতিফলন এভাবে ঘটে। যদি এই বরফকে কালো রঙের কোন গুড়া বস্তু দিয়ে ঢেকে দেয়া যায় তা হলে এই প্রতিফলন কমিয়ে ফেলা যাবে। হয়তো মঙ্গলের মাটি থেকেই এরকম কালচে ধূলি পাওয়া যাবে বরফের চাদরকে ব্যাপক ভাবে ঢেকে দেবার জন্য। তবে আরো ভাল হয় মঙ্গলের দুটি ছোট উপগ্রহ ফোবোস ও ডাইমোস থেকে এই ধূলি সংগ্রহ করলে কারণ এখানকার শিলা হচ্ছে সৌর জগতে সব চেয়ে বেশি কালো রঙের। মঙ্গল থেকেই নিই কিংবা তার উপগ্রহ থেকেই নিই ধূলি পাওয়ার জন্য শিলা চূর্ণ করার প্রয়োজন হবে। তারপর তা বরফ অঞ্চলে মঙ্গলের সঠিক জায়গায় স্থানান্তরের প্রশ্নও রয়েছে। বরফ কিছুটা স্থায়ী ভাবে ঢাকতে গেলে বেশ পুরু করে কালো গুড়া দিয়ে তা করতে হবে। ফলে বিপুল পরিমাণ বস্তু চূর্ণ করা, নিয়ে যাওয়া, ঢেকে দেয়া– এসব বিরাট কর্মকাণ্ড প্রয়োজন হবে। ডাইমোস ও ফোবোস থেকে এগুলো নিয়ে যেতে হলে মহাশূন্যে বিপুল পরিমাণ ভারী মাল পরিবহনের উপায় প্রয়োজন হবে এর জন্য। একই কথা অবশ্য প্রতিফলক আয়না স্থাপন করার জন্যও প্রযোজ্য– কারণ সেই প্রতিফলককে হতে হবে অত্যন্ত বিশাল এবং তা মহাশূন্যে নিয়ে কক্ষে স্থাপন করতে হবে।

মঙ্গলে ভূ-পরিবর্তনঃ
গ্রীণ হাউস গ্যাস উৎপাদন করে তা উদগীরণ
(কাল্পনিক চিত্র)

মঙ্গলকে উত্তপ্ত তোলার আর একটি উপায় হচ্ছে তাতে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া বাড়িয়ে দেয়া। এজন্য গ্রীন হাউস গ্যাস এর বায়ুমণ্ডলে আনতে হবে। এটি কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে যেমন করা যায় তেমনি গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে তার চেয়েও দক্ষ গ্যাস দ্বারাও করা যায়– যেমন এমোনিয়া অথবা সি এফ সি। প্রাথমিক ভাবে উত্তাপ বাড়ানো হলে এরকম আরো গ্যাস মঙ্গলের গা থেকেই নির্গত হবে। সি এফ সি গ্যাস পৃথিবীতে উৎপাদন হচ্ছে। এটি পৃথিবীতে উৎপাদন করে মঙ্গলে নেয়া যায়, অথবা মঙ্গলেও উৎপাদন করা যায়। মনে রাখতে হবে গ্রীন হাউস গ্যাস হিসাবে সিএফসি কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে হাজার গুণ বেশি কার্যকর। আর একটি ভাল কৌশল হতে পারে এমোনিয়া-সমৃদ্ধ কোন গ্রহাণুকে মঙ্গলের গায়ের উপর আছড়ে ফেলার আয়োজন। এরকম ছোটবড় গ্রহাণু মঙ্গলের কাছাকাছি মহাশূন্যে প্রচুর রয়েছে। সেখানে তার সঙ্গে শক্তিশালী রকেট সংযোগ করে সজোরে মঙ্গলের উপর তা দিয়ে আঘাত হানা সম্ভব। এভাবে এক সঙ্গে দুটি কাজ হবে। আঘাতের ফলে মঙ্গল পৃষ্ঠে উত্তাপ বাড়বে। আবার গ্রহাণুর সঙ্গে থাকা এমোনিয়া মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে যাবে যা উত্তাপ বাড়াবে। তবে কাজটি যে সহজ নয় তা বুঝাই যাচ্ছে। ঐ রকেটকে আজকের সাধারণ রকেট হলে চলবেনা, ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পিত অনেক বেশি শক্তিশালী নিউক্লিয়ার রকেট প্রয়োজন হবে গ্রহাণুকে এভাবে মঙ্গলের দিকে ধাবমান করে আছড়ে ফেলতে। তবে আমরা যদি গ্রীন হাউস গ্যাস

হিসাবে কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে প্রাধান্য দিই সেটি মঙ্গলের মেরু অঞ্চলে পৃষ্ঠদেশের উপর এবং অন্যত্র পৃষ্ঠদেশের ঠিক নিচে শিলায় বরফ রূপে প্রচুর রয়েছে (কার্বন-ডাই-অক্সাইড বরফ বা ড্রাই আইস)। প্রাথমিক ভাবে পৃষ্ঠদেশকে কিছু উত্তপ্ত করে এই বরফ থেকে সরাসরি কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে নিয়ে যাওয়া যায়। একবার তা গিয়ে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া বাড়ালে ভূমি আরো উত্তপ্ত হবে, আরো কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে যাবে, এবং প্রক্রিয়াটি চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তেই থাকবে। এ সব অবশ্য যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। টেরাফর্মিং এর অধিকাংশ কাজই আসলে ব্যাপক ও সময় সাপেক্ষ হতে বাধ্য।

মঙ্গলে পানি আর বাতাসের ব্যবস্থা

মঙ্গলে সুপ্রমাণিত ভাবে পানির বরফ রয়েছে মেরু অঞ্চলে ও মাটির ঠিক নিচে। মাটির নিচে বরফের তলায় তরল পানিও রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যদিও খুব সাম্প্রতিক কিছু আবিষ্কার বাইরেও তরল পানি মাঝে মাঝে সৃষ্টি হয় বলে মনে করছে, তা সুপ্রমাণিত নয়। এখন এই সব থেকে বাইরে তরল পানি পাওয়ার ব্যবস্থা প্রয়োজন। এটিও উত্তাপ বাড়াবার সঙ্গে সম্পর্কিত। উত্তাপ যথেষ্ট বেড়ে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের কিছুটা উপরে নিয়ে যাওয়া গেলে বরফ গলা পানি প্রচুর পাওয়া যাবে। মাটির শিলা ভেঙ্গে একটু নিচের দিকে যেতে পারলে সেখানকার বরফ থেকে এবং ভূগর্ভস্থ তরল পানি থেকেও এই পানি আসতে পারে। সুদূর অতীতে মঙ্গলের গায়েও যে প্রচুর তরল পানির স্রোত প্রবাহিত হতো সে প্রমাণ মিলেছে। ভবিষ্যতে আমাদের হস্তক্ষেপে সে রকম ঘটনা আবার না ঘটতে পারার কোন কারণ নেই।

মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল নিয়ে আমাদের কাজ দুই ধরনের। একটি হলো বায়ুর চাপ বাড়িয়ে নেয়া, অন্যটি হলো আমাদের উপযোগী বায়ুর গঠন সৃষ্টি করা। মঙ্গলে বায়ুচাপ অত্যন্ত কম বলে সেখানে অধিক চাপে থাকা প্রেশার স্যুট না পরে মানুষের পক্ষে বাইরে যাওয়া সম্ভব হবেনা। কিন্তু উত্তাপ বাড়াতে যে কোন গ্রীন হাউস গ্যাস প্রচুর ওতে ঢুকালে অন্তত চাপের দিক থেকে এটি আমাদের কাছে সহনীয় হয়ে আসবে। যেমন মেরু অঞ্চলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড বরফ থেকে গ্যাস করে নিয়ে বায়ুচাপ ৩০০ মিলিবার পর্যন্ত (পৃথিবীর বায়ুচাপের প্রায় এক তৃতীয়াংশ) বাড়িয়ে ফেলা সম্ভব। এই পরিস্থিতিতে আর প্রেশার স্যুটের দরকার হবেনা। এরকম ভূ-পরিবর্তনে একই সঙ্গে কতগুলো বিষয়ের সুরাহা হয়ে যাচ্ছে– উত্তাপ বাড়ানো, পানির ব্যবস্থা করা, বায়ু চাপ বাড়ানো।

আমাদের উপযোগী বাতাস পেতে হলে অবশ্য সঠিক পরিমাণে নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন সৃষ্টি করতে হবে। মঙ্গলের ভূমির নিচে খুব সম্ভব প্রচুর নাইট্রেট শিলা

রয়েছে। এটি বিশ্লিষ্ট করে প্রচুর নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যেতে পারে। বর্তমান প্রযুক্তিতে ব্যাপক ভাবে এটি করার একটি উপায় হতে পারে ভূমিতে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ। অবশ্য সেটি করতে না চাইলে বিকল্প উপায়ও রয়েছে। কোন গ্রহাণুকে এর দিকে ধাবিত করে সংঘাত ঘটিয়েও নাইট্রেট থেকে গ্যাস দুটি পাওয়া সম্ভব। আর গ্যাস আমদানীর রাস্তা তো খোলাই আছে– অন্য কোন গ্রহ, উপগ্রহ, অথবা গ্রহাণু থেকে। যেমন শনির উপগ্রহ টাইটানে নাইট্রাজেনের প্রাচুর্য আমরা দেখেছি। প্রয়োজনে মঙ্গলের জন্য নাইট্রোজেন এখান থেকেই আনা যাবে।

শুক্রে চাই অন্য রকম ভূ-পরিবর্তন

শুক্র গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন আভাস না থাকলেও, এবং পরিবেশ তার জন্য একেবারেই উপযুক্ত না হলেও, শুক্র গ্রহে বসত করার চিন্তা কিছু বিজ্ঞানীরা একেবারে বাদ দেননি। এর কারণ পৃথিবী থেকে শুক্রের নৈকট্য, এবং অনেক কিছু অমিল সত্ত্বেও একে বসতের জন্য গড়ে নেয়ার সুদূর সুযোগ থাকা। শুক্রের ভূ-পরিবর্তনগুলো অবশ্য করতে হবে মঙ্গলের ঠিক উল্টো রকমের। এখানে উত্তাপ কমাতে হবে, বায়ুচাপও কমাতে হবে, অন্যান্য বিষয়গুলো তো আছেই।

শুক্রের উত্তাপ খুব বেশি– এটি পৃথিবী থেকে প্রায় দ্বিগুণ সূর্যকিরণ পায়, আর এর মধ্যে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ার পাগলা ঘোড়া ছুটে চলছে ক্রমেই উত্তাপ বাড়িয়ে। এদের একটি কমালে অন্যটিও অবশ্য কমবে। শুক্রের উত্তাপ কমাবার একটি উপায় হলো ঐ প্রখর সূর্যকিরণ থেকে একে রক্ষা করা। এজন্য বিশাল আকারের মহাশূন্য শামিয়ানা তৈরি করে এই গ্রহের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব। এই শামিয়ানা বা শেইড নানা ভাবে চিন্তা করা যায়। নানা বস্তুর টুকরা ও ধূলার দ্বারা গ্রহের চারিদিকে একটি বলয় তৈরি করে এই রকম আচ্ছাদন দেয়া যাবে, যা বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘের সৌর বিকিরণকে আটকে দেবে। আরেকটি পরিকল্পনা হলো বিশাল বিশাল সৌর প্যানেলকেই আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করা। এটি করলে যে আলো আমরা আটকে দিচ্ছি তার একটি ব্যবহার হবে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে। আরো একটি বিকল্প হতে পারে বিশাল বিশাল বেলুন শুক্রের বাতাসে স্থাপন করে ভূমিকে আচ্ছাদন দেয়া। বেলুনগুলো আবার মানুষের বসত হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে। তাতেও বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে যা আমরা পরের অধ্যায়ে দেখবো। শামিয়ানা বা বেলুন যাই তৈরি করতে হোক না কেন এটি যদি নূতন যুগের নূতন ধরনের বস্তু– কার্বন ন্যানো টিউব, গ্রাফীন ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হতে পারে তা হলে শুক্রের আকাশে প্রচুর থাকা কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে সেখানেই গড়ে নেয়া সম্ভব হতে পারে। বর্তমানে ন্যানো

পর্যায়ের কার্বন-ভিত্তিক এই যে সকল বস্তু তৈরি করা যাচ্ছে তা অত্যন্ত শক্ত, এবং অন্যান্য নানা গুণের অধিকারী।

শুক্রের পৃষ্ঠের উত্তাপ কমাবার জন্য আর একটি উপায় হতে পারে এর ভূমি চকচকে কোন জিনিস দিয়ে ঢেকে দেয়া। এটি আয়নার মত কাজ করে প্রখর সূর্য কিরণের একটি বড় অংশ আবার বাইরে পাঠিয়ে দেবে, শুক্রের গায়ে শোষিত হতে দেবেনা। মঙ্গলের জন্য যা করার কথা আমরা এর আগে বলেছি এটি হবে তার ঠিক বিপরীত। তবে এক্ষেত্রে সমস্যা হলো বায়ুচাপ যথেষ্ট না কমালে এটি তেমন কাজ করবেনা। এমনিতেও শুক্রের ভূ-পরিবর্তনের একটি বড় কাজ হলো এর অত্যন্ত ঘন বায়ুমণ্ডলের চাপ কমানো। এর জন্য একটি উপায় হবে– অন্য জায়গা থেকে, হয়তো পৃথিবী থেকে বা কোন গ্রহাণু থেকে, যথেষ্ট ক্যালশিয়াম অথবা ম্যাগনেশিয়াম আমদানী করে শুক্রের কার্বন–ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে তার বিক্রিয়া ঘটানো। তা হলে ক্যালশিয়াম কার্বোনেট বা ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট শিলা তৈরি হয়ে যথেষ্ট কার্বন-ডাই-অক্সাইড এই শিলাতে আটকে যাবে– বাতাসে এর পরিমাণ কমবে। অন্যত্র থেকে হাইড্রোজেন আমদানী করেও এমনটি করা যায়। সে ক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পানি তৈরি করবে। আজকাল পৃথিবীতে গ্রীন হাউস গ্যাস কমাবার অংশ হিসাবে বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে চিরতরে মাটির নিচে সরিয়ে ফেলার যে চেষ্টা চলছে– তেমন প্রক্রিয়াও ব্যাপক ভাবে শুক্রে চালানো যেতে পারে। শুক্রের ভূ-পরিবর্তনে উত্তাপ কমানো এবং বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড কমিয়ে তার চাপ নামিয়ে আনা এই দুটি বিষয় হাত ধরাধরি করে চলতে হবে।

শুক্র গ্রহে আমাদের বসত স্থাপনের ক্ষেত্রে আর একটি সমস্যা হলো এর অতি দীর্ঘ দিন ও রাত। পৃথিবীর ২৪৩ দিনে শুক্র একবার নিজের অক্ষে আবর্তিত হয়। পৃথিবীতে পরিচিত অনেক জীবের জন্যই এ ধরনের দীর্ঘ দিন-রাত ক্ষতিকর হবে। ভূ-পরিবর্তনে এরও এক ধরনের প্রতিকার হতে পারে। আবর্তন গতি পরিবর্তন করতে হলে অবশ্য অসম্ভব রকমের শক্তি প্রয়োজন হবে। সে চেষ্টা না করে আমরা যদি মহাশূন্যে কিছু বিশাল আয়না এমন ভাবে স্থাপন করি যা শুক্রের রাতে থাকা অংশকে আলোকিত করবে ও দিনে থাকা অংশে সূর্যকে ঢেকে রাখবে তা হলে এর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমাদের সুবিধামত দিন রাতের দৈর্ঘ গড়ে নিতে পারি।

জীবের মাধ্যমে ভূ-পরিবর্তন

তার দীর্ঘ ইতিহাসে পৃথিবীতেও অনেক ভূ-পরিবর্তন হয়েছে– তবে তা প্রাকৃতিক ভাবে খুবই ধীর গতিতে হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলোতে একটি বড় ভূমিকা রেখেছে

জীব। যেমন সালোক সংশ্লেষণকারী ব্যাকটেরিয়া বিবর্তিত হবার পর তাদের কাজের ফলেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন আসতে পেরেছে। এর আগে বাতাসে অক্সিজেন ছিলনা, এখনকার ক্ষুদ্র জীবও অক্সিজেনের উপর নির্ভর করতোনা। একই ভাবে আমরা যখন ভিন গ্রহকে গড়ে নিতে চাইবো তখন সেখানে এরকম জীবকে কাজে লাগাতে পারি। জীব হয়তো তখন ওখানকার ভূ-প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে আরো জীবের জন্য উপযুক্ত করে তুলতে পারে। যদিও বিষয়টি দীর্ঘমেয়াদী তবুও আমাদেরও দীর্ঘ মেয়াদী বসত পরিকল্পনায় এরও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে বৈ কি। অবশ্য এটি সম্ভব হবার আগে অন্যান্য পরিবর্তনগুলোর মাধ্যমে অন্তত চরমজীবী কিছু অণুজীবের জন্য অনুকূল পরিবেশ সেখানে সৃষ্টি করতে হবে।

একবার যদি আমরা চরমজীবীদের জন্য হলেও ব্যবস্থা করতে পারি, তা হলে তাদের প্রভাবেই ধীরে ধীরে আরো সাধারণ ও জটিলতর জীবের অগ্রগতির সুরাহা হতে পারে। ব্যাকটেরিয়ার পর ধীরে ধীরে আলজি, ফাঙ্গাস, উদ্ভিদ ইত্যাদির জন্যও সেখানকার পরিবেশ অনুকূল হয়ে উঠতে পারে। চরমজীবীদের মাধ্যও সালোক সংশ্লেষণকারী ব্যাকটেরিয়া রয়েছে যারা চরম উত্তাপ, লবণাক্ততা, শুষ্কতা ইত্যাদি সহ্য করতে পারে; বাতাসের নাইট্রোজেন মাটিতে আনতে পারে সার হিসাবে; কার্বন চক্রের সৃষ্টি করতে পারে। আবার এমন কিছু চরমজীবী রয়েছে যারা অন্য ব্যাকটেরিয়ার তৈরি খাবার গ্রহণ করতে পারে। এদের মধ্যে কিছু কিছু আছে যারা খুব উচ্চ বিকিরণ সহ্য করতে পারে– আল্ট্রা-ভায়োলেটের অথবা মহাজাগতিক রশ্মির। মঙ্গল গ্রহে জীব থাকতে গেলে শুরুতে এ সব গুণ খুবই কাজে লাগবে।
মঙ্গলের পৃষ্ঠের উত্তাপ বাড়াতে এর বরফ অঞ্চলকে কালো ধূলি দিয়ে ঢেকে দেবার কথা বলা হয়েছিল। এই কাজটি লাইকেন নামক কালচে একরকম ফাঙ্গাস দিয়েও হতে পারে– যা পৃথিবীর অতি শীতল অঞ্চলে সালোক সংশ্লেষণকারী ব্যাকটেরিয়া অথবা আলজির সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বেড়ে উঠে। মঙ্গলের শীতল বরফ ঢাকা জায়গায় এটিই হতে পারে সূর্য-কিরণ শোষণ করে উত্তপ্ত হবার একটি চমৎকার জৈব উপায়।

সাম্প্রতিককালে একটি পরীক্ষা হয়েছে যেখানে উপযুক্ত কিছু চরমজীবি ব্যাকটেরিয়া বাছাই করে তাকে অনেকটা মঙ্গলের মত পরিবেশে রেখে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এর জন্য অবশ্য ঠিক মঙ্গলের মত অতি কম বায়ুচাপে না রেখে তার থেকে দশগুণ বেশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড গঠিত বায়ুচাপে এদের রাখা হয়েছিল। মঙ্গলের মাটির সদৃশ ভাবে গঠিত মাটিতে, ঠিক মঙ্গলে যে ভাবে দেখা দেয় সেরকম সৌরবিকিরণ কৃত্রিম উৎসের মাধ্যমে সৃষ্টি করে, মঙ্গলের কাছাকাছি উত্তাপে ও সেখানকার মত

দিন-রাত্রের উত্তাপ তারতম্যে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে রাখা হয়েছিল। দেখা গেছে এরা এমন অবস্থায় দিব্যি বেঁচে ছিল।

শুক্র গ্রহের জন্য যদি চরমজীবি ব্যাকটেরিয়া বাছাই করতে হয় তাহলে তাদের প্রয়োজন হবে অন্য কিছু বিশেষ ধরনের গুণের। এদেরকে অত্যন্ত বেশি উত্তাপ সহ্য করতে হবে, আরো সহ্য করতে হবে এসিড বৃষ্টি ও উচ্চ লবণাক্ততা। পৃথিবীতে কোন কোন পরিবেশে এরকম ব্যাকটেরিয়া রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েলোস্টোন পার্কের সালফার সমৃদ্ধ ফুটন্ত কাদায়, এবং জর্দানে মরু সাগরে বা যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেট সল্ট লেইকে অত্যন্ত ঘন লবণ পানিতেও ব্যাকটেরিয়া রয়েছে। এদের মধ্য থেকে উপযুক্তগুলোকে যদি শুক্র গ্রহে বাঁচিয়ে রাখা যায় তা হলে এরাই হয়তো ওখানকার মাটি গঠন করে তাতে জৈব পদার্থ ইত্যাদি বাড়িয়ে এবং বাতাসে অক্সিজেনের সঞ্চার করে পরবর্তী উন্নততর পর্যায়ের জীবকে নিয়ে আসার পথ করে দেবে।

এ ভাবে বসত করার জন্য আমরা যে গ্রহ-উপগ্রহেই যাই না কেন, অন্য ভাবে ভূ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লক্ষ্য থাকবে কী ভাবে আমরা এক্ষেত্রে জীবকেও কাজে লাগাতে পারি। আরো অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে এবং এক সময় আমাদের নিজেদের সঙ্গী হবার জন্য অন্যান্য জীব বৈচিত্র সৃষ্টি করতে এটিই ভাল উপায়। একটি জিনিসের কথা ভুললে চলবেনা– আমরা এখন ডি এন এ প্রযুক্তিতে যুগান্তর আনছি। ইতোমধ্যেই ডি এন এ সংশ্লেষণ করে কৃত্রিম ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে আমরা জিন কারিগরির মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী নূতন নূতন গুণ সম্পন্ন অণুজীব যে তৈরি করতে পারবো তা প্রায় নি:সন্দেহ। এমনকি অণুজীবের চেয়ে জটিলতর জীবের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য হতে পারে। তাই পৃথিবীর বাইরের নূতন প্রয়োজনে নূতন জীব হয়তো আমরা নিজেরাই উন্নয়ন করে নেব– যেখানে যেভাবে দরকার। সেগুলোই আবার ঐ জায়গাগুলোকে আমাদের বসবাসের জন্য অনুকূল করে তুলবে।

পৃথিবী থেকে বর্তমান বা নূতন সংশ্লেষিত যে রকম অণুজীবই আমরা অন্য গ্রহ-উপগ্রহে নিয়ে যাইনা কেন, আগে লক্ষ্য করতে হবে সেখানে ইতোমধ্যেই নিজের কোন অণুজীব রয়েছে কিনা। যদি থাকে তা হলে আমাদের নিয়ে যাওয়া জীব যেন সেগুলোর কোন রকম ক্ষতি করতে না পারে, বা তাদের ইকোসিষ্টেমকে নষ্ট করতে না পারে যে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। অন্যান্য ভাবে গ্রহকে গড়ে নেবার ক্ষেত্রেও একথা মনে রাখতে হবে। এভাবে গড়ে নিতে গিয়ে সেখানকার কোন জীবের (যদি থাকে) ক্ষতি যেন আমরা না করি। যে ভুল আমরা পৃথিবীর নূতন আবিস্কৃত অঞ্চলগুলোতে করেছি সেটি যেন এক্ষেত্রেও না করি তা অবশ্যই দেখতে হবে।

সৌর জগতে নূতন বসত

বসত গড়তে যা নিশ্চিত করতে হবে

সৌর জগতে বসত স্থাপনের জন্য নানা রকম জায়গার কথাই চিন্তা করা হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবে আমাদের কাছের জায়গাগুলোর কথা বেশি ভাবা হচ্ছে– মঙ্গল, চাঁদ এবং শুক্র। তবে নূতন আশ্রয়টিকে পৃথিবীর মত বড় কিছু হতে হবে এমন কোন কথা নেই। এটি সৌর জগতের একেবারে ছোটখাট সদস্যরাও হতে পারে– যেমন যুৎসই গ্রহাণু। ছোট একটি গ্রহাণুতে বসত গড়লে সব কিছুর জন্য যে তার উপরেই নির্ভর করতে হবে এমনও নয়। কাছাকাছি অন্যান্য নানা উৎস থেকেও আসতে পারে এর রসদ। আবার আমাদের কোন কোন বসত হয়তো প্রাকৃতিক কোন জায়গাতেই হবে না। ওটি পুরোটাই হয়তো হবে কোন বিশাল কৃত্রিম উপগ্রহে পৃথিবীর কক্ষ পথে, অথবা এমনকি অন্য কোন গ্রহের কক্ষপথে। এভাবে সম্পূর্ণ নিজেদের বানিয়ে নেয়া এমন কৃত্রিম উপগ্রহ-রূপী বসতেরও অনেক সুবিধা রয়েছে। এক্ষেত্রেও অবশ্য প্রচুর রসদ বাইরে থেকেই আসতে হবে। এর জন্য একটি ছোট অভিজ্ঞতাতো আমাদের রয়েছেই– মহাশূন্য স্পেস স্টেশন। এর সব রসদ পৃথিবী থেকেই যায়।

পৃথিবীতে যেমন প্রয়োজন হয়, তেমনি আমাদের নূতন বসতেও কতগুলো মৌলিক জিনিস প্রযোজন হবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পানি, খাদ্য, শক্তি, উৎস, নিশ্বাস নেবার মত বাতাস এবং সহ্যের উপযুক্ত বায়ুচাপ, যাতায়তের সুবিধা , প্রয়োজনীয় নানা কিছু তৈরি করতে নির্মাণ বস্তু, নিরাপদ আশ্রয়, সূর্য থেকে আসা ক্ষতিকর আলট্রা-ভায়োলেট ও মহাজাগতিক রশ্মি থেকে সুরক্ষা, আমাদের শরীর যে ধরনের মাধ্যাকর্ষণে অভ্যস্ত যে রকম মাধ্যাকর্ষণ, শারীর-বৃত্তীয় সব প্রক্রিয়া চালু রাখার মত পরিবেশ (লাইফ সাপোর্ট) ইত্যাদি।

নূতন বসতে জীবন যাত্রা চালাতে পানি, খাদ্য ইত্যাদি ছাড়াও নিত্য বহু রকম বস্তুসম্ভার প্রয়োজন হবে। এসব যদি বসতের জায়গায় স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় সেটিই হবে সব চেয়ে সুবিধাজনক। নইলে বাইরে থেকে আমদানী করতে হলে যানবাহনের প্রশ্নটি আসবে। স্থানীয়ভাবে বস্তুসম্ভার পাওয়ার ক্ষেত্রে এক এক জায়গার এক এক রকমের সুবিধা অসুবিধা রয়েছে। যেমন মঙ্গলে কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন পাওয়া যাবে, চাঁদে তা পাওয়া যাবেনা। সিলিকন, এলুমিনিয়াম, টিটানিয়াম, লোহা– ইত্যাদি দরকারি জিনিসের মধ্যে সবক'টি সব জায়গাতে পাওয়া

যাবেনা, যদিও কোন কোনটি পাওয়া যাবে। অধিকাংশ জায়গায় সৌরশক্তিই হবে শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কিন্তু নূতন বসত গড়ার বড় বড় কাজে পরমাণু শক্তিকে বিশেষ ভাবে কাজে লাগাতে হবে। বর্তমানে প্রচলিত ফিশন পরমাণু শক্তি তো বটেই, কিন্তু আরো কার্যকর ফিউশন পরমাণু শক্তিও ভবিষ্যতে বড় ভূমিকা রাখবে এর নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার সম্ভব হবার পর। কোন কোন ক্ষেত্রে কাছের অন্য কোন গ্রহ-উপগ্রহ-গ্রহাণুতে উৎপাদিত শক্তি তারবিহীন সঞ্চালন ব্যবস্থার মাধ্যমে হয়তো আমদানীও করা যাবে। অন্য গ্রহ-উপগ্রহ থেকে যাতায়তের জন্য এবং মালপত্র আমদানী রফতানীর জন্য বর্তমানের মহাশূন্যযানগুলোর থেকে উন্নত নূতন ধরনের নিউক্লিয়ার রকেট এমনকি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের কৌশলও উদ্ভাবনের কথা আসছে।

যেখানেই আমরা বসত করি আমাদের বাসস্থানে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর বার বার পুনরাবর্তন (রিসাইক্লিং) খুবই জরুরী হবে। শুধু একটানা সেগুলো খরচ করে গেলে চলবেনা, কারণ আমাদের চাহিদার ক্রমাগত যোগান দিয়ে যাওয়ার জন্য বিশাল পরিমাণে সেই উপাদান সংগ্রহ সেখানে কঠিন হতে পারে। তাই হয়তো আমাদের নিশ্বাসের বাতাস, খাওয়ার ও ব্যবহারের পানি, শরীরের বর্জ্য, খাদ্য উৎপাদনের পুষ্টি এরকম অনেক কিছুরই পুনরাবর্তন দরকার হবে। সেই সঙ্গে স্থানীয়ভাবে এগুলোর নূতন উৎপাদন করার দক্ষ কৌশলও প্রবর্তন করতে হবে।

বসতের কারণের উপরও অনেককিছু নির্ভর করবে

পৃথিবীতে যদি আমরা অস্তিত্বের সংকটে পড়ি তখন যে আমাদেরকে পৃথিবীর বাইরে ছড়িয়ে পড়তে হবে সে কথা আমরা গোড়াতেই বলেছি। সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রজাতিটিকে টিকিয়ে রাখার জন্যই আমাদেরকে বাইরে বসত গড়তে হবে। সে ধরনের পরিস্থিতির জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি আমাদের থাকতে হবে– বাইরে ভিন গ্রহে বা উপগ্রহে বাস করাটি সম্ভব করে তুলতে হবে, ওখানে অভ্যস্তও হতে হবে।

বসতের এই কারণটি দেখা দেবে একেবারে চরম অবস্থার কারণে। কিন্তু আরো কিছু কারণ আছে যেগুলোর প্রশ্ন অদূর ভবিষ্যতেও উঠতে পারে স্বাভাবিক ভাবেই। এর মধ্যে একটি হলো অর্থনৈতিক কারণ। আমাদের নিরবিচ্ছিন্ন যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তারই এক পর্যায়ে পৃথিবীর বাইরের সম্পদ অর্থনৈতিক ভাবে আহরণ ও ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। সেটি করতে গিয়েই হয়তো আমাদেরকে বিশেষ বিশেষ জায়গায় বসত করতে হবে। এর একটি বড় আকর্ষণ হবে খনিজ সম্পদ। যেমন মঙ্গলে মূল্যবান ধাতু সোনা, রূপা, প্লাটিনাম ইত্যাদি রয়েছে। শুধু বড় বড় গ্রহ-উপগ্রহে নয় নানা গ্রহাণুও খনিজের লোভনীয় উৎস হতে পারে। গ্রহাণু বলয়ের কাছে ইডা নামক গ্রহাণুর উপগ্রহ ড্যাকটাইলে লোহার পরিমাণ খুবই বেশি– এত

বেশি যে তার সম পরিমাণ লোহা আমরা পৃথিবীতে মানুষের পুরো ইতিহাসেও ব্যবহার করিনি।

খনিজ ছাড়াও আরো অন্যান্য মূল্যবান বস্তু এসব জায়গায় পাওয়া যেতে পারে। যেমন ডিউটেরিয়ামের কথাই ধরা যাক– যা হাইড্রোজেনের একটি ভারী আইসোটোপ। পৃথিবীতে প্রকৃতিতে হাইড্রোজেন ও ডিউটেরিয়ামের যে অনুপাত অন্যান্য কিছু গ্রহে অনুপাত তার থেকে যথেষ্ট বেশি। কোন কোন জায়গায় পৃথিবীর অনেকগুণ বেশি ডিউটেরিয়াম রয়েছে। পারমানবিক ফিউশন বিয়্যাকটরের জ্বালানি হিসাবে এটি মহামূল্যবান হতে পারে।

শুধু বস্তুসম্ভারের কারণেই যে অন্য গ্রহ-উপগ্রহে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাবো তা নয়, অনেক ধরনের উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণের শিল্প ইত্যাদির বিশেষ বিশেষ সুবিধা এর বহু জায়গায় থাকতে পারে। যেমন দুর্বল মাধ্যাকর্ষণ যেটি আমাদের বসবাসের পক্ষে কিছুটা অন্তরায় হতে পারে সেটিই আবার অনেক কর্মকাণ্ডের জন্য সুবিধা হিসাবে বিবেচিত হবে। অল্প আয়াসে অল্প শক্তি খরচ করে অনেক ভারী যন্ত্রপাতির নড়াচড়া, উঠানামা সেখানে সম্ভব হবে। যেমন অপেক্ষাকৃত দূরগামী ও ভারী মহাশূন্যযানের উৎক্ষেপন যে পৃথিবী থেকে না হয়ে চাঁদ থেকে সহজতর হবে তা বলাই বাহুল্য। বিশেষ পরিস্থিতিতে অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়া, এমনকি গ্রীন হাউসে নূতন ধরনের উদ্ভিদ উৎপাদনও অন্য গ্রহে অপেক্ষাকৃত সহজ ও লাভজনক হতে পারে। দীর্ঘতর দিন, প্রাপ্ত সূর্য রশ্মির প্রশস্ততর বর্ণালী ইত্যাদি এসব ক্ষেত্রে নূতন প্রযুক্তি প্রয়োগকে সম্ভব করে তুলতে পারে। কাজেই বিশেষ বিশেষ শিল্প স্থাপনের জন্য ওসব জায়গা অনেক বেশি উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে।

ওখানে বসতের আর একটি কারণ হবে মহাশূন্য গবেষণা ও অভিযানের উন্নততর সুযোগ পাওয়ার জন্য। অনেকগুলো জায়গা যেমন দূরবর্তী অভিযানের মধ্যবর্তী ষ্টেশন হিসাবে যেমন কাজ করবে, তেমনি ওখানে কোন কোন জায়গায় (যেমন চাঁদে) আরো পরিস্কার আকাশ ইত্যাদির কারণে স্থায়ী বৃহদাকার পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, মানমন্দির গড়ে তোলাও অনেক সহজ হবে। আর যে কাজটি বোধ হয় সবার আগে হবে তা হলো স্পেস-ট্যুরিজম, যার অল্প কিছু কিছু নমুনা ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ধনী মানুষরা এখন মহাশূন্যচারীদের সঙ্গে স্পেস ষ্টেশনে যাওয়ার সাথী হচ্ছেন। পৃথিবীর কক্ষে স্থাপিত রীতিমত স্থায়ী কলোনিতে যাতায়ত যদি সহজতর, কম অস্বস্থিকর, ও কম ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠে, এবং সেখানে যদি থাকা খাওয়ার হোটেল সুলভ ভাল ব্যবস্থা গড়ে উঠে, তখন সেখানে যাওয়ার জন্য যে রমরমা পর্যটন শিল্প গড়ে উঠবেনা তা কে বলতে পারে। এদিক থেকে চাঁদেও এরকম পর্যটন কিন্তু গড়ে উঠার ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। স্পেস ট্যুরিজমই আপাতত একমাত্র ক্ষেত্র যেটি

ইতোমধ্যে শুরু হয়ে আগামী দিনে সৌরজগতের অন্যত্র মানুষের প্রায়শ যাতায়ত ও স্থায়ী বসত গড়ে তোলার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এখন অত্যন্ত ধনী ও খুবই সাহসী ও অভিযান-প্রিয় গুটি কতেক মানুষই শুধু পর্যটক হিসেবে যাচ্ছেন মহাশূন্য ষ্টেশনে কয়েক দিনের অতিথি হতে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এ চিত্র বদলে যাবে, আরো অনেকে যেতে চাইবে ও যেতে পারবে।

মঙ্গল-বসতে যাওয়া আসা

স্থায়ীভাবে মানুষের বসতের প্রশ্ন উঠলে এখন পর্যন্ত আমাদের মনে মঙ্গলের ছবিটিই ভেসে আসে। এর চেয়ে অনেক কাছে, অনেক বেশি পরিচিত চাঁদ রয়েছে, যেখানে মানুষ সত্যি সত্যি কয়েকবার ঘুরে এসেছে। কিন্তু ওজায়গাটি নানা দিক থেকে প্রাণের জন্য কম অনুকূল বলে আমাদের বসত-চিন্তায় এগিয়ে রয়েছে মঙ্গলের কথা।

কিন্তু খুব শিগ্‌গির মঙ্গলে বসত স্থাপন দূরে থাক, সেখানে মানুষের যাওয়াও খুব সহজ হবেনা। বর্তমানে মহাশূন্যযানে রকেটের যে প্রযুক্তি রয়েছে তাতে মানুষের মঙ্গলে পৌঁছতে লাগবে প্রায় ৬ মাস সময়। এই দীর্ঘ সময় ধরে মহাশূন্য যাত্রার ধাক্কা তাকে সহ্য করতে হবে। শুধু তাই নয়, চাঁদের তুলনায় মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ অনেক বেশি হওয়ার কারণে মঙ্গলে নামার সময় মানুষ-যাত্রীর নিরাপত্তার জন্য অবতরণ যানের গতি কমিয়ে আনাও বেশ দুরূহ হবে। তেমনি ওখান থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ফিরতি যাত্রাও একই ভাবে অধিক উদ্যোগ আয়োজনে হতে হবে। কাজেই নিয়মিত ভিত্তিতে মঙ্গলে যাওয়া আসা করতে হলে এই অসুবিধাগুলো হিসাবের মধ্যে আনতে হবে।

মঙ্গলে যাতায়তের ক্ষেত্রে তাই আরো একটি বিষয় গুরুত্ব পাচ্ছে তা হলো এখনই সরাসরি মঙ্গলে যাওয়ার চেষ্টা না করে তার কাছাকাছি মধ্যবর্তী অন্য কোথাও আগে গিয়ে অবতরণ করা। সেই মধ্যবর্তী জায়গা হতে পারে সুবিধামত কোন গ্রহাণু। মঙ্গলের চারিদিকে কক্ষপথে আবর্তন করছে এমনি কোন যুৎসই গ্রহাণুই হবে মঙ্গলের দিকে প্রথম মানুষবাহী মহাশূন্যযানের গন্তব্য। নাসার পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৫ সাল নাগাদ মঙ্গলের কাছে গ্রহাণুতে অবতরণের মাধ্যমেই মানুষের মঙ্গলমুখি অভিযান শুরু হবে। এভাবে প্রথমে গ্রহাণুতে যাওয়ার সুবিধাটি স্পষ্ট। ওখানে মাধ্যাকর্ষণ নগণ্য বলে অবতরণ সহজতর, উৎক্ষেপনও সহজতর। অন্যদিকে ওখান থেকে আমাদের আসল লক্ষ্য মঙ্গলের সম্পর্কে আরো সরাসরি গবেষণা চালাতে পারবে মানুষ। এমনকি মঙ্গলে বসত স্থাপনের জন্য যে প্রচুর বস্তু সামগ্রি প্রয়োজন হবে, মহাশূন্যযান ও অন্য যন্ত্রপাতির জন্য যে যন্ত্রাংশ, জ্বালানি ইত্যাদির যোগান লাগবে, তার একটি ডিপো গড়ে তোলা যাবে এই নিকটবর্তী গ্রহাণুতে।

অবশ্য গ্রহাণুতে যাওয়ার কিছু নিজস্ব সমস্যাও রয়েছে। মঙ্গলের কক্ষ পথে গ্রহাণুগুলো সম্পর্কে আমাদের অনেক কথা জানা নেই। ছোট এই গ্রহাণুর নিজের অক্ষের উপর বনবন করে ঘোরার গতি বেশি হলে মানুষের পক্ষে তাতে নামা ও থাকা কঠিন হবে। তাছাড়া এদের গতিবেগ ও গতির দিকের সঙ্গে তাল রেখে এর চারিদিকের কক্ষে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে মানুষবাহী মহাশূন্যযানকে বেগ পেতে হবে ও জ্বালানি ব্যয় করতে হবে।

মঙ্গলের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহাণুর বদলে আর একটু বড় জিনিস মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ ফোবোস ও ডাইমোসকেও গন্তব্য করা যেতে পারে। এটিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত কিছুটা বড় ফোবোস এই দিক থেকে বেশি সুবিধাজনক হবে। অনিয়মিত আকৃতির এই উপগ্রহটিও এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সর্বাধিক ২৮ কিলোমিটারের বেশি নয়। কিন্তু এটি হতে পারে মঙ্গলের খুব কাছাকাছি একটি চমৎকার মধ্যবর্তী ষ্টেশন। শুরুতে মঙ্গলে মানুষের যাওয়ার জন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং ফোবোস নিজের সম্পর্কে ও মঙ্গলের সম্পর্কে আরো অনুসন্ধানই হবে মানুষের ফোবোস যাত্রার উদ্দেশ্যে। কিন্তু পরে এটি মধ্যবর্তী ষ্টেশন হিসাবে, মেরামত কেন্দ্র হিসাবে, যন্ত্রাংশ ও সামগ্রির ডিপো হিসাবে মঙ্গলে মানুষের বসতের জন্যও খুবই কাজে আসবে।

একটু দূর ভবিষ্যতের দিকে তাকালে অবশ্য অনেকগুলো নূতন সম্ভাবনা দেখা দেবে– মঙ্গলে এবং ওরকম অন্যত্র যাতায়তের ক্ষেত্রে। আমরা মঙ্গলে যেতে ৬ মাস লাগবে বলছি বর্তমান রকেট প্রযুক্তির কথা চিন্তা করে। ভবিষ্যতে নিউক্লিয়ার রকেট সহ মহাশূন্যযানকে চালনা করার সম্পূর্ণ নূতন শক্তি উৎস ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে, যা এখন গবেষণার পর্যায়ে রয়েছে। শুধু নিউক্লিয়ার রকেট বাস্তবায়িত হলেই মঙ্গলে যাওয়া ৬ মাসের বদলে ২ সপ্তায় নেমে আসতে পারে। এ সম্পর্কে আমরা আন্ততারা যাতায়ত প্রসঙ্গে অন্য অধ্যায়ে আলোচনা করবো। তবে এখানে যাতায়তের দুটি একেবারেই ব্যতিক্রমী উপায় উল্লেখ করবো যেগুলো ভবিষ্যতে ভূ-উপগ্রহ থেকে, চাঁদ থেকে, মঙ্গল থেকে বা এরকম নিকটতর দূরত্বে মানুষ ও মালামাল অপেক্ষাকৃত সহজে মহাশূন্যে আনা নেয়া করবে।

মহাশূন্য লিফ্‌টঃ

বহুতল ভবনে উঠানামার জন্য আমরা যে লিফ্‌ট ব্যবহার করি এটি হবে অনেকটা সে রকম ব্যবস্থা। ধরা যাক মঙ্গলে আসা যাওয়া বা মাল পরিবহনের জন্য এটি ব্যবহার করতে চাই। এক্ষেত্রে মঙ্গলের চারিদিকে তার কক্ষ পথে স্থাপন করতে হবে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ অথবা টেনে আনা কোন গ্রহাণু– এমন সঠিক দূরত্বের কক্ষপথে যাতে

তা ভূ-স্থির থাকে। অর্থাৎ কিনা এর গতি মঙ্গলের আবর্তনের গতির সঙ্গে এমন ভাবে মিলে যাবে যে মঙ্গলের পৃষ্ঠের কোন একটি জায়গার ঠিক উপরে একে সব সময় স্থির পাওয়া যাবে– যেমন পৃথিবীর টেলিকম্যুনিকেশনের জন্য অনেক কৃত্রিম উপগ্রহকে এভাবে ভূ-স্থির রাখা হয়। এখন মঙ্গল থেকে ঐ উপগ্রহের মধ্যে স্থাপন করতে হবে একটি খুবই শক্ত দড়ি বা ক্যাবল। খুব সম্ভব আধুনিক কার্বন ন্যানো টিউবের প্রযুক্তি দিয়ে এর জন্য প্রয়োজনীয় শক্ত ক্যাবল পাওয়া যাবে। ক্যাবলটি একদিকে মঙ্গলের বিষুবের কাছে একটি অনেক উঁচু ও মজবুত ভিত্তির টাওয়ারে আর অন্য দিকে উপগ্রহটিতেও একই ভাবে আটকানো থাকে। হাজার হাজার কিলোমিটার লম্বা এই ক্যাবলটির নিজের ভারও কম হবেনা– এর ভারসাম্য রক্ষার জন্য উপগ্রহটি থেকে মঙ্গলের উল্টো দিকেও একই রকম ক্যাবল বিস্তৃত করতে হবে। এবার এই ক্যাবলের উপরেই চলাচল করতে পারবে মহাশূন্য যানবাহন– অনেকটা লিফ্‌ট যেভাবে উঠানামা করে সেভাবে। ঘর্ষণবিহীন অত্যন্ত উচ্চ গতির ট্রেন যেভাবে এখন বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তিতে পৃথিবীতে চলাচল করছে অনেকটা সেরকম শক্তিতেই দ্রুত ত্বরিত হবে এই মহাশূন্য লিফ্‌ট। মঙ্গলের আবর্তনের কেন্দ্রাতিগ বলও তার চলার সহায়তা করবে। ক্যাবলের নানা স্থান থেকে মানুষ ও মালামাল সুবিধামত খোলা মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হতে পারবে– অন্য যানের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারবে। ঐ উপগ্রহের মাধ্যমেও তা আনা নেয়া করা যাবে। হিসেব করে

মহাশূন্য লিফ্‌টের যানবাহন

দেখা গেছে এভাবে যাতায়তের ব্যয় হবে রকেট চালিত মহাশূন্যযানের থেকে অনেক কম। এটি একটি নিরাপদ, নিয়মিত ট্রেনের মতই যাত্রী ও মালামাল বহন করতে পারবে মঙ্গলে বা অন্যত্র মানুষ বসতির জন্য। পৃথিবীতে এরকম মহাশূন্য লিফ্‌ট স্থাপন করে এখানকার পর্যটকদের জন্য নিরাপদ, সাশ্রয়ী মহাশূন্য পর্যটনের কথা ভাবা এখনই শুরু হয়ে গেছে।

মঙ্গলের ক্ষেত্রে অবশ্য একটি বাড়তি সমস্যা এতে দেখা দেবে। এটি হলো ভূ-স্থির হবার জন্য ক্যাবলটি যত দূর পর্যন্ত যেতে হবে তাতে তাকে মঙ্গলের উপগ্রহ ফোবসের কক্ষপথ অতিক্রম করতে হবে। এর ফলে ফোবসের সঙ্গে লিফ্‌টের সংঘর্ষের সম্ভাবনা থেকে যায়। এই বাস্তব সমস্যাটি সমাধানের জন্য চিন্তা করা হচ্ছে যে ক্যাবলটির স্বাভাবিক কম্পনটিকে এমন ভাবে টিউন করা হবে যেন তা সব সময়ই ফোবসকে এড়িয়ে যেতে পারে। সূক্ষ্ম ভাবে ক্যাবলের গঠন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এটি করা সম্ভব।

মহাশূন্য গুলতিঃ

ভবিষ্যতের মহাশূন্য যাতায়তের আর একটি অভিনব পদ্ধতি ছোট আকারে বেশ পরীক্ষিতও হয়েছে। এর নীতিটি অনেকটা কিছু ছুঁড়ে দেবার গুলতির মত– মহাশূন্যযানটিকে ভূমিতে থাকতেই গতি প্রদান করে অনেক উচ্চ গতিতে নিয়ে গিয়ে তারপর উপরের দিকে ছেড়ে দিয়ে উৎক্ষেপন করা হয়। আরো ভাল উপমা হলো এথলেটিক প্রতিযোগিতার হ্যামার-থ্রো এর মত– যাতে একটি ভারি গোলককে দড়িতে বেঁধে বার বার ঘুরাতে ঘুরাতে ক্রমান্বয়ে এতে গতি সঞ্চার করে উচ্চ গতিতে ছেড়ে দেয়া হয়। মহাশূন্য- যানের ক্ষেত্রে গতি সঞ্চার করা হবে পর পর তাকে অনেকগুলো শক্তিশালী বৈদ্যুতিক চুম্বকের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে ক্রমান্বয়ে তার গতি বৃদ্ধি করে। যত বেশি দূর পথে নিয়ে গিয়ে এভাবে গতি বাড়ানো হবে চূড়ান্ত গতি ততই বেশি হবে। বেশ ভারি একটি যানবাহনকে পৃথিবী থেকে উৎক্ষেপন করে কক্ষে স্থাপন করতে হলে গতি সঞ্চারের এই পথকে অন্তত কয়েক শত কিলোমিটার লম্বা হতে হবে। এতে প্রচুর শক্তি ব্যয়েরও প্রয়োজন হবে। তবে সুপার কণ্ডাক্টিং চুম্বক ব্যবহার করলে একদিকে যেমন চৌম্বক শক্তি অনেক বেশি হবে, অন্য দিকে বিদ্যুতের রোধ থাকেনা বলে এর দক্ষতা অনেক বেশি হবে– বিদ্যুৎ শক্তির একটি অতি বড় অংশই গতি শক্তিতে পরিণত হবে। এটিই মহাশূন্য গুলতির একটি বড় সুবিধা হবে– বর্তমান ব্যবহৃত রকেটের তুলনায় দক্ষতা অনেক বেশি হবে বলে উৎক্ষেপন ব্যয় কমে যাবে। পৃথিবীতে এটি ততটা হবেনা কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বেশি, এবং এখানে বায়ুমণ্ডলের কারণে গতিতে বাধা বেশি হবে। তবে গুলতির

মাধ্যমে এভাবে উৎক্ষেপনের পর রকেট চালু করে মহাশূন্যে যাওয়ার উপযুক্ত করতে বাকি গতি যোগ করলে পৃথিবীতেও বর্তমান প্রযুক্তি সক্ষমতার মধ্যেই এটি ব্যবহার করা সম্ভব।

মহাশূন্য গুলতির বেশি সম্ভাবনাময় ব্যবহার হবে মঙ্গলে, যেখানে মাধ্যাকর্ষণ কম, বায়ুচাপ খুবই কম। তাই ব্যয় সেখানে কম হবে, চাঁদে হবে আরো কম। পৃথিবীতেই হোক আর মঙ্গলেই হোক অনেকগুলো চুম্বকের মধ্য দিয়ে চক্রাকারে যানটিকে ঘুরানো হবে ভূমি সমান্তরালে। তারপর উৎক্ষেপনের ঠিক আগে একে ঢাল বেয়ে উপরের অভিমূখে নিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে। মঙ্গলের বিষুব রেখার কাছে থারসিস নামক উচ্চ ভূমির ঢাল ব্যবহার করে এটি করা সহজ হবে।

মহাশূন্য গুলতির আরো একটি ব্যবহার হতে পারে ভূমিতে নয় মহাশূন্য-– যানের মধ্যেই এর মাধ্যমে যানটির গতি সৃষ্টি করা। ছোট আকারের এই গুলতিতে নিউক্লিয়ার শক্তিতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে তা দিয়ে একই পদ্ধতিতে গুলতির মত ক্রমান্বয়ে গতি সঞ্চার করা কিছু যুৎসই বস্তুকে চূড়ান্ত গতিতে যানের পেছনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে রকেটের নীতেতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে মহাশূন্যযান। এক্ষেত্রেও সাধারণ রকেটের থেকে দক্ষ হওয়াতে পদ্ধতিটি সাশ্রয়ী হবে।

মঙ্গলে বসত গড়তে সমস্যাগুলো

মঙ্গলে বসত গড়তে বড় সমস্যা হলো এর অনেক কিছুই মানুষের বাসের অনুকূল নয়। এর পৃষ্ঠদেশে গড় উত্তাপ খুবই কম –৬৩° সেলসিয়াস। তবে অবস্থান ও ঋতুভেদে সাময়িক উত্তাপ অনেক বেশিও হতে পারে– এমনকি গ্রীষ্মে বিষুব রেখার কাছে ২০° সেলসিয়াসের মত আরামদায়কও হতে পারে, যদিও সেটি ব্যতিক্রমী। তরল পানির উপস্থিতি হয়তো এখানে হাতের কাছে নাই যদিও মেরু অঞ্চলে এবং ভূগর্ভে বরফ রয়েছে। মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর মাত্র ০.৩৮ ভাগ। খুব কম না হলেও এই ঘাটতিটুকুর ফল দীর্ঘ মেয়াদে শরীরের উপর কী হতে পারে তা আমাদের জানা নাই। বায়ুমণ্ডল খুব হালকা, চাপ অত্যন্ত কম। তাছাড়া এতে অক্সিজেন নাই, প্রধানত কার্বন-ডাই-অক্সাইড। তাই এতে নিশ্বাস নেবার প্রশ্নই উঠেনা। বাতাসে বিষাক্ত কার্বন-মনো-অক্সাইড থাকাটিও ভাল কথা নয়। আর বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তর না থাকাতে ক্ষতিকর আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি সরাসরি এসে পড়ছে। অন্যদিকে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্র জোরালো না হওয়াতে ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মি ও সৌর বায়ু না বেঁকে গিয়ে পৃষ্ঠদেশে চলে আসে। এসবের বিরুদ্ধে সুরক্ষা সৃষ্টি করেই মঙ্গলে থাকতে হবে মানুষকে।

এই সব কিছুতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে মঙ্গলে বসতকে সেখানকার পরিবেশে উম্মুক্ত রাখা যাবেনা– বরং নিশ্ছিদ্র আবৃত জায়গার মধ্যে থাকতে হবে যাতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, নিশ্বাসের অক্সিজেন, বাতাসের সঠিক চাপ, ক্ষতিকর রশ্মি থেকে সুরক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে। অবশ্য অর্থনৈতিক কাজ ও সম্পদ আহরণের জন্য এই আবৃত জায়গার বাইরেও যেতে হবে। তখন বিশেষ পোষাক পরে কাজ করতে অসুবিধা হবে বলে, হয়তো বিশেষ সুরক্ষিত গাড়িতে চলাফেরা করতে হবে যে গাড়ি এবড়ো খেবড়ো সব রকম ভূমির উপর দিয়ে চলবে। বাইরের কাজগুলো মানুষ করবে ঐ গাড়ির ভেতরে থেকে বাইরের যান্ত্রিক কিছু রোবট নিয়ন্ত্রণ করে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অবশ্য মানুষ নিজেই বিশেষ প্রেশার স্যুট পরে বাইরে কাজ করবে।

মঙ্গলের সব জায়গা কলোনি তৈরির জন্য সমান সুবিধাজনক হবেনা, এ জন্য কোন কোন অঞ্চলের কিছু বিশেষ সুবিধা রয়েছে। মেরু অঞ্চলগুলো বরফের যোগানের দিক থেকে ভাল হবে, কারণ এই বরফ গলিয়েই মঙ্গলের পানি সরবরাহ পেতে হবে। তবে মেরু অঞ্চলের দীর্ঘ রাত আর তখনকার অতি শীতল অবস্থাটি খুব অনুকূল হবেনা। পানির জন্য বরফ দূর থেকে আনা গেলে বিষূব অঞ্চলটির অনেক সুবিধা রয়েছে কলোনি স্থাপনের জন্য। এখানে গ্রীষ্ম কালে খুবই অনুকূল উত্তাপ পাওয়া যায়। তা ছাড়া এখানকার উচ্চভূমি থেকে নানা পদ্ধতিতে মঙ্গল থেকে উৎক্ষেপন সহজ হয়, তা রকেট, মহাশূন্য লিফ্‌ট, মহাশূন্য গুলতি যেভাবেই হোক না কেন। এই পার্বত্য জায়গায় রয়েছে অনেক গুহা যা কলোনির জন্য আশ্রয় নির্মাণে সহায়ক হবে। আর একটি অঞ্চল সুবিধাজনক হবে তা হলো ম্যারিনারিস উপত্যাকা নামে অঞ্চল যেখানে রয়েছে ৩০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং প্রায় ৮ কিলোমিটার গভীর এক অনন্য গিরিখাত। দুই দিকে পর্বত সুরক্ষিত বলে এখানে

পৃথিবীতে লাভা টিউবের মুখঃ
গ্রহ-উপগ্রহে এরকম লাভা টিউবে বসত হতে পারে

ক্ষতিকর রশ্মিগুলো অপেক্ষাকৃত অনেক কম পৌঁছে। কিন্তু পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা বলে সৌরশক্তি উৎপাদনের জন্য সূর্যের আলোর অভাব হয়না। সাধারণ পৃষ্ঠ সমতল থেকে অনেক নিচে অবস্থিত হওয়াতে এখানে বায়ুচাপও প্রায় ২৫% বেশি । মঙ্গলের নানা অঞ্চলে রয়েছে আগ্নেয়গিরির সৃষ্ট অনেক লাভা টিউব। এগুলো লাভায় গঠিত চারিদিকে ঢাকা প্রশস্ত ও দীর্ঘ নলাকৃতি অঞ্চল। পুরো বা আংশিক নিশ্ছিদ্রভাবে বন্ধ করে এদেরকে সহজেই মানুষের সুরক্ষিত আবাসে পরিণত করা সম্ভব।

মঙ্গলে বিভিন্ন কলোনির মধ্যে যোগাযোগ এবং আঞ্চলিক মালামাল পরিবহন খুব সহজ হবেনা। এতে উঁচু নিচু অঞ্চল শুষ্ক নদীখাত, উল্কা সৃষ্ট খাদ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সর্বত্রগামী গাড়ির পক্ষেও দূরপাল্লায় যাতায়ত প্রায় অসম্ভব হবে। বাতাসে রকেট ইঞ্জিন চালিত বিশাল বিমান এদিক থেকে সুবিধাজনক হবে। তাছাড়া এখানকার হাল্কা বাতাসকে আরো হালকা করে বেলুনে পুরে পৃথিবীতে এক কালে জনপ্রিয় জেপ্‌লিন জাতীয় বেলুন-বিমান এক্ষেত্রে কাজে আসতে পারে।

মঙ্গলে স্থায়ী কলোনির অর্থনীতি

স্থায়ী ভাবে মঙ্গলে বসত গড়ে তুলতে হলে তার অর্থনীতিকে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া দরকার। পৃথিবীর উপর বা অন্য কোন জায়গার উপর এর নির্ভরশীলতা যত কম হয় তত ভাল। এই কলোনির বিস্তার ও উন্নয়নের ক্ষমতা তার স্থানীয় অর্থনীতিরই থাকা প্রয়োজন। কলোনির বাসিন্দাদের জীবন ধারনের জন্য দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলোর যোগানও যথাসম্ভব স্থানীয় ভাবেই থাকা দরকার। এর একটি বড় মূলমন্ত্র হওয়া উচিত এসব জিনিসের পুনরাবর্তন– রিসাইক্লিং। খাদ্য, পানীয়, নিশ্বাসের বাতাস– এসব যতই নবায়নযোগ্য হবে ততই কলোনি টেকসই হবে। এজন্য তাদের আবাসের একটি সম্ভাব্য ব্যবস্থাপনা হতে পারে নিম্নরূপ। এটি খুব বেশি পরিমাণে নির্ভর করবে যথাযথ অণুজীবের কাজের উপর। ভবিষ্যতে অণুজীবের কাজের ভিত্তিতে এমন ফুয়েল সেল সম্ভব হবে যা কলোনির নানা বর্জ্য থেকে ও উপযুক্ত উপাদানের মাটি থেকে শক্তি উৎপাদন করতে পারবে। এই শক্তি উৎপাদনের একটি কেন্দ্র আবাসের কাজেই প্রত্যেক কলোনির সঙ্গে থাকবে। আর থাকবে বেশ বড়সড় গ্রীন হাউস – স্বচ্ছ দেয়ালের ও ছাদের তৈরি আবাদের জায়গা। মানব বর্জ্য থেকে অণুজীব সার তৈরি করবে। সেটি ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রধান বাতাসের সাহায্যে এখানে সিয়ানো ব্যাকটেরিয়া ও উদ্ভিদ বেড়ে উঠে সূর্যালোকের সাহায্যে অক্সিজেন, পানি ও খাদ্য তৈরি করবে। সিয়ানো ব্যাকটেরিয়া এভাবে স্পিরুলিনার মত প্রোটিন সমৃদ্ধ বিশেষ খাদ্যও তৈরি করবে। উদ্ভিদের জন্য মাটির সমস্যা মিটবে মঙ্গলে থাকা প্রচুর ব্যাসাল্ট আগ্নেয় শিলার মাধ্যমে। একরকম ব্যাসাল্ট-খেকো

অণুজীব পৃথিবীতে রয়েছে যারা এই শিলাকে মাটিতে পরিণত করতে পারে। মঙ্গলের শিলায় লোহার আধিক্য রয়েছে বলে (যে কারণে এর ভূমির রং লাল) এই ব্যাকটেরিয়াকে লোহা-সহ্যকারী হিসাবে গড়ে তোলা হবে। ফাঙ্গাস আর আলজির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় সৃষ্ট যে লাইকেন পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের কাছে প্রাণিদের পুষ্টি যোগায়, তা এক্ষেত্রে মাটি গড়ে তুলতে খুবই সহায়ক হবে। জার্মানীতে একটি পরীক্ষণে মঙ্গলের মত পরিবেশ সৃষ্টি করে তাতে লাইকেন গজিয়ে এই তত্ত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। মঙ্গলের ক্ষতিকর আলট্রা-ভায়োলেটের আধিক্য ছাড়া আর সব বিষয়ে এক্ষেত্রে মঙ্গলের পরিবেশই সৃষ্টি করা হয়েছিল। এ ধরনের একটি ব্যবস্থায় শক্তি, খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি সব কিছুর জন্য একটি পুনরাবর্তিত চক্র কলোনিতে সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। সেখানে শরীরে জৈব বর্জ্য থেকেই আবার অণুজীব নির্ভর প্রসেসিং ও আবাদের মাধ্যমে খাদ্য, পানীয়, এবং নিশ্বাসের বাতাস ফিরে পাওয়া সম্ভব।

কানাডার ডেভন আইল্যাণ্ড নামক স্থানে শীতল উত্তর মেরুবৃত্তের ভেতর কৃত্রিমভাবে মঙ্গলের পরিবেশ সৃষ্টি করে দীর্ঘ মেয়াদী কিছু পরীক্ষা চালানো হয়েছে। এটি করা হয়েছে উল্কা সৃষ্ট একটি খাদের মধ্যে ছোট মঙ্গল-কলোনির মত অনুকৃতি সৃষ্টি করে। কয়েকজন মানুষ দীর্ঘকাল এই পরিবেশে কিছুটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে বাস করে মঙ্গলের সম্ভাব্য জীবন-পরিস্থিতি যাচাই করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা প্রধানত নিশ্ছিদ্র নিয়ন্ত্রিত পরিবেশেই বাস করেছিলেন মঙ্গল কলোনির মত। চাষবাস ইত্যাদির জন্য বিশেষ পোষাক পরে বাইরে এসে কাজ কর্ম করেছেন। এ ধরনের পরীক্ষা নিরিক্ষা ভবিষ্যতের মঙ্গল কলোনির জন্য আমাদেরকে তৈরি করে তুলবে।

খাদ্য আবাদ ছাড়াও মঙ্গলে আরো নানা রকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চলবে। হয়তো কলোনি স্থাপনের একটি বড় কারণই হবে অর্থনৈতিক। এর একটি উদ্দেশ্য হতে পারে মঙ্গলকে ভূ-পরিবর্তনের মাধ্যমে আরো ব্যাপক বসত ও অর্থনৈতিক কাজের জন্য উপযুক্ত করে তোলা। তা ছাড়া শুরু থেকেই এখানে খনি ও শিল্প গড়ে তোলার

পৃথিবীতে সদৃশ স্থানে মঙ্গলের পরিবেশ অনুকরণঃ
মঙ্গল বসতের পূর্বাভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য

চেষ্টা হবে। এর কিছুটা হবে স্থানীয় প্রয়োজনে, বাকি পৃথিবীতে বা অন্যত্র রফতানীর জন্য। স্থানীয় প্রয়োজনে গুরুত্ব পাবে অক্সিজেন, পানি, জ্বালানি, নির্মাণ বস্তু, শিল্প কাঁচামাল ইত্যাদি উৎপাদন।

এর কিছু কিছু রফতানীও করা যাবে। তা ছাড়া ব্যাপক রফতানীর মধ্যে থাকবে নানা খনিজ আকরিক। মঙ্গলে বিরল ও মূল্যবান বেশ কিছু খনিজ রয়েছে সোনা, রূপা, প্লাটিনাম ইত্যাদি। ফিউশন নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্ট্যরের জ্বালানি ডিউটেরিয়ামের পরিমাণ এখানে পৃথিবীর পাঁচ গুণ। এসব কর্মকাণ্ডের জন্য আমদানীও করতে হবে বেশ কিছু জিনিস। এসব পৃথিবী থেকেই আসতে হবে এমন কথা নেই, কাছাকাছি গ্রহাণু, উপগ্রহ, চাঁদ এসব জায়গা থেকেও আসতে পারে সরবরাহ, সেখানে মানুষের অনুসন্ধান ও উৎপাদনের মাধ্যমে। অণুজীব, সার, কাঁচামাল, প্রয়োজনীয় তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ ইত্যাদি আমদানী দ্রব্যের মধ্যে পড়বে। তেমনি মঙ্গলের বসতকারীরা যা রফতানী করবে তারও কিছুটা আসতে পারে কাছের এসব গ্রহাণু থেকে।

অনেক ধরনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরির কাঁচামাল মঙ্গলেই উৎপাদন করা যাবে। যেমন স্বচ্ছ গ্রীন হাউস ইত্যাদি তৈরির প্লাষ্টিকের উপাদান মঙ্গলেই রয়েছে। বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে শক্তি উৎপাদনের বড় উৎস হবে সৌর বিদ্যুৎ। এর জন্য সোলার প্যানেল তৈরিতে লাগবে সিলিকন। মঙ্গলে যে প্রচুর কার্বন ও হাইড্রোজেন রয়েছে তার সাহায্যে সিলিকেট শিলা থেকে দরকারী সব সিলিকন পাওয়া যাবে। যাবতীয় শিল্প,

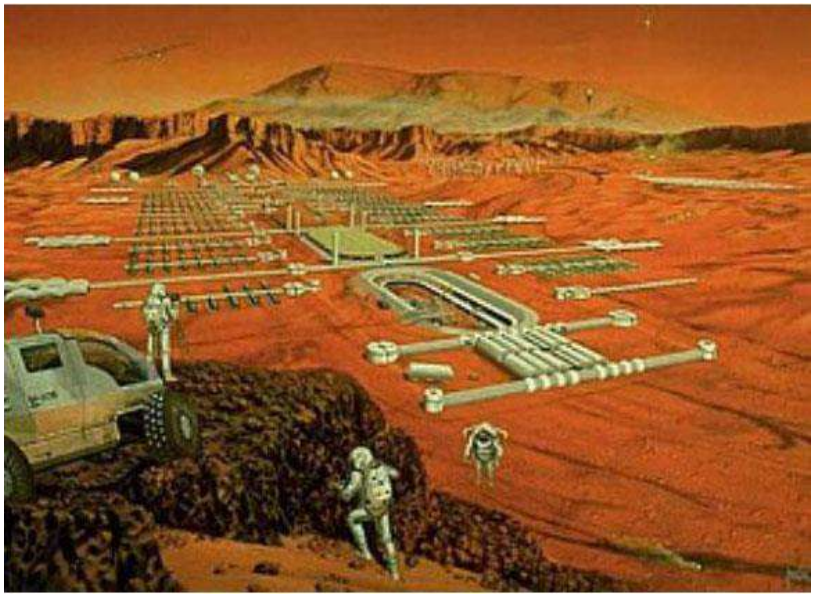

মঙ্গলে মানব বসতের কাল্পনিক চিত্র

খনি ইত্যাদি কাজের জন্য শক্তি উৎস হিসাবে সৌর শক্তি ছাড়া প্রধানত আর যার ভূমিকা থাকবে তা হলো নিউক্লিয়ার শক্তি।

মঙ্গলে মানুষের বসত স্থাপনের ব্যাপারে একটি প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। আমরা ইতোমধ্যে মঙ্গলে অণুজীব থাকার সম্ভাবনার কথা আলোচনা করেছি। যদি সত্যিই সে রকম জীব মঙ্গলে থাকে, তা হলে মানুষের আগমন ও কর্মকাণ্ডের ফলে ঐ জীব জগতের উপর কী প্রভাব পড়বে তার বিবেচনা প্রয়োজন। স্বাভাবিক ভাবে একটি আশংকা থাকেই যে মানুষ ও তার সঙ্গে যে অনেক বড় জীব ও অণুজীব অবধারিত ভাবে পৃথিবী থেকে মঙ্গলে যাবে তারা মঙ্গলের সম্ভাব্য জীব জগতের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে না তো। মঙ্গলের সম্ভাব্য জীব আদৌ পৃথিবীর অনুরূপ কিনা, এমনকি একই ছাঁদের হবে কিনা তাতেও সন্দেহ রয়েছে। সে যেমনই হোক আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে অপরিচিত ও অনভ্যস্ত জীবের আগমন ইতোমধ্যে থাকা জীবের জন্য শুভ হয়না। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারই তার বড় প্রমাণ– যার পুনরাবৃত্তি বহু রকম অভিবাসনের মাধ্যমে বার বার ঘটেছে। এ পর্যন্ত মনুষ্যবিহীন যে সব মহাশূন্যযান মঙ্গলে অবতরণ করেছে সেগুলোকে পৃথিবীর অণুজীব মুক্ত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, যদিও কত সফলভাবে তা বলা যাবেনা। কেউ কেউ সন্দেহ করেন পৃথিবীর অণুজীব ইতোমধ্যেই মঙ্গলে গিয়ে ক্ষতির প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। বসত স্থাপনের পর এটি তো অনিবার্য হবে, তখন? এই বিষয়টির দিকে অনেক ভেবে চিন্তেই আমাদের এগুতে হবে, এ নিয়ে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে গবেষণা ও অনুসন্ধান চলতে হবে অতি সাবধানতায়। মঙ্গলে আদৌ যদি কোন অণুজীব থাকে তা হলে তাদেরকে বরং আমরা আমাদের আবাসের জন্য ইতিবাচক হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে নেতিবাচক ভাবে তাদের ধ্বংসের কারণ ঘটতে দেয়া হবে না।

চাঁদের বসতেরও রয়েছে অনেক সুবিধা

মানুষের বসতের কথা উঠলে প্রথমে মঙ্গলের কথা উঠে। অথচ আমাদের অনেক কাছে রয়েছে চাঁদ, যেখানে আমরা ইতোমধ্যে বেশ ক'বার গিয়েছি, তার সম্বন্ধে জানিও অনেক বেশি। তারপরও বসতের জন্য চাঁদকে কম গুরুত্ব দেবার কারণ হলো এখানে জীববসতের একেবারেই প্রতিকূল পরিবেশ। বায়ুমণ্ডলের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি এই প্রতিকূলতার প্রধান দিক। বায়ু-আচ্ছাদনের অভাবে এর প্রায় পুরো বয়স ধরেই অবাধে উল্কার আঘাতে জর্জরিত হয়েছে এটি, যার চিহ্ন তার সারা গায়ে। আর ক্ষতিকর সকল রশ্মিরও অবাধ পতন সব সময় এর গায়ে, যার ফলে এটি একেবারে আষ্টে- পৃষ্ঠে সম্পূর্ণ নির্জীবিত একটি জায়গা। তার উপর এই দু'এক বছর আগেও আমাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল চাঁদে পানির ছিটে ফোটাও নেই। এরকম একটি

খটখটে মরুময় জায়গায় দু'এক দিনের জন্য ব্যস্ত ভ্রমণে যাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেখানে স্থায়ী ভাবে বসত করার কথা ভাবা যায়না– যতই সেটি আমাদের নিকটবর্তী হোক বা পরিচিত স্থান হোক না কেন।

চাঁদ সম্বন্ধে আমাদের একটি ধারণা অবশ্য ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে অতি সম্প্রতি। চাঁদে বহু পর্যবেক্ষণে যা ধরা পড়েনি, সেখানে বার বার গিয়েও যা বুঝা যায়নি, পৃথিবীতে চন্দ্রশিলা এনে পরীক্ষা করেও যা ধরা পড়েনি, সেই পানির অস্তিত্ব চাঁদে আবিষ্কৃত হয়েছে এই সেদিন ২০০৯ সালে। ঐ বছরের সেপ্টম্বরে ভারতীয় মহাশূন্য যান চন্দ্রায়ন-১ চাঁদের চারদিকে কাছে থেকে আবর্তনের সময় চাঁদে নাসার রেখে আসা খনিজ বিশ্লেষকের এমন কিছু সিগন্যাল পায় যাতে পানির অস্তিত্ব প্রথম ধরা পড়ে। তারপর সেবছর নভেম্বর মাসে চাঁদের ক্যাবেউস উল্কা খাদে নাসার উদ্যোগে একটি ক্ষেপনাস্ত্রের আঘাত হানা হয় যার ফলে ৩০ মিটার ব্যাসের একটি গর্ত হয়ে তার থেকে প্রায় এক কোটি কিলোগ্রাম বস্তু উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গেই কাছে যাওয়া একটি মহাশূন্যযান এগুলোর বিশ্লেষণ করে তাতে প্রায় ১০০ কিলোগ্রাম পানির সন্ধান পেয়েছে। ২০১০ সালের মার্চে চন্দ্রায়ন-১ থেকে নাসা রাডারে চাঁদের উত্তর মেরুতে ২ মিটার পুরু বরফের সন্ধান পাওয়া গেছে যার মোট পরিমাণ প্রায় ৬০ কোটি টন। এটি একটি বড় আবিষ্কার। খুব সম্ভব মঙ্গলের মতই চাঁদের অন্তত কোন কোন অঞ্চলে মাটির ভেতরে শিলায় পানি মেশানো রয়েছে, আর মেরুতে বরফের সঞ্চয় রয়েছে। মঙ্গলের চেয়ে এর পরিমাণ অনেক কম হলেও তা সামান্য নয়।

অবশ্য চাঁদে পানির আবিষ্কার হবার আগে থেকেই সেখানে বসত গড়ার কথা বিজ্ঞানীরা পরিকল্পনা করেছেন– তার সব প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও। এর সঙ্গত কিছু কারণ রয়েছে বৈ কি। সৌর জগতের অন্য কোথাও বসতের জন্য পা বাড়াবার আগে বাড়ির কাছের এই চাঁদেই হতে পারে চমৎকার একটি বসত– অন্তত প্রাথমিক একটি ষ্টেশন হিসাবে। খুব কম মাধ্যাকর্ষণ থাকাতে এখানে নামা সহজতর, এখান থেকে আবার উৎক্ষেপনও সহজ। যতদিন না পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের নাড়ির বন্ধন একেবারে কেটে যাচ্ছে, পৃথিবী থেকে রসদ এনে কলোনি চালাবার জন্য চাঁদই সব চেয়ে সুবিধাজনক। পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটিও খুব সহজ, কারণ রেডিও যোগাযোগে কথাবার্তা পৃথিবী থেকে চাঁদে বা চাঁদ থেকে পৃথিবীতে যেতে সময় লাগে মাত্র ৩ সেকেণ্ড। অন্য গ্রহ উপগ্রহের ক্ষেত্রে কথা বলে অনেক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে সেটি ওখানে পৌঁছে সেখান থেকে জবাব আসতে। ছবি বা ভিডিও সিগন্যাল আনা নেয়ার ক্ষেত্রেও তাই।

চাঁদে বসতের অসুবিধাগুলোতো এখন বেশ স্পষ্ট। পানির যোগানটি কত ব্যাপক সেটি এখনো নিশ্চিত নয়। বায়ুমণ্ডলের অভাবে উল্কা আর ক্ষতিকর বিকিরণের কাছে যে কোন বসত হবে অসহায়। দিন ও রাতের দৈর্ঘ অত্যন্ত বেশি– সেটিও সুবিধাজনক নয়। আবৃত গ্রীন হাউস তৈরি করে চাষবাস করতে হলে বিকিরণের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিতে পুরু স্বচ্ছ প্লাষ্টিকের আবরণ প্রয়োজন হবে। চাঁদে স্থায়ী ভাবে থাকার ও চলাফেরার আর একটি বিড়ম্বনা হবে তার মিহি ধূলা। এই ধূলি কণাগুলো বাতাসের ঘর্ষণের অভাবে অমসৃণ থেকে যায়। কাঁচ জাতীয় এই ধূলিকণার প্রভাবটি অনেকটা ক্ষুদ্র ছুরি বা ঘর্ষণকারীর মত– সব কিছুর মধ্যে জমে তাকে ঘষাঘষিতে ক্ষয় করতে চাইবে।

চাঁদের দীর্ঘমেয়াদী কলোনিতে স্বনির্ভর হবার উপায় কম– খুবই বেশি পৃথিবীনির্ভর হতে হবে একে। এর কারণ কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি জরুরী হালকা মৌল বাতাস থেকে পাওয়ার উপায় নাই। ভূমিতেও এদের অভাব প্রকট, সেখান থেকে উদ্ধার করতে পারা দুরূহ হবে। তারপরও চাঁদে অন্তত বিশেষ ধরনের কলোনি প্রাথমিক ভাবে স্থাপিত হবে আরো দূরের সুবিধাজনক আরো স্বনির্ভর কলোনি স্থাপনের লক্ষ্যে। হাজার হলেও চাঁদই তো আমাদের অধিক পরিচিত নিকট প্রতিবেশী। যে প্রতিকূলতাগুলো এখানে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে নূতন গবেষণা ও তথ্য-উপাত্তে তার কিছু কিছু কমতেও পারে। যেমন চাঁদের উত্তর মেরুতে বরফ আবিষ্কার এ অঞ্চলে কলোনির সুযোগ বাড়িয়েছে। দীর্ঘ দিন ও রাতের কারণে কলোনিতে শক্তির প্রধান উৎস সৌরশক্তি একটানা পাওয়ার ক্ষেত্রে যে সমস্যা হবে মেরু অঞ্চলের বিভিন্ন দিকের সৌর প্যানেলগুলোর কিছু কিছু প্রায় সার্বক্ষণিকভাবে কার্যকর থাকবে বলে এ অঞ্চলে সেক্ষেত্রেও সুবিধা। তাছাড়া সেখানে দিন বা রাতের এলাকা বাছাই করে ঠাঁই বদলেরও সুবিধা হবে। স্থানীয় সম্পদের অনুসন্ধান চাঁদের অন্য দিকটিতে এখনো তেমন হয়নি, কারণ ওটি পৃথিবী থেকে উল্টো দিকে থেকে গেছে সব সময়। এই অনুসন্ধান কলোনির সুযোগ প্রশস্ত করতে পারে। তবে চাঁদের বসত ভূ-গর্ভে হবারই সম্ভাবনা বেশি, চাঁদের লাভা টিউবগুলোও বেশ কাজে আসতে পারে এ কাজে।

চাঁদের আভ্যন্তরীণ যাতায়ত ব্যবস্থা ঘর্ষণহীন ম্যাগলেভ ট্রেনের মাধ্যমে হওয়াটি স্বাভাবিক হবে– যাতে চাকা রেল স্পর্শ না করে শূন্যে ভেসেই দ্রুত এগিয়ে যাবে। উচ্চ চৌম্বক শক্তির কারণেই এভাবে ভেসে চলা সম্ভব হয়। বাতাস না থাকাতে এটি বাধাহীনভাবে খুব দ্রুত গতি লাভ করতে পারবে। তবে অত্যন্ত নিরাপদ নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা করতে হবে এই ট্রেনের জন্য। কোথাও যদি দুর্ঘটনা ঘটে এ কামরাগুলো ভাঙ্গে বা তাতে ছিদ্র দেখা দেয়, তা হলে বায়ুশূন্য চাঁদে সব যাত্রীর মৃত্যু অনিবার্য।

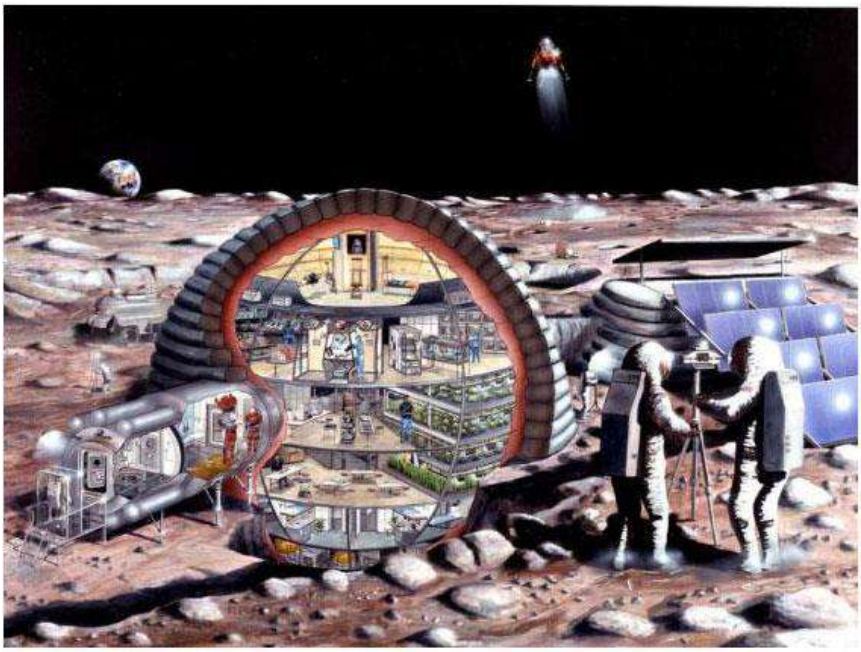

চাঁদে বসতের কাল্পনিক চিত্র

শুক্রে ভাসমান বসত

শুক্র গ্রহে কলোনি স্থাপন অনেক দিক থেকে খুব কঠিন হবে, যদিও এখানে ঘন বায়ুমণ্ডল রয়েছে, আমাদের প্রয়োজনীয় অনেক উপাদানও যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। এ বায়ুমণ্ডলই শুক্রের ভূ-পৃষ্ঠে সাধারণ কলোনি স্থাপনের পথে বড় বাধা, কারণ এটি অত্যন্ত ঘন এসিড মেঘে ভরপূর এবং এর চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ৯০ গুণ। ওখানে ভূ-পৃষ্ঠে বাতাসের যে চাপ অনুভূত হবে তা পৃথিবীতে সমুদ্র তলে এক কিলোমিটার গভীরতায় অনুভূত পানির চাপের সমান। এই চাপ সহ্য করার মত কলোনি তৈরি কঠিন হবে। তারপর রয়েছে প্রচণ্ড উত্তাপের প্রশ্ন। শুক্রের বিষূব রেখা অঞ্চলে পৃষ্ঠদেশে গড়ে উত্তাপ ৫০০° সেলসিয়াস। এমন উত্তাপে এর কোথাও পানি থাকাও সম্ভব নয়। পানির সন্ধান শুক্রে মেলেনি। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন নাই, বরং খুবই ঘন হয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড রয়েছে। তা ছাড়া এতে রয়েছে সালফিউরিক এসিডের এবং সালফার-ডাই-অক্সাইডের মেঘ। সাধারণ মানব বসতির প্রয়োজনীয় আচ্ছাদন ও অন্যান্য নির্মাণের উপর এর প্রভাব হবে অত্যন্ত ক্ষয়কারী। যথেষ্ট ভূ-পরিবর্তন করে আনার আগে শুক্রের পৃষ্ঠে স্থায়ী কলোনি স্থাপন তাই চিন্তা করা যায়না।

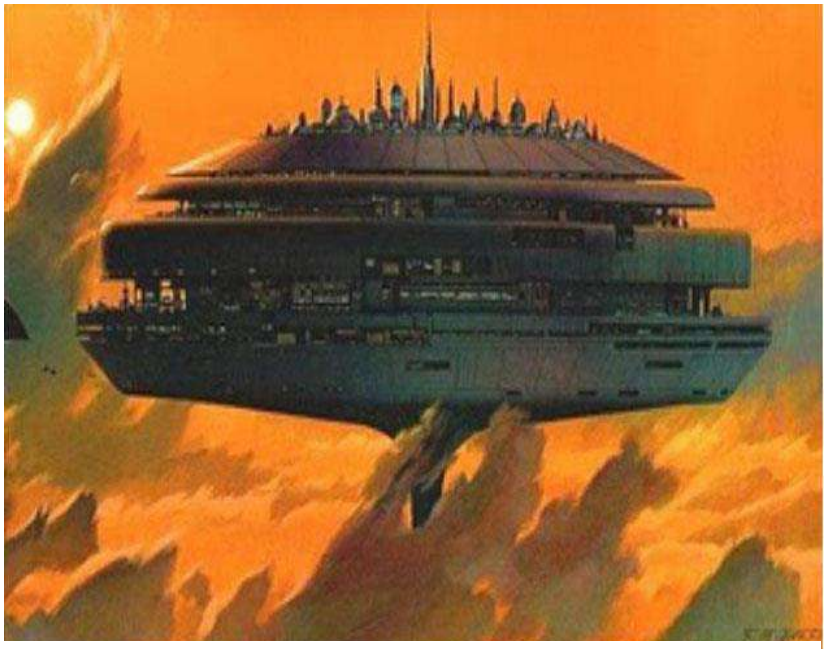

কল্পনায় শুক্রের বায়ুমন্ডলে ভাসমান মনুষ্য বসতি

তবে শুক্রের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে চিন্তা করা হচ্ছে একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির মানব-কলোনি– তা হবে শুক্রের বায়ুমণ্ডলে ভাসমান কলোনি। শুক্রের বায়ুমণ্ডলের বিশেষ বিশেষ উচ্চতায় সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র পরিবেশে যথাযথ চাপের বাতাসে ভর্তি হয়ে বেলুনের মত এরা ভাসবে। এর ভেতর বসবাসের জায়গায় ২১% অক্সিজেন ও ৭৯% নাইট্রেজেন অনুপাতে মানুষের জন্য স্বাভাবিক চাপে বাতাস থাকবে। ভেতরে বাতাসের চাপ বাইরের শুক্রের বায়ুমণ্ডলের তুলনায় অনেক কম হবে বলে ভাসমানতায় সুবিধা হবে। শুক্রের পৃষ্ঠের গড় উত্তাপ ৫০০° সেলসিয়াস হলেও বায়ুমণ্ডলে যত উপরে যাওয়া যায় উত্তাপ তত কমে যায়। ০° থেকে ৫০° সেলসিয়াসের মধ্যে উত্তাপ থাকে এমন উচ্চতা বেছে নেয়া যায় কলোনিটি ভাসার জন্য। বাইরের বায়ুচাপ ভেতরের তুলনায় অনেক বেশি হওয়াতে ছোটখাট ছিদ্র তৈরি হলেও খুব দ্রুত ভেতরের মূল্যবান বাতাস বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ কম। শুক্রের আবর্তন গতি খুব ধীর বলে এর পৃষ্ঠে দিন ও রাতের দৈর্ঘ খুব বেশি। কিন্তু পৃষ্ঠ থেকে অনেক উপরের কলোনির ঐ জায়গায় বাতাসের আবর্তন গতি হবে অনেক দ্রুততর– কাজেই ভাসমান কলোনিতে দিন ও রাতের দৈর্ঘ পৃথিবীর চার দিনের বেশি হবেনা। এভাবে বিভিন্ন দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় শুক্রের পৃষ্ঠদেশের চেয়ে এর উর্দ্ধাকাশে ভাসমান কলোনিতে বসতের সুবিধা অনেক বেশি।

এরকম ভাসমান কলোনিকে অবশ্য একটি বিষয়ে সাবধান হতে হবে। ওখানে কলোনির ঠিক বাইরেই শুক্রের বায়ুমণ্ডলের অত্যন্ত এসিড অবস্থার মোকাবেলা একে করতে হবে। তাই কলোনির আবরণ তৈরি হতে হবে ভাল সালফিউরিক এসিড সহ্যক্ষম বস্তু দিয়ে– যা মেটাল সালফেট, পলিইথিলিন, পলিপ্রাইলিন বা সিরামিক জাতীয় বস্তুতে গড়া হতে পারে। বিজ্ঞানীরা এখন শুক্রের বায়ুমণ্ডলে ভাসমান এমনি বিশাল সব কলোনির চিন্তা করছেন যার কোন কোনটি রীতিমত একটি শহরের আকারের হতে পারে। কাছাকাছি এরকম অনেকগুলো কলোনি মিলে সৃষ্টি হতে পারে সেখানে মানুষের আর একটি জগৎ। এরকম অনেকগুলো বিশালকায় কলোনিগুলোর ছায়া শুক্র পৃষ্ঠের উপর পড়বে বলে পৃষ্ঠের উত্তাপ কমে এসে অনুকূল ভূ-পরিবর্তনেরও একটি সুরাহা হতে পারে। সে রকম পরিস্থিতিতে কলোনি উর্দ্ধাকাশে হলেও শুক্রের পৃষ্ঠে নেমে খনি ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে পারবে ওখানকার বাসিন্দারা। এমনকি কলোনি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু কার্বন ন্যানো টিউবের মত আধুনিক প্রকৃতির হলে তার কাঁচামাল শুক্রের প্রচুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে স্থানীয় ভাবেই আসতে পারে।

শুক্রের বায়ুমণ্ডলে স্থাপন না করে তার বাইরে শুক্রকে পরিক্রমণকারী কৃত্রিম উপগ্রহেও কলোনি সৃষ্টি করা যায়। পৃথিবীর উপগ্রহের চেয়ে এর একটি বাড়তি সুবিধা হবে শুক্রের ঘন বায়ুমণ্ডলের কারণে কখনো যদি একে শুক্রের পৃষ্ঠদেশে নামিয়ে আনতে হয় তা হলে ধীরে ধীরে নির্বিঘ্নে তা করা যাবে, যা পৃথিবীর ক্ষেত্রে করা যায় না বায়ুমণ্ডল অপেক্ষাকৃত হালকা বলে।

টাইটানে মানব বসত

চাঁদ, মঙ্গল, শুক্র এসব অপেক্ষাকৃত কাছের গ্রহ-উপগ্রহে কলোনি স্থাপনের কথা স্বভাবতই আগে মনে আসে। কিন্তু আমাদের চিন্তা ও পরিকল্পনা শুধু এদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজন নাই। যাতায়াতের দিক থেকে আরো একটু দূরে যাওয়া আমাদের পক্ষে বর্তমানেও অসম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে বৃহস্পতি ও শনির কোন কোন উপগ্রহ আকর্ষণীয় হতে পারে। এগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক দিক থেকে সব চেয়ে আকর্ষণীয় হবে টাইটান। ২০০৮ সালে ক্যাসিনি মিশনের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছে যে টাইটান নানা রকম হাইড্রোকার্বনের একটি বড় আকর। এখানে বিশাল সব হ্রদে রয়েছে মিথেন, ইথেন ইত্যাদি তরল হাইড্রোকার্বনের প্রাচুর্য– পৃথিবীর যাবতীয় তেল-গ্যাসের সঞ্চয়ের তুলনায় যার পরিমাণ অনেক বেশি। কাজেই টাইটানে কলোনি স্থাপন করলে সেখানে হাইড্রোকার্বন ভিত্তিক নানা রকম অর্গানিক ক্যামিকাল্‌স উৎপাদনের বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। তা ছাড়া টাইটানের

বায়ুমণ্ডলে রয়েছে প্রচুর নাইট্রোজেন ও মিথেন। এর পৃষ্ঠদেশের ঠিক নিচে প্রচুর তরল হাইড্রোজেন ও এমোনিয়ার চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। কখনো কখনো আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তায় তা উপরে উঠে আসার প্রমাণও পাওয়া গেছে। এগুলোর ভিত্তিতে ব্যাপক ভাবে নাইট্রোজেন সার তৈরি হতে পারে টাইটানে।

বায়ুচাপের দিক থেকে টাইটান বসতের অনুকূল– কারণ এই চাপ পৃথিবীর মাত্র দেড়গুণ। ফলে আবদ্ধ কলোনি গড়লেও তার ভেতরে বাইরে চাপের পার্থক্য বেশি হবেনা– যা নির্মাণ কাজের জন্য ভাল। অন্য দিকে বায়ুমণ্ডল যথেষ্ট ঘন বলে বাইরের বিকিরণ, উল্কাপাত ইত্যাদির থেকে কলোনির সুরক্ষাও পাওয়া যাবে ভাল।

টাইটানে বসতের কয়েকটি অসুবিধাও অবশ্য বেশ প্রকট। এর মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর মাত্র ০.১৪ ভাগ যা চাঁদের চেয়েও কম। দীর্ঘ মেয়াদে এত কম মাধ্যাকর্ষণে থাকলে শরীরের উপর কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা এখনো আমাদের জানা নেই। তাছাড়া বায়ুচাপটি নির্মাণ কাজের অনুকূল হলেও অন্যান্য কিছু বিষয় কিন্তু কলোনির জন্য অনুকূল নয়। যেমন বায়ুর ঘনত্ব পৃথিবীর প্রায় ৪.৫ গুণ। উত্তাপও অত্যন্ত নিম্ন, পৃষ্ঠদেশে গড়পড়তা –১৭৯° সেলসিয়াস। এগুলো নির্মাণ কাজে নানা অসুবিধা সৃষ্টি করবে, কলোনির ভেতর উপযুক্ত উত্তাপ বজায় রাখাকে দুরূহ করবে।

তবে কম মাধ্যাকর্ষণ ও ঘন বায়ুমণ্ডলের একটি সম্ভাব্য সুবিধার কথা মনে করে আমরা আশান্বিত হতে পারি– তা হলো টাইটানের মধ্যে আকাশ পথে যাতায়ত। বিমান চালনা এখানে খুবই সহজ হবে– সহজে ভেসে থাকতে পারার কারণে। বিমানের ডানা খুব ছোট হলেই চলবে। এমনকি শরীরের সঙ্গে ডানা লাগিয়ে মানুষ নিজেও উড়ে যেতে পারবে। তবে নিশ্বাসের অনুকূল বাতাস না থাকা আর চরম শীতল আবহাওয়ার কথাটি মনে রেখে উড়ন্ত সেই মানুষকে সে ভাবে পোষাক সজ্জিত হতে হবে।

সৌর জগতে মহাশূন্যে বসত

আমরা বিভিন্ন গ্রহ বা উপগ্রহে সম্ভাব্য বসতের কথা আলোচনা করেছি। কিন্তু বসতের যেটুকু অভিজ্ঞতা আমাদের ইতোমধ্যে হয়েছে তা অন্য কোন গ্রহ বা উপগ্রহে নয়, বরং মহাশূন্যে কক্ষপথে স্পেস ষ্টেশনে। এটি পৃথিবীর কক্ষপথে হলেও, পৃথিবীর কক্ষ ছাড়াও সৌর জগতের অন্যত্র অন্যদের পরিক্রমণের কক্ষে এরকম ষ্টেশন সম্ভব, এবং তা বিশাল আকারে ব্যাপক কলোনির রূপও গ্রহণ করতে পারে। এর বড় সুবিধা হলো কোন গ্রহ বা উপগ্রহের প্রতিকূল বিষয়গুলোর তোয়াক্কা একে করতে হয়না, কারণ ঠিক যে রকম উত্তাপ, বায়ুচাপ, পরিবেশ দরকার তা

কলোনির মধ্যেই সৃষ্টি করে রাখা হয়। এমন কি কৃত্রিম ভাবে পৃথিবীর মত সঠিক মহাকর্ষও সৃষ্টি করা যায়। এটি করা যায় কলোনিটির নিজের অক্ষের উপর যথাযথ বেগে ঘূর্ণনের ব্যবস্থা করে এবং অক্ষের বিপরীত দিকের দেয়ালকে কলোনির মেঝ হিসেবে ব্যবহার করে। ঘূর্ণনের ফলে কেন্দ্রাতিগ বল সৃষ্টি হয় বলেই মহাকর্ষের মত বল অনুভূত হয়ে ঐ মেঝের দিকে। ভেতরে এভাবে অভ্যস্ত মহাকর্ষ পাওয়া একটি বড় সুবিধা বটে, কিন্তু কলোনির বাইরে বৃহত্তর এলাকায় মহাকর্ষ নগণ্য হওয়াটিও এই কলোনির একটি বড় সুবিধা। কারণ সে অবস্থায় ভারি বস্তু যন্ত্রপাতি এনে তা দিয়ে কলোনি তৈরি, মেরামত ইত্যাদি খুব সহজ হবে। ছোট থেকে শুরু করে ক্রমে কলোনি ইচ্ছেমত বড় করার সুযোগটিও এখানে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অন্য কোন সুরক্ষা থাকবেনা বলে মারাত্মক সব রশ্মি ও ছোট খাট উল্কা আঘাত ইত্যাদি থেকে রক্ষা করার জন্য এরকম কলোনির দেয়ালকে যথেষ্ট শক্ত ও পুরু হতে হবে। হয়তো এক বর্গমিটার দেয়ালের জন্য ৫টন বস্তুর প্রয়োজন হবে এতে। সব মিলিয়ে কলোনি তৈরির জন্য প্রচুর বস্তু সম্ভার দরকার হবে, যা নিকটবর্তী গ্রহ-উপগ্রহ থেকে সংগ্রহ করে সবকিছু সেখানেই তৈরি করতে পারলে ভাল হবে।

এরকম কলোনির ঠিক বাইরে শুধু মহাশূন্য, অন্য কিছু নাই। হাতের কাছে গ্রহ-উপগ্রহের সম্পদ থাকবেনা বলে চটপট নূতন রসদ এখানে মিলবেনা, দূর থেকে আনতে হবে। তাই পুরানো রসদ যথাসম্ভব চক্রাকারে বার বার ব্যবহার করতে পারাটি জরুরী। যেমন বসতকারীদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, পানি, ইত্যাদি এবং তাদের বর্জ্য সব কিছুর মধ্যে একটি নিরবিচ্ছিন্ন জৈব চক্র স্থাপন করে এটি সম্ভব।

উন্মুক্ত মহাশূন্যে অবস্থিত হওয়াতে এই কলোনির যাবতীয় শক্তি আসতে পারে বিশালকায় সৌর প্যানেল থেকে যার উপর সার্বক্ষণিক ভাবে কড়া সূর্যালোক পড়বে। খুব বড় কলোনি হলে এর নানা অংশের মধ্যে যাতায়তের জন্য ভাল যানবাহনের ব্যবস্থা ভেতরেই থাকবে। আর বাইরের জগতের সঙ্গে আনাগোনা, রসদ আমদানী

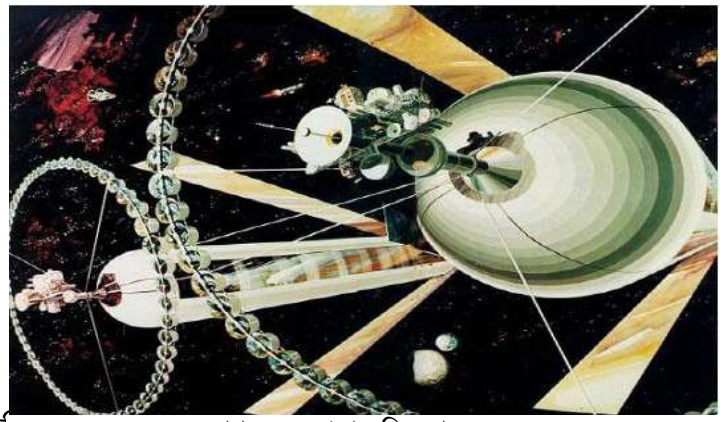

মহাশূন্যে কক্ষপথে কল্পিত মানব বসত

ইত্যাদির জন্য সহজ, সস্তা ব্যবস্থা হতে পারে মহাশূন্য লিফ্‌ট, বা মহাশূন্য গুলতি ইত্যাদি।

সৌরজগতের নানা জায়গায় অনেক কিছুর কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এরকম কলোনি। এদিক থেকে এর জন্য বহুরকম বিকল্প খোলা রয়েছে। অবশ্যই আমরা চাইবো পৃথিবীর কক্ষপথেই এমন বড় কলোনি স্থাপন করে পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে। চাঁদের কক্ষে, এমনকি মঙ্গল বা শুক্রের কক্ষে তৈরি করলেও আমরা অধিক পরিচিত পরিবেশে থাকতে পারবো, ও তার সম্পদগুলো ব্যবহার করতে পারবো, তুলনামূলক নৈকট্যের জন্য পৃথিবীর সুবিধাগুলোও হয়তো পাবো। কিন্তু সম্পদের আরো নানা বৈচিত্রের দিকে নজর দিতে হলে আমাদেরকে আর একটু এগিয়ে যেতে হবে– দূর গ্রহ-উপগ্রহগুলোর কক্ষে থাকার সুযোগও নিতে হবে। শুধু গ্রহ-উপগ্রহ কেন, বড় কোন গ্রহাণুর চারিদিকেও আমরা গড়তে পারি আমাদের কলোনি। যেখানেই তা করিনা কেন যথাসম্ভব কাছাকাছি সুবিধাজনক নানা গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু ইত্যাদিতেই হয়তো আমরা স্থাপন করবো এই কলোনিকে লালন করার জন্য দরকারি খনি, শিল্প, এমনকি গ্রীন হাউস। ছোট উপগ্রহ, গ্রহাণুর ক্ষেত্রে কম মহাকর্ষের কারণে এ কাজগুলো অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ হবে।

অন্য তারার গ্রহ

দেখা যায়না, তবুও বুঝতে পারছি

সৌর জগৎ আমাদের অপেক্ষাকৃত চেনা জগত। এখানকার গ্রহ-উপগ্রহের কোন কোনটিকে আমাদের আবাস হবার জন্য আমরা বেছে রেখেছি, এক রকম প্রস্তুতিও নিচ্ছি ভবিষ্যতে সেখানে গিয়ে থাকবার জন্য। কিন্তু সৌর-জগতের মধ্যেই আমাদের এ চিন্তাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এমন কোন কথা নেই।

হাজার হলেও সূর্য মহাবিশ্বের অসংখ্য তারার মধ্যে একটি মামুলি তারা মাত্র। নিশ্চয়ই এর মত আরো অসংখ্য তারারই নিজের গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে, যেগুলোর কোন কোনটি হয়তো আমাদের বসতের জন্য আরো অনেক বেশি সুবিধাজনক হবে। কিন্তু আমরা এসব তারা ও এদের সমাহার গ্যালাক্সিগুলোকে দেখতে পেলেও, এদের সম্পর্কে নানা তথ্য জানলেও, এদের মধ্যে কোন তারার কোন গ্রহ-উপগ্রহ কখানো দেখিনি, এবং অল্প কিছু বছর আগে পর্যন্ত সে রকম কিছুর অস্তিত্বের প্রমাণও পাইনি। কাজেই সেখানে যাওয়ার বা বসত করার বিষয়টি কিছুটা কল্পলোকের বিষয় হিসেবে আমাদেরকে নিতে হয়েছে, কারণ গন্তব্যের অস্তিত্ব সম্পর্কেই যে আমাদের কোন তথ্য ছিলনা। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, অন্য তারার গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে পরোক্ষভাবে হলেও। সেই সঙ্গে সৌর জগতের বাইরে আমাদের কলোনি তৈরির সম্ভাবনাও বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনার মধ্যে অনেক বেশি আসতে পারছে, গবেষণার ব্যাপ্তিও বাড়ছে এ সম্পর্কে।

দূরে নূতন তারার গ্রহ সৃষ্টি হবার প্রক্রিয়ার কিছু চাক্ষুষ প্রমাণ আমরা পাচ্ছিলাম, ঠিক গ্রহের নয়। মহাশূন্যে কক্ষপথে স্থাপিত স্পেস-টেলিস্কোপের পক্ষে পৃথিবীতে থাকা দূরবীনগুলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত বাধাহীন দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব হয়। এতে বীটা পেক্টোরিস নামে একটি নূতন তারার সৃষ্টি প্রক্রিয়াটি দেখা সম্ভব হয়েছে। মাঝখানে তারাটির চারিদিকে বিস্তৃত জায়গায় একটি চাক্তির মত ধূলি অবয়ব দেখা গেছে যার থেকেই গ্রহ সৃষ্টি হয় বলে এ সম্পর্কিত তত্ত্বের ধারণা। তত্ত্বে এটি সংগ্রহ চাকতি নামে পরিচিত। এই চাকতিতে মহাশূন্য থেকে সংগৃহীত ঘূর্ণায়মান ধূলিকণা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে গ্রহে পরিণত হয়। আর চাকতির ভেতরের দিকের অংশ থেকে ধূলিকণা সংগ্রহগুলো কেন্দ্রে তারাতে গিয়ে তাকেও সমৃদ্ধ করে। সাধারণত উজ্জ্বল তারার আলোর প্রভায় নিষ্প্রভ চাকতিটি দেখা যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ফটো

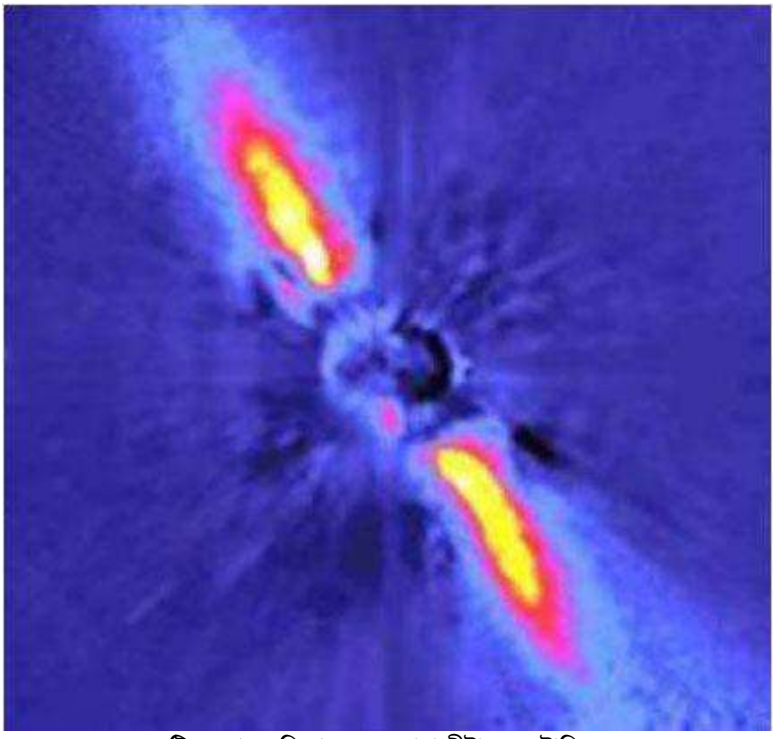

সৃষ্টি হওয়ার প্রক্রিয়ায় নূতন তারা বীটা পেকটোরিসের চারদিকে সংগ্রহ চাকতি যেখানে গ্রহমণ্ডলীর জন্ম হচ্ছে
(মহাশূন্য থেকে ইনফ্রা-রেড দূরবীক্ষণে দেখা)

তুলতে ব্যবহৃত ইনফ্রা-রেড আলো কিন্তু চাকতিটির তুলনামূলক ভাবে বেশি, সেই আলোতে তারার প্রভাকে ছড়িয়ে এই চাকতির প্রভাও উঠে এসেছে স্পেস টেলিস্কোপের ছবিতে। তাই তত্ত্ব অনুযায়ী ঐ তারার গ্রহ সৃষ্টির আভাস দেখা যাওয়ায় এরকম গ্রহ যে থাকতে পারে সে সম্পর্কে কিছুটা প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল বৈ কি।

তবে সাম্প্রতিক আরো কিছু পর্যবেক্ষণের ফলে ইতোমধ্যে থাকা গ্রহ সম্পর্কেও আমরা ক্রমাগত নিশ্চিত হতে পারছি। সরাসরি এরকম গ্রহ দেখা না গেলেও পরোক্ষ কিছু প্রক্রিয়ায় আমরা ইতোমধ্যে এরকম বেশ কিছু গ্রহের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছি, যেগুলো সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্যও আন্দাজ করতে পারছি। এরকম আবিষ্কৃত গ্রহের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে।

তারা দেখলেও তাদের গ্রহকে সরাসরি আমরা দেখতে পাইনা কেন? একটি কারণ হলো গ্রহগুলো আকারে তারার চেয়ে অনেক ছোট। তাছাড়া তাদের নিজস্ব কোন দীপ্তি নাই, তারার আলোকে এগুলো যতখানি আলোকিত হয় সেটি তারার ঔজ্জ্বল্যের তুলনায় খুবই নিস্প্রভ। দূরে সার্চ লাইটের আলোর খুব কাছে যদি কোন জোনাকি

থাকে আমাদের পক্ষে তা যেমন দেখা সম্ভব নয়, দূর তারার কাছের এই ছোট অনুজ্জ্বল গ্রহকেও তাই সরাসরি দেখা সম্ভব নয়।

তারা পর্যবেক্ষণ করে এর গ্রহ আবিষ্কার

তাদের গ্রহের কোন খবর না পেলেও অসংখ্য তারা সম্পর্কে আমরা অনেক খবর অনেক ভাবে পেয়ে এসেছি বহুদিন যাবত। এর মধ্যে রয়েছে তারার দূরত্ব, প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য, উত্তাপ, ও বর্ণালী বিশ্লেষণের মাধ্যমে তারার মধ্যে থাকা নানা মৌলের পরিচয় ইত্যাদি। তাছাড়া আমাদের দিকে তারা কী রকম বেগে সরে আসছে, বা কী বেগে আমাদের দিক থেকে সরে যাচ্ছে তাও খুব সূক্ষ্ম ভাবে জানতে পারি বর্ণালী নীলের দিকে বা লালের দিকে সরে যাওয়া লক্ষ্য করে। ডপলার প্রক্রিয়া নামে পরিচিত এই ব্যাপারটি আমরা শব্দের ক্ষেত্রে অহরহ টের পাই, যখনই একটি গাড়ি হর্ন বা সাইরেন বাজাতে বাজাতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে, বা আমাদের থেকে দূর সরে যেতে থাকে। এগিয়ে আসার সময় আমরা ঐ আওয়াজটিকে স্বাভাবিকের চেয়ে তীক্ষ্ণ ভাবে শুনি অর্থাৎ এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ হ্রাস পায়। দূরে যাওয়ার সময় স্বাভাবিকের চেয়ে মোটা ভাবে আওয়াজটি শুনি, অর্থাৎ তরঙ্গ-দৈর্ঘ বড় হয়। তরঙ্গ-দৈর্ঘের এই হ্রাস-বৃদ্ধি মেপে বলা যায় কী বেগে গাড়িটি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে বা দূরে সরে যাচ্ছে । আলোর ক্ষেত্রেও একই রকমটি ঘটে– আলোর-তরঙ্গ দৈর্ঘ কমে যেতে দেখে অর্থাৎ নীলের দিকে সরতে দেখে বুঝি কী গতিতে আলোর উৎসটি– যেমন তারাটি– আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। সরে যাওয়ার সময় ঠিক বিপরীতটি ঘটে বর্ণালীতে, এটি লালের দিকে সরে যায় এবং তা দেখে বুঝতে পারি উৎসটি কী বেগে দূরে সরে যাচ্ছে। যদি এমন দেখা যায় যে কোন তারার বর্ণালীতে এরকম সরনের খুব সামান্য পরিবর্তন হচ্ছে, ক্রমে তা সামান্য একটু বেড়ে একটি উর্দ্ধ সীমায় পৌঁছছে তারপর তা কমে যাচ্ছে ও একটি নিম্ন সীমায় পৌঁছছে, আর বার বার তা হতেই থাকছে– তা হলে বুঝতে হবে পৃথিবীর সঙ্গে তারাটির স্বাভাবিক গতিবিধির মধ্যে তারাটি খুব সামান্য পরিমাণে ক্রমাগত হেলছে দুলছে একবার এদিকে আবার ওদিকে।

১৯৯২ সালে ৫১ পেগাসি নামে একটি তারার বর্ণালীতে এরকম সরণের বারংবার পরিবর্তন দেখে বুঝা গিয়েছিল এটি তালে তালে দুলছে। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন এমন হেলতে দুলতে থাকার কারণ কী হতে পারে, কাছের কোন গ্রহ বা ওরকম কিছুর মাধ্যাকর্ষণের ফলে নয়তো? যেটি হয়তো এই তারাকে ক্রমাগত পরিক্রমণ করছে এবং তাই একবার এদিকে আবার ওদিকে আকর্ষণ করছে। তবে এই পরিক্রমণ যদি

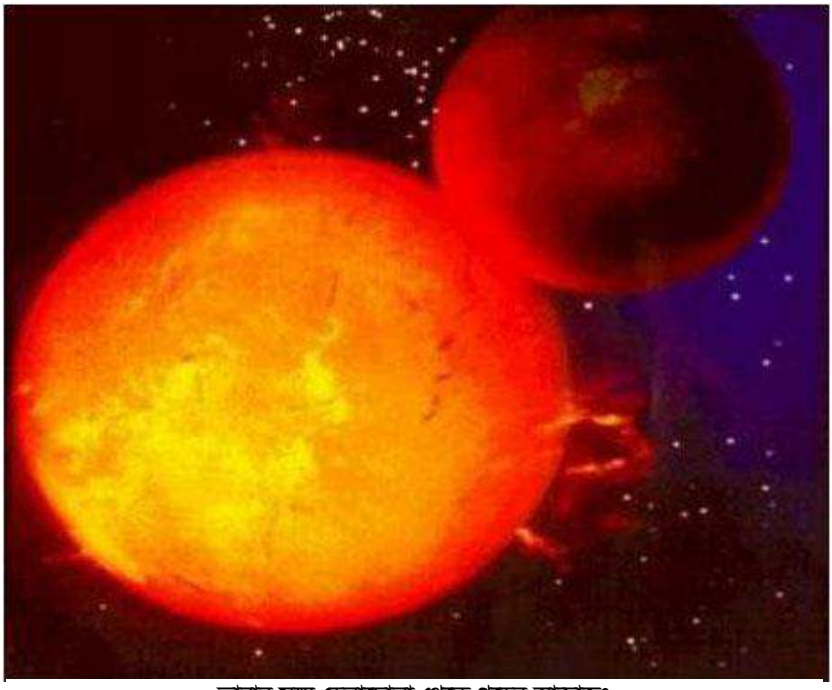

তারার সূক্ষ্ম হেলাদোলা থেকে গ্রহের আন্দাজঃ
৫১-পেগাসি-বি গ্রহের আবিষ্কার (কল্পিত চিত্র)

খুব দ্রুত ঘন ঘন হয় তবেই হেলাদোলাটি ঘন ঘন হবে, পরিক্রমণকাল দীর্ঘ হলে এও দীর্ঘদিন পর পর হবে।

উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক বহু দূরে অন্য কোন তারার জগতে বসে কোন পর্যবেক্ষক সূর্যের বর্ণালী পরীক্ষা করছেন। তিনি যদি বর্ণালীর সরনে সূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষ্য করে দেখেন তাঁর দিকে সূর্যের বেগ গড় বেগ থেকে সেকেণ্ডে মাত্র ১২.২ মিটার বেড়ে যাচ্ছে, আর তার ঠিক ছয় বছর পরে গড় বেগ থেকে ১২.২ মিটার কমে যাচ্ছে, তা হলে তিনি সঙ্গত ভাবেই মনে করতে পারেন যে একটি গ্রহ সূর্যকে ১২ বছরে একবার করে পরিক্রমণ করছে। আর সূর্যের বেগ পরিবর্তন থেকে ঐ গ্রহটির মাধ্যাকর্ষণের হিসেবটা যদি তিনি যথাযথভাবে কষেন তা হলে তিনি এও বুঝতে পারবেন যে ঐ গ্রহটি বৃহস্পতির সমান একটি গ্রহ। আসলেই তিনি বৃহস্পতির জন্যই সূর্যের বর্ণালীতে ওরকম দেখতে পাবেন এবং এ ভাবে বৃহস্পতিকে না দেখেই এই গ্রহটির অস্তিত্ব বুঝতে পারবেন। অবশ্য সূর্যের অন্য গ্রহগুলোর জন্যও সূর্যের এমন হেলাদোলা দেখা যাবে, এবং তা পর্যবেক্ষণগুলোকে অপেক্ষাকৃত জটিলতর করে তুলবে। তবে অন্য হেলাদোলাগুলো ছয় বছর পর পর ঘটবেনা, আর বৃহস্পতির মত অতটা জোরালোও হবেনা, কারণ বৃহস্পতি সব চেয়ে ভারী গ্রহ বলে তার মাধ্যাকর্ষণও সব চেয়ে বেশি। অবশ্য ছয় বছর, বার বছর ধরে এক নাগাড়ে

পর্যবেক্ষণ করে যাওয়া অনেক ধৈর্যের ব্যাপার, আর একে বার বার এত বছর পর পর পর্যবেক্ষণ করে করে নিশ্চিত করা তো বটেই।

ব্যাপারগুলো প্রথম বুঝা গিয়েছিল ১৯৯২ সালের সেই আবিষ্কারে। সেই ৫১ পেগাসি তারাটির ক্ষেত্রে বর্ণালীর সরণে পরিবর্তন থেকে মনে হলো বৃহস্পতির মতই ভারী একটি গ্রহ এ তারাকে পরিক্রমণ করছে, কিন্তু তার পরিক্রমণ কাল মাত্র চার দিন, সূর্যের বৃহস্পতির মতো বার বছর নয়। এটি বুঝা গেল কারণ দু'দিন পর পরই আমাদের দিকে এ তারার গতি সামান্য বাড়ছে আবার সামান্য কমছে। এমন স্বল্প পরিক্রমণ কাল হবার অর্থ এর কক্ষপথটি খুব ছোট– তারার খুব কাছে থেকে এটি তাকে পরিক্রমণ করছে। এত প্রকাণ্ড একটি গ্রহ এত কাছে থাকাতে এর মাধ্যাকর্ষণও তারাটির উপর বেশি– হেলাদোলাটি তাই অপেক্ষাকৃত বেশি। ১৯৯২ সালের দিকে বর্ণালীর সরনে পরিবর্তন আজকের মত এতটা সূক্ষ্ম ভাবে মাপার উপায় না থাকলেও পরিবর্তনটি অপেক্ষাকৃত বড় হওয়াতে সেই প্রথম অন্য তারার গ্রহের অস্তিত্ব অনুমান করা সম্ভব হয়েছে– পরোক্ষ ভাবে হলেও। তাছাড়া পরিবর্তনের পুনরাবৃত্তির জন্য মাত্র চার দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে বিষয়টি বিজ্ঞানীদের নজরে আসাটি সম্ভব হয়েছে। সূর্যের চারিদিকে বৃহস্পতির মত ১২ বছরে হলে হয়তো, আদৌ তাঁদের নজরে পড়তোনা। এক্ষেত্রে বরং বার বার লক্ষ্য করে ব্যাপারটি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়াও এ কারণেই সম্ভব হয়েছে।

সেই প্রথম আবিষ্কৃত হবার পর নানা দূর-তারার অনেকগুলো গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে– পাঁচশ' গ্রহেরও অধিক। এদের অধিকাংশই এ পদ্ধতিতেই আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু পদ্ধতিটি এখনো যে খুব সহজ বা সমস্যাহীন তা বলা যাবেনা। বর্ণালীর সরনে যতটুকু পরিবর্তন এতে উদ্ঘাটন করতে হয়, অন্যান্য নানা কারণে ঘটা দৈবাৎ পরিবর্তনের মধ্যে (যাকে 'নয়েজ' বলা যায়) এই অভীষ্ট 'সিগন্যালের' পরিমাণ খুব নগণ্য। তাই খুব সংবেদনশীল যন্ত্র ব্যবহার করে এতো নয়েজের মধ্যে এইটুকু সিগন্যালকে উদ্ঘাটন করতে হয়। শুরুর দিকে যন্ত্রপাতি কম সংবেদী ছিল বলে তখন শুধু অনেক বড় ও ভারী গ্রহগুলোই আবিষ্কৃত হতে পেরেছে– বৃহস্পতি সাইজের গ্রহগুলো। তাছাড়া তারার খুব কাছে থেকে পরিক্রমণকারী (কম পরিক্রমণকাল) গ্রহই তখন ধরা পড়েছে। কিন্তু সাধারণত এত ভারী গ্রহ তো তারার এত কাছে সৃষ্টি হবার কথা নয়। সৌর জগতে সঙ্গত কারণে আমরা বৃহস্পতি ইত্যাদি ভারী গ্রহকে সূর্যের অনেক দূরে দেখি, আর কাছে দেখি বুধ, শুক্র ইত্যাদি ছোট গ্রহকে। গ্রহ তৈরির প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব অনুযায়ী এটিই হবার কথা। তাই মনে হচ্ছে ঐ অন্য তারার খুব কাছের প্রকাণ্ড গ্রহগুলো আসলে সৃষ্টি হয়েছিল নিজ নিজ তারা থেকে অনেক দূরের অঞ্চলে, তারপর কোন ভাবে কাছে চলে এসেছে। কিন্তু তাতেও

নানা প্রশ্ন উঠে। দূরের গ্রহ এভাবে কাছে আসলো কেন? আসলোই যদি তবে তা পুরোটা এসে তারার মধ্যে ঢুকে পড়লো না কেন? আর এরকম ঘটনা অন্য তারায় হলে আমাদের সৌর জগতে হলো না কেন, বৃহস্পতি ইত্যাদি বড় গ্রহ সূর্যের কাছে চলে আসলো না কেন?

প্রথম প্রশ্নটির একটি সম্ভাব্য উত্তর হলো একটি তারার জগতে গ্রহরাজির বাইরেও যে বিপুল পরিমাণ বাড়তি বস্তুকণা থাকে তা তারার অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি থেকে কক্ষপথে পরিক্রমণ করে। দূরের প্রকাণ্ড ভারী গ্রহের আকর্ষণে এগুলো বাইরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং এরই প্রতিক্রিয়ায় এই গ্রহ তারার কাছে চলে আসে। তা হলে গ্রহটি তারার মধ্যে ঢুকে পড়ে না কেন? এই দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর হলো কাছে আসার পর গ্রহটি তারার সঙ্গে জোয়ার-ভাটার সম্পর্কে সুসংবদ্ধ হয়ে পড়ে, যেমনটি অনেক গ্রহ-উপগ্রহের ক্ষেত্রে ঘটে– যেমন আমাদের চাঁদ পৃথিবীর সঙ্গে জোয়ার ভাটায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এমনটি হলে তারার কাছে আসা গ্রহটির যে অংশ তারার কাছে থাকে তা ফুলে উঠে, ঠিক তার বিপরীত অংশও ফুলে উঠে। এই দুই ফোলা জায়গার পরস্পর ক্রিয়ায় গ্রহের পরিক্রমণকাল ক্রমেই তার নিজের অক্ষের উপর আবর্তনকালের সমান হয়ে পড়ে, এবং এর একদিকই সব সময় তারাটির দিকে মুখ করে থাকে। বৃহস্পতির উপগ্রহগুলোর আলোচনায় আমরা এ বিষয়টি আগেও দেখেছি। একবার এমনটি হলে গ্রহটি তারার আর এর চেয়ে কাছে যেতে পারে না। তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল সৌর জগতে বৃহস্পতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে এমনটি হলোনা কেন, এরা কেন সূর্যের কাছে চলে আসলোনা? সৌর জগতের ক্ষেত্রে বাড়তি বস্তুসম্ভার কম ছিল বলেই ঐ প্রক্রিয়ায় ভারী গ্রহগুলো কাছে আসতে পারেনি।

দূর তারার গ্রহ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তারার হেলাদোলা লক্ষ্য করার পদ্ধতিটিতে আরো কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যদিও এখনকার অতি সংবেদী বর্ণালী বিশ্লেষক যন্ত্র দিয়ে সেকেণ্ডে মাত্র এক মিটার বেগের পরিবর্তন তারার মধ্যে ঘটলে তাও উদ্ঘাটন করা যায়, সে রকম সংবেদনশীলতা শুধু ১৬০ আলোক বর্ষের কম দূরের তারার জন্য ঘটে। এর চেয়ে দূরের তারার গ্রহ আবিষ্কার অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়। তাছাড়া গ্রহ যদি তারার চারিদিকে অনেক বড় কক্ষপথে ঘুরে সে ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলো ঘটে বহু বছর পর পর– ধৈর্য ধরে এরকম পর্যবেক্ষণ চালানো কঠিন হয়। এই পদ্ধতিটি ভাল কাজ করে গ্রহের কক্ষপথের যে তল তা আমাদের দৃষ্টি রেখার সঙ্গে মিলে গেলে। এই তল যদি দৃষ্টিরেখার সঙ্গে কোণ তৈরি করে, তা হলে আমাদের দিকে এগিয়ে আসার বেগের হিসাবটা জটিল হয়। সে ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে গ্রহটির প্রকৃত ভর নির্ণয় করা যায়না, নির্ণয় করা যায় শুধু তার ন্যূনতম ভর। খুব বড় কোণ করলে গ্রহটি উদ্ঘাটনও কঠিন হয়ে পড়ে।

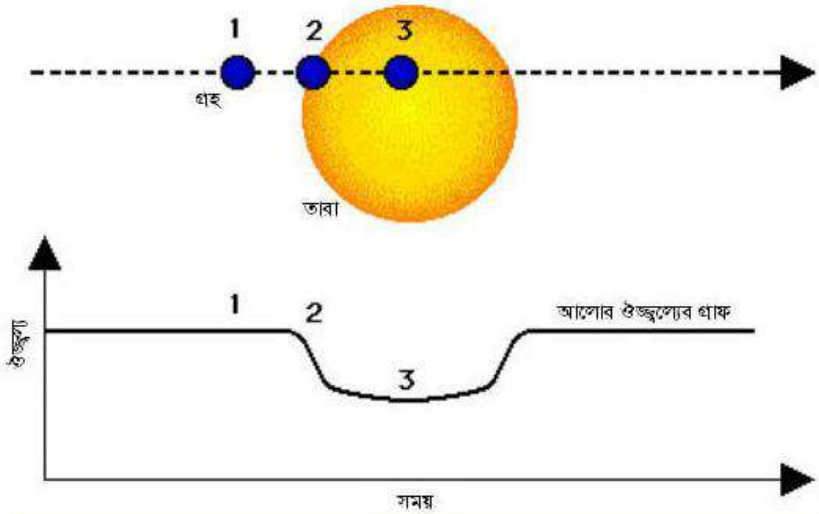

তারা পাড়ি দেয়া প্রক্রিয়ায় গ্রহ আবিষ্কারঃ গ্রহের বিভিন্ন অবস্থান 1,2,3 এ তারার ঔজ্জ্বল্য গ্রাফে দেখা যাচ্ছে। গ্রহ সামনে থাকার সময় তারার ঔজ্জ্বল্য কমে যায়। এটি দেখেই গ্রহের উপস্থিতি আবিষ্কৃত হয়।

আসলে আমাদের বেশি আগ্রহ বৃহস্পতির মত বড় গ্রহ আবিষ্কার নয়, কারণ সেগুলো প্রায়শই গ্যাসে তৈরি গ্রহ হয়ে থাকে। বসত করার উদ্দেশ্যে আমাদের অভীষ্ট গ্রহ হলো পৃথিবীর মত পাথুরে কঠিন গ্রহ– যেগুলো পৃথিবীর কাছাকাছি আকারের বা আরো ছোট হবার সম্ভাবনাই বেশি। তাছাড়া বসবাসের অনুকূল হতে হলে সেগুলো তারা থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা উচিত, তবে খুব বেশি দূরেও নয়। তারার হেলাদোলার পদ্ধতির মাধ্যমে আবিষ্কৃত গ্রহটির বেশ কিছু তথ্য ঐ আবিষ্কারের প্রক্রিয়াতেই যে আমরা জানতে পারি তা ইতোমধ্যে দেখেছি। গ্রহটির ভর বা অন্তত ন্যূনতম ভর, তারা থেকে এর দূরত্ব, এর পরিক্রমণকাল– এসব আমরা এর মাধ্যমে আন্দাজ করতে পারছি। কিন্তু বসত করার কথা ভাবতে গেলে আমাদের আরো অনেক কিছু জানা দরকার– যেমন ঐ গ্রহ পাথুরে কঠিন কিনা, এতে কী কী ধরনের বস্তু থাকতে পারে ইত্যাদি। এসব জানার উপায় সৃষ্টি হয়েছে আরো কয়েকটি পদ্ধতিতে এই গ্রহ উদ্ঘাটন করতে পারার মাধ্যমে। বিশেষ করে একাধিক পদ্ধতিতে মিলিত ভাবে একটি গ্রহ উদ্ঘাটন করা গেলে আরো অতিরিক্ত তথ্য পাওয়ার সুযোগ ঘটে যায়।

তারা পাড়ি দেয়া পদ্ধতিতে গ্রহ আবিষ্কার

পৃথিবীর কোন পর্যবেক্ষক যদি দেখতে পান যে দূরের কোন তারার ঔজ্জ্বল্য নিয়মিত ভাবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর কিছু সময়ের জন্য কমে যায়, কিন্তু বাকি সময়

স্বাভাবিক থাকে, তা হলে তার একটি ব্যাখ্যা হতে পারে নিম্নরূপ। পর্যক্ষেক যখন তারাটিকে থালার আকৃতিতে দেখেন, তখন এর একটি গ্রহ যদি পরিক্রমণ পথে ঐ থালাটিকে অতিক্রম করে, গ্রহটির ছায়া পড়ে তাঁর কাছে থালাটির ঔজ্জ্বল্য সাময়িকভাবে কিছু কমে যায়। গ্রহটি থালার এক কিনারা দিয়ে এর সামনে আসার সময় থেকে থালাটি পাড়ি দিয়ে অন্য কিনারা দিয়ে এর সামনে থেকে বের না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ঐরকম কম ঔজ্জ্বল্য বজায় থাকে। তারপর গ্রহটি যখন তার পরিক্রমণ পথে থালার পেছনে চলে যায়, এখন ঔজ্জ্বল্য আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়, এবং পুরো ঘুরে গ্রহটি আবার সামনে না আসা পর্যন্ত ঔজ্জ্বল্য ওরকম স্বাভাবিকই থাকে। কাজেই পর্যবেক্ষণে এমনটি দেখা গেলে আমরা মনে করতে পারি যে ঐ তারার একটি গ্রহ রয়েছে যার কারণে এমনটি ঘটছে। এই পদ্ধতিতেও বেশ কিছু গ্রহ সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত হয়েছে, আর পদ্ধতিটিকে বলা হয় তারা পাড়ি দেয়া পদ্ধতি (ট্রানজিট পদ্ধতি)। গ্রহটি তারা পাড়ি দেবার সময় তারার ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষাকৃত বেশি কমবে যদি তারার আপেক্ষিকে গ্রহটি বড় হয়। গ্রহটি যত ছোট আকারের হবে তারার ঔজ্জ্বল্য কমবে তত কম।

ঔজ্জ্বল্য কমার ঘটনার শুরুর মুহূর্ত, স্থিতির মহূর্ত, আবার পূর্বাবস্থায় আসার মুহূর্ত ইত্যাদি আরো সূক্ষ্ম ভাবে নির্ণয় করে নিম্নলিখিত উপায়ে গ্রহটির আকার সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। তারার ব্যাসার্দ্ধ যদি জানা থাকে তা হলে গ্রহটি তারার সামনে যখন সবে ঢুকতে শুরু করলো এবং পুরাপুরি ঢুকে গেল– ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্তনের লেখচিত্রে সেই সময়টুকু, তারপর ঔজ্জ্বল্য অপরিবর্তিত ভাবে ঐ কিছুটা কম কতক্ষণ রইলো, তারপর আবার গ্রহটি তারার থালার সামনে থেকে বের হয়ে যাবার সময় কত সময়ে ঔজ্জ্বল্য আবার পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গেল, এসব পরিমাপ থেকে গ্রহের আকার নিঁখুত ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। কত সময় পর পর এই ঔজ্জ্বল্য কমার ঘটনাটি ঘটছে তার থেকে এর পরিক্রমণকাল এবং কক্ষ পথের দৈর্ঘও জানা হয়ে যায়। যদি একই সঙ্গে তারার হেলাদোলা প্রক্রিয়ায়ও (বর্ণালীতে সরণ লক্ষ্য করে) গ্রহটি উদ্ঘাটন করা যায়, তা হলে শুধু যে উদ্ঘাটনটি অধিকতর নিশ্চিত হয় তাই নয়, গ্রহটির সম্পর্কে তথ্য জানাটিও আরো সম্পূর্ণ হয়। আমরা দেখেছি হেলাদোলা প্রক্রিয়ায় গ্রহটির ভর জানা যায়। এর সঙ্গে তারা পাড়ি দেয়া প্রক্রিয়ায় গ্রহের আকার জানতে পারার ফলে এর ঘনত্বটি এখন স্পষ্ট হয়ে পড়ে– যার থেকে বুঝা যায় এটি গ্যাসীয়, নাকি পাথুরে, নাকি অন্য কিছু। এভাবে বেশ কিছু তারার গ্রহ উভয় পদ্ধতিতে উদ্ঘাটন করা যাওয়াতে গ্রহটি অদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও এর সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে।

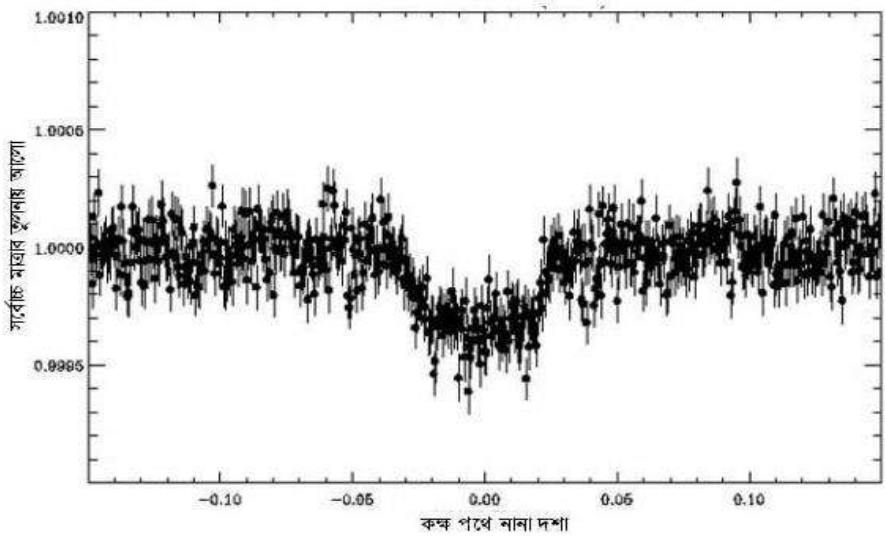

তারা পাড়ি দেয়া প্রক্রিয়ায় গ্রহ আবিষ্কারে তারা থেকে মানমন্দিরে মাপা আলোক সিগন্যাল। গ্রহ যতক্ষণ সামনে আলো ততক্ষণ কম। লক্ষ্য করলে দেখা যায় পরিবর্তনটুকু অতি সামান্য।

আরো চমকপ্রদ ব্যাপার হলো তারা পাড়ি দেয়া পদ্ধতিতে আবিষ্কৃত গ্রহের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কেও কিছু তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে ঐ পদ্ধতির মধ্য দিয়েই। তারার সামনে দিয়ে পাড়ি দেবার সময় তারার কিছু আলো ঐ গ্রহের বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে পৃথিবীর পর্যবেক্ষকের কাছে আসে। তাঁর বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র যদি খুব সংবেদী হয় তা হলে তারার সার্বিক বর্ণালীর মধ্যে এখন ঐ বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত গ্যাস ইত্যাদির ফলে সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলো ধরা পড়ে, এবং তাতে নানা গ্যাসের উপস্থিতি আন্দাজ করা যায়।

এ পদ্ধতিতে আবিষ্কৃত গ্রহটির উত্তাপ নির্ণয়েরও একটি চমকপ্রদ উপায় বের করা হয়েছে। গ্রহ যখন তারাটির পেছনে চলে যায়, তারা দ্বারা গ্রহটি ঢাকা পড়ার পূর্ব মুহূর্তে তারার বিকিরণের তীব্রতা থেকে ঢাকা পড়ার পরের মুহূর্তের তারার বিকিরণের তীব্রতা যদি বিয়োগ করি, তা হলে শুধু গ্রহটি থেকে বিকিরণের তীব্রতাটুকু পাওয়া যায়। এই বিকিরণ তীব্রতা থেকে গ্রহটির উত্তাপ অনুমান করা চলে, এমনকি তাতে মেঘের উপস্থিতিও আন্দাজ করা যায়।

তারা পাড়ি দেয়ার পদ্ধতিতে অধিকতর তথ্য এ ভাবে জানা সম্ভব হয় বটে, তবে পদ্ধতিটির ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে যে কারণে এর মাধ্যমে অল্প কিছু গ্রহই শুধু আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। গ্রহটির কক্ষপথের যে তল তা পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিরেখার সঙ্গে এক সমতলে থাকলেই শুধু এই পদ্ধতিটি সম্ভব হয়। এটি ঘটার সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ। অপেক্ষাকৃত ছোট কক্ষপথের গ্রহের ক্ষেত্রে এমনটি হবার সম্ভাবনা ১০% এর মত। অপেক্ষাকৃত ছোট তারার ক্ষেত্রেই এমন ছোট কক্ষপথ হওয়াটি স্বাভাবিক। আর সূর্যের সাইজের তারার ক্ষেত্রে ওভাবে সমতলে থাকার সম্ভাবনা ০.৪৭% এর বেশি নয়। তবে এমন তারার সংখ্যা প্রায় অসংখ্য বলে এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও

গ্রহ ও তারার মিলিত বর্ণালী থেকে শুধু তারার বর্ণালী বাদ দিয়ে গ্রহের বর্ণালী নির্ণয় সম্ভব। এ বর্ণালী থেকে জানা যায় দূর তারার গ্রহ কী দিয়ে গঠিত।

পদ্ধতিটি ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্ভাব্য সংখ্যার দিক থেকে নেহাৎ কম নয়। তবে বিশেষ কোন একটি তারার গ্রহ খুঁজতে গেলে তা যে এই পদ্ধতিতে করা যাবে সে সম্ভাবনাটি আসলেই কম। এ পদ্ধতির আর একটি অসুবিধা হলো তারার ঔজ্জ্বল্য আরো নানা কারণে নিয়মিত উঠানামা করে। এ জন্য অনেক সময় ভুল করে একে গ্রহের কারণে বলে মনে করা হতে পারে। এজন্য অন্য কোন পদ্ধতিতে গ্রহের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারাটি অনেক সময় জরুরী হয়ে পড়ে।

গ্রহ পাড়ি দেয়া পদ্ধতির মধ্যে কিছু কিছু ব্যত্যয় ঘটার মাধ্যমে আরো কিছুর আভাস পেতে পারি। যেমন কখনো কখনো দেখা যায় যে তারার ঔজ্জ্বল্য কমে যাওয়ার যে পুনরাবৃত্তি তা বার বার একই সময়ে ঘটছেনা, পুনরাবৃত্তির পিরিয়ডটি অল্প কিছু বদলে যাচ্ছে। এরকম হলে সন্দেহ করা হয় যে ঐ তারার আরো গ্রহ রয়েছে, যেগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট। অন্য গ্রহগুলোর জন্য আলাদা ভাবে ঔজ্জ্বল্য হ্রাস বুঝা যাচ্ছেনা বটে, তবে এদের উপস্থিতি ঐ পুনরাবৃত্তির পিরিয়ডটিকে এলোমেলো করে দিচ্ছে।

আবার যে সময়টুকুতে গ্রহ পাড়ি দেবার কারণে তারার ঔজ্জ্বল্য কম থাকে, তাতেও কিছু কমবেশি হতে দেখা যায়। এমন হলে মনে করার কারণ ঘটে যে ঐ গ্রহের সঙ্গে হয়তো নিজের উপগ্রহ রয়েছে। সঙ্গের উপগ্রহও তারা পাড়ি দেয় বলে কখনো কখনো পাড়ি দেয়ার সময়ে তারতম্য ঘটছে।

মাধ্যাকর্ষণ-লেন্সের দ্বারা গ্রহ আবিষ্কার

কাচের লেন্সের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আলোক রশ্মি বেঁকে গিয়ে আলোর উৎসটির একটি বিবর্ধিত অথবা ক্ষুদ্রায়িত ইমেজ তৈরি করতে পারে। আধুনিক পদার্থবিদ্যার নিয়মে ভারী বস্তুর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবেও আলোক রশ্মি একই ভাবে বেঁকে যেতে পারে। তাই তারার মত প্রকাণ্ড ভর অনেক সময় একরকম লেন্সের মত কাজ করে সুদূর আলোক উৎসের ইমেজ তৈরি করতে পারে। ধরা যাক দূর কোন তারা থেকে আলো আমাদের কাছে আসছে– এই তারাটিকে আমরা আলোর উৎস-তারা বলতে পারি। আরো ধরা যাক এই আসার পথে এই আলো অন্য একটি তারার পাশ দিয়ে আসছে। তা হলে দ্বিতীয় তারাটি আলোকে বাঁকিয়ে একটি মাধ্যাকর্ষণ জনিত লেন্সের মতো কাজ করবে– একে বলতে পারি লেন্স-তারা। এর ফলে উৎস-তারাটির ইমেজ পর্যবেক্ষকের কাছে কিছুটা পরিবর্তিত বা বিকৃত আকারে দেখা যাবে। ঐ লেন্স-তারাটির চারিদিকে যদি কোন গ্রহ পরিক্রমণ করে তা হলে গ্রহটির নিজের মাধ্যাকর্ষণটি যুক্ত হবার কারণে পরিক্রমণে তার অবস্থানের উপর নির্ভর করে ঐ ইমেজের মধ্যে সময় সময় কিছু পরিবর্তন দেখা দেবে। অতি সূক্ষ্ম এই পরিবর্তনটি যদি আমরা উদ্ঘাটন করতে পারি তা হলে তার সাহায্যেও লেন্স-তারাটির গ্রহের অস্তিত্ব উদ্ঘাটন করা সম্ভব। গ্রহ উদ্ঘাটনের এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় মাইক্রো-

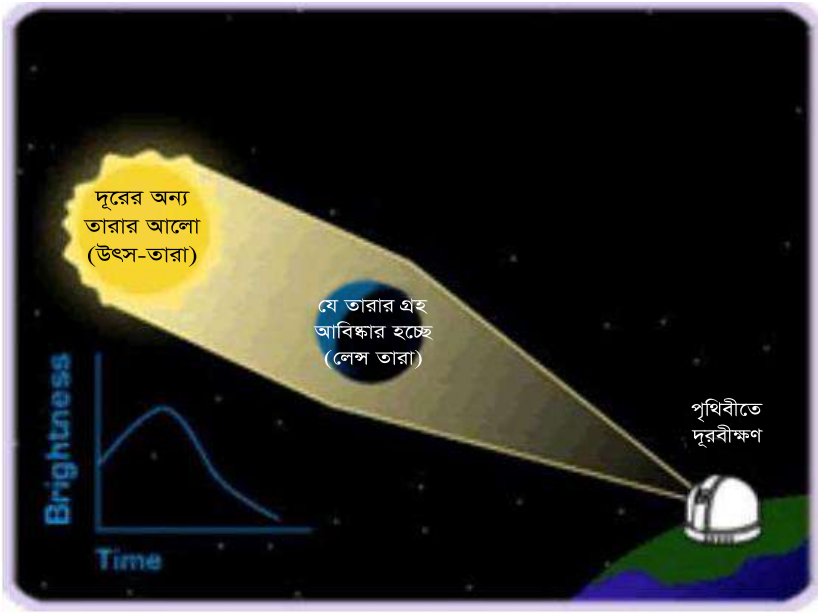

মাধ্যাকর্ষণের মাইক্রোলেন্সিং পদ্ধতিতে গ্রহ আবিষ্কারঃ কাছের তারটি মাধ্যাকর্ষণের লেন্সের মত দূর তারার আলো বাঁকিয়ে দূরবীক্ষণে ফোকাস করে। গ্রহ সামনে এলে এ ফোকাস বদলায়।

লেন্সিং পদ্ধতি।

মাইক্রো-লেন্সিং পদ্ধতিতে গ্রহ আবিষ্কারের সুবিধা হলো এতে শুধু একটি তারাকে নয়, বরং পুরো একটি গ্যালাক্সিকে বেশ উজ্জ্বল একটি উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অন্য পদ্ধতিতে, বিশেষ করে তারার হেলা-দোলা পদ্ধতিতে তারার খুব কাছের বড় ভারী গ্রহ না হলে উদ্ঘাটন করাটি কঠিন। মাইক্রো-লেন্সিং পদ্ধতিতে এটি তেমন বাধা হয়না। আসলে ২০০৬ সাল পর্যন্ত অন্য কোন পদ্ধতিতে পৃথিবীর মত কোন ছোট গ্রহ আদৌ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি– যদিও এখন তা সম্ভব হচ্ছে। জানুয়ারী ২০১১ পর্যন্ত মাইক্রো-লেন্সিং পদ্ধতিতে মোট ১১টি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে যার মধ্যে বেশ কিছু অপেক্ষাকৃত ছোট, সব চেয়ে ছোটটি পৃথিবীর মাত্র ১.৯ গুণ বড়।

এত কম সংখ্যক গ্রহ মাইক্রো-লেন্সিং পদ্ধতিতে আবিষ্কৃত হবার কারণ হলো এতে পর্যবেক্ষক, লেন্স-তারা এবং উৎস-তারা এই তিনকেই একেবারে হুবহু সরল রেখায় থাকতে হয়। এটি বিরল ব্যাপার। তাছাড়া এভাবে বেশি দিন এদের একই সরল রেখায় থাকা সম্ভবও নয়, কারণ ঐ দুই তারা আর পৃথিবীর পারস্পরিক আপেক্ষিক গতির কারণে কয়েকদিন পরেই হয়তো ঐ সরল রৈখিক অবস্থানটি আর বজায় থাকেনা।

দূর তারায় পৃথিবী-সদৃশ গ্রহ আবিষ্কার

এ পর্যন্ত দূর তারার বহু সংখ্যক গ্রহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরোক্ষভাবে আবিষ্কৃত হলেও এদের প্রায় সবই বৃহস্পতির মত বড় গ্যাসীয় গ্রহ, তবে তারার অনেক কাছে। গ্যাসীয় হওয়ায় ও তারার এত কাছে প্রাণের জন্য প্রতিকূল অঞ্চলে অবস্থিত বলে এসবে বর্তমানে কোন জীব থাকার, আর ভবিষ্যতে আমাদের বসত গড়ার, কোন সম্ভাবনা নেই। জোয়ার ভাটার টানে তারার সঙ্গে সুসংবদ্ধ থাকে বলে গ্রহের এক দিক সব সময় তারার দিকে মুখ করে থাকে, সেদিকটা ভয়ংকর রকম উত্তপ্ত। আর অন্য দিক যা সব সময় তারার থেকে উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে– সেদিকটি ভয়ংকর শীতল। কাজেই আগাগোড়াই প্রাণের একেবারেই প্রতিকূল পরিবেশ।

আমাদের আগ্রহ কিন্তু পৃথিবী-সদৃশ পাথুরে গ্রহের প্রতি, যেগুলো তারা থেকে এমন দূরত্বে থাকবে যে পৃথিবীর মতই মানুষ ও নানা জীবের জন্য উপযোগী হবে তার পরিবেশ। এত দিন উদ্ঘাটনের নানা পদ্ধতিতে আমাদের যন্ত্রপাতির সংবেদিতা যে পর্যায়ের ছিল তাতে ঐ বৃহস্পতির মতো বড় গ্রহগুলোই শুধু ধরা পড়তে পেরেছে, কিন্তু অতি সম্প্রতি সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

২০১০ সালের সেপ্টম্বরে হাওয়াইতে অবস্থিত শক্তিশালী কেক দূরবীক্ষনের সঙ্গে সংযুক্ত অতি সংবেদী বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে বর্ণালী অতি সূক্ষ্ম সরন মেপে এটির হেলাদোলার পরিমাপ থেকে গ্লিয়েস ৫৮১ নামক তারার ছয়টি গ্রহ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে একটি পৃথিবীর মতই বসবাসযোগ্য স্থানে ও পরিবেশে রয়েছে। এটি কঠিন বস্তুতে গড়া গ্রহ, এমন যথেষ্ট বড় ও ভারী যে বায়ুমণ্ডল ধরে রাখার মতই তার মাধ্যাকর্ষণ। ৩৭ দিনে একবার তারাকে প্রদক্ষিণ করে এটি। আগের ১১ বছরে মোট ১২২ বার তারাটির বর্ণালীর এদিক ওদিক সরন মেপে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া গেছে এই গ্রহ ও এসব তথ্য সম্পর্কে। গ্রহটি কঠিন বস্তুর হলেও সে বস্তু কি পাথুরে জিনিস না পানির জমাট বাঁধা বরফ তা অবশ্য বলা যাচ্ছে না এখনো। যদি পাথুরে হয় তা হলে এর ভর হবে পৃথিবীর ভরের ১.৩ থেকে ১.৫ গুণ। আর যদি বরফে গড়া হয় তা হলে ভর হবে পৃথিবীর ১.৭ থেকে ২.০ গুণ। তারার খুব বেশি কাছে না হলেও এটিও কিন্তু তারার সঙ্গে জোয়ার ভাটায় আবদ্ধ– অর্থাৎ একটি দিক সব সময় তারার দিকে মুখ করা। তাই এক দিক খুব উত্তপ্ত, অন্য দিক খুব শীতল । তবে দুই অংশের মাঝামাঝি জায়গা –১২° থেকে -৩১° সেলসিয়াসের মধ্যে বলে সেখানে বসবাস অসম্ভব হবেনা। অবশ্য এখানে বসবাসের জন্য কলোনি স্থাপন করতে চাইলে কিন্তু আমাদের যেতে হবে ২০.৫ আলোক বর্ষ দূরে, যেখানে আলো যেতেই লাগে ২০.৫ বছর।

পৃথিবী-সদৃশ গ্রহের আরো সাম্প্রতিক আবিষ্কার ঘটেছে ২০১১ সালের জানুয়ারী মাসে, এবার আরো দূরে পৃথিবী থেকে ৫৬০ আলোক বর্ষ দূরে। কেপলার ১০বি নামক এ গ্রহটি পৃথিবী থেকে ১.৪ গুণ বড় হলেও ৪.৬ গুণ ভারী। এটি যে পাথুরে বস্তুর তৈরি গ্রহ তা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারছি। এসব আমরা জানতে পারছি বেশ কিছু পরিমাপের সম্মিলিত ফলাফলের কারণে। তারা পাড়ি দেয়া পদ্ধতি থেকে এসেছে এর কিছু পরিমাপ। এক্ষেত্রে পাড়ি দেবার সময় তারাটির ঔজ্জ্বল্য কমে যায় মাত্র দশ হাজার ভাগের এক ভাগ। চিন্তা করুন কোন আলোকসজ্জায় ঘনসংবদ্ধ দশ হাজারটি বাতির মধ্যে একটি বাতি নিভে গেলে দূর থেকে আলোকসজ্জার ঔজ্জ্বল্য কতটা কমেছে তা উদ্ঘাটনের মত ব্যাপার এটি। এই পরিমাণ থেকেই অবশ্য এসেছে গ্রহের আকার ও কক্ষপথের দৈর্ঘের খবর। এই সঙ্গে হাওয়াই এর কেক মানমন্দিরে বর্ণালী বিশ্লেষণ থেকে তারার হেলাদোলা মেপে জানা গেছে গ্রহটির ভর। এসব থেকে গ্রহের ঘনত্ব ও তার থেকে এর বস্তুর প্রকৃতি আন্দাজ করা কঠিন হয়নি। কারণ এমন ঘনত্ব লোহার ঘনত্বের সমান হওয়াতে লোহা সমৃদ্ধ শিলায় এটি গঠিত হওয়াটি স্বাভাবিক। এসব দিক থেকে পৃথিবী-সদৃশ হলেও গ্রহটি কিন্তু আমাদের কলোনি করার মত হবেনা– পৃথিবী থেকে দূরত্বের কথা যদি বাদও দিই। জোয়ার

ভাটার কারণে তারার দিকে একই দিক ফেরানো থাকে বলে সেখানকার উত্তাপ ১,৩৭০° সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায়। এমন উত্তাপের কারণে এ গ্রহে কোন বায়ুমণ্ডল থাকাও সম্ভব নয়, কারণ সব গ্যাস বহু আগেই উবে গিয়েছে। তবে বিজ্ঞানীরা আশা ছাড়ছেন না, সৌর জগতের বাইরে আমাদের থেকে অপেক্ষাকৃত কম দূরত্বেই হয়তো পাওয়া যাবে সত্যিই বাসযোগ্য আরো অনেক গ্রহ। এইতো সবে পৃথিবী-সদৃশ গ্রহের আবিষ্কার শুরু হয়েছে মাত্র।

এরকম গ্রহের সংখ্যা কী রকম হতে পারে সেটি বুঝার জন্য ২০০৯ সাল থেকে সিগন্যাস তারামণ্ডলীর অঞ্চলে একটি জরিপ চালিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র মহাশূন্য সংস্থা নাসার কেপলার মিশন। এতে মহাশূন্যযান থেকে তারা পাড়ি দেয়া পদ্ধতিতে একে একে হাজার হাজার তারার উপর সূশৃঙ্খলভাবে পরিমাপ চালানো হচ্ছে। এর মাধ্যমে পৃথিবীর সমান এবং তার চেয়েও ছোট গ্রহের উদ্ঘাটন সম্ভব। এর উদ্দেশ্য হলো এখানকার সূর্য সাইজের তারাগুলোতে পৃথিবী-সদৃশ তারার একটি পরিসংখ্যান পাওয়া।

এখানকার যে সব গ্রহের ক্ষেত্রে তারা পাড়ি দেয়া পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব নয় তাদের জন্য অন্য একটি পদ্ধতি খুবই সাম্প্রতিক কালে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে তারার কাছাকাছি গ্রহে চন্দ্রকলার মত এক রকম কলা সরু আলো থেকে পূর্ণ আলো পর্যন্ত ক্রমে বিস্তৃত হয়। এর ফলে তারার সম্পূর্ণ ঔজ্জ্বল্যেও খুব সামান্য এক রকম পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন দেখা যায়। এটি দেখে গ্রহটি উদ্ঘাটিত হচ্ছে। তারা থেকে প্রতিফলিত আলো ছাড়াও গ্রহের নিজস্ব কিছু সামান্য আলো থাকে, তার থেকে বিকিরণের কারণে। তাই চন্দ্রকলার মত ঐ পর্যায়ক্রমিক হ্রাসবৃদ্ধির সূক্ষ্ম লেখচিত্র বিশ্লেষণ করলে তাতে গ্রহের নিজস্ব আলোর অবদানটিও ধরা পড়ে যার থেকে তার বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় উপাদান সম্পর্কেও কিছু অনুমান করা যায়। তারা পাড়ি দেয়ার পদ্ধতিটি যে অধিকাংশ তারার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়না সেসব তারার ক্ষেত্রে এই সাম্প্রতিকতম পদ্ধতিটিতে জরিপে অনেক গ্রহ আবিষ্কৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এগুলোর অনেকগুলোই হবে পৃথিবী-সদৃশ, এবং হতে পারে আমাদের দূর-অভিবাসনের উপযুক্ত লক্ষ্যস্থল।

যদিও গ্রহগুলো আমাদের কাছে অদৃশ্য, তবুও ঐ পরোক্ষ আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই এদের সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য যে নানা কৌশলে আমরা জানতে পারছি, তা ইতোমধ্যে দেখেছি। এদের মধ্যে স্বল্প ঘনত্বের বড় গ্রহগুলো প্রায় সর্বাংশে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসে গড়া বনে মনে হচ্ছে। অন্য দিকে অপেক্ষাকৃত ছোট অধিক ঘনত্বের পৃথিবী-সদৃশ গ্রহগুলো নানা রকম শিলা ও আকরিকে তৈরি। এদের অনেকগুলোতে জলীয় বাষ্প, মিথেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, সোডিয়াম বাষ্প সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডলের

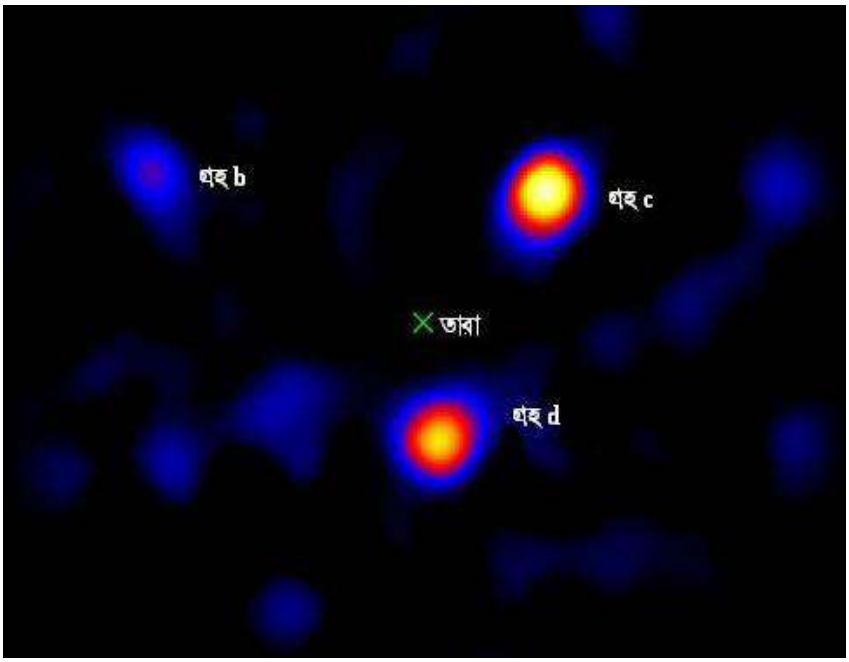

HR 8799 তারার তিনটি গ্রহ b,c, ও d ঃ
এগুলো দূর-তারার সরাসরি দেখা গ্রহের উদাহরণ

আন্দাজ পাওয়া গেছে। তারার আলোর বিক্ষেপ (স্ক্যাটারিং) লক্ষ্য করে গ্রহের বাতাসে ধূলিকণার অস্তিত্ব এমন কি সেই কণার গড়পড়তা আকারও নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। ধূলিকণার আকার যত ছোট হয়, আলোর বিক্ষিপ্ত হবার পরিমাণও তত বেড়ে যায়। এত সাফল্যের মধ্যেও একটি সীমাবদ্ধতা এখন পর্যন্ত রয়ে গেছে, তা হলো আবিষ্কৃত গ্রহগুলোর কোন উপগ্রহের উদ্ঘাটন বা সেগুলো সম্পর্কে কিছু জানা এখনো নিশ্চিতভাবে সম্ভব হয়নি। উপগ্রহ সম্পর্কে জানা আমাদের প্রয়োজন এজন্য যে, সৌর জগতের সমীক্ষা থেকে আমরা বুঝেছি অনেক ক্ষেত্রে গ্রহের চেয়ে উপগ্রহগুলোই জীবের অস্তিত্বের জন্য বেশি অনুকূল, আমাদের বসত স্থাপনের জন্যও।

দূর তারার গ্রহগুলো সরাসরি দেখা যাবেনা, এ কথাটাকেও এখন সর্বাধুনিক গবেষণা ভুল প্রমাণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। যদিও গ্রহের অতি সামান্য আলো এর অতি কাছে থাকা নিজের তারাটির প্রচণ্ড আলোর বন্যায় হারিয়ে যাওয়াটি একে আমাদের কাছ থেকে অদৃশ্য রাখে, তবুও এখন ব্যতিক্রম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। তারা থেকে অনেক দূর দিয়ে একে পরিক্রমণ করছে এমন প্রকাণ্ড অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তপ্ত গ্রহ থেকে ইনফ্রো-রেড আলো আমাদের কাছে পৌঁছার দু'একটি উদাহরণ সম্প্রতি দেখা গেছে। ২০০৭ সালে হাওয়াইর কেক দূরবীক্ষণে এইচ আর ৮৭৯৯ নামক তারার তিনটি গ্রহ এভাবে দেখা গেছে। গ্রহ তিনটির ভর সৌর জগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির চেয়ে যথাক্রমে ১০,১০ ও ৭ গুণ বেশি। স্পষ্টত প্রকাণ্ড হবার কারণেই

এদের উত্তাপের সৃষ্ট ইনফ্রো-রেড রশ্মি আমাদের দৃষ্টি গোচর হতে পেরেছে। একই সময় হাবল স্পেস টেলিস্কোপও এরকম একটি প্রকাণ্ড গ্রহ সরাসরি ইমেজে ধারন করতে পেরেছে। আশা করা যায় যে দূরবীক্ষণের ইমেজিং ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটলে নিত্য যে সব অনেক গ্রহ উদ্ঘাটিত হচ্ছে, ভবিষ্যতে সেগুলোও সরাসরি দেখা যাবে, এদের থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হবে।

তারার জগতে পাড়ি দেবার বাহন

দূরত্বের সমস্যা

সৌর জগতের মধ্যে যদি আমরা আমাদের অভিবাসন চিন্তা সীমাবদ্ধ রাখি তা হলে পছন্দ করার মত জায়গা খুব বেশি নেই। কিন্তু দূর তারার জগতে বিচিত্র নানা রকম গ্রহ আবিষ্কারের পর থেকে এটি স্পষ্ট হচ্ছে যে আমাদের বসত গড়ার জন্য সব চেয়ে অনুকূল জায়গাগুলো হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে সৌর জগতের বাইরে অন্য তারার গ্রহ-উপগ্রহে। সংখ্যা যেহেতু তার অনেক, বৈচিত্রের সুযোগও অনেক। তাই বেছে নেবার মত বিকল্প যে ওখানে অনেক বেশি পাওয়া যাবে সে কথা বলাই বাহুল্য। এমনো হতে পারে প্রায় হুবহু পৃথিবীর মত গ্রহই সেখানে পাওয়া যাবে, যেখানে বসত করাটি আমাদের জন্য অত্যন্ত সহজ হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে একটি সমস্যাই প্রকট হয়ে উঠে, সেখানে যাবার সমস্যা।

আমাদের সৌর জগতের সব চেয়ে কাছের তারাগুলোর দূরত্বই কয়েক আলোক বর্ষ। গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে এমন তারাগুলোর দূরত্ব বেশ কিছু আলোক বর্ষ। বৈচিত্রের সুযোগ নিতে গেলে আমাদেরকে অন্তত এমন দূরত্বেই পাড়ি দিতে হবে যেখান থেকে আলো আসতেই এতগুলো বছর লেগে যাচ্ছে। যদি আলোর গতিতেও যেতে পারি তা হলেও ওখানে পৌঁছতে বহু বছর লেগে যাবে, অনেক ক্ষেত্রে পুরো জীবন কাল বা তারো অনেক বেশি। কল্পনার খাতিরেও আমরা আপাতত শুধু অপেক্ষাকৃত কাছের তারার জগতগুলোর কথাই চিন্তার মধ্যে আনতে পারি। আলোর গতিতে কোন কিছু যাওয়া পদার্থবিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী অসম্ভব। আলোর খুব কাছাকাছি গতিতে যাওয়াও বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিবেচনায় সম্ভব হচ্ছেনা। তবে বর্তমানে মহাশূন্য যাত্রায় যে রকম গতি আমরা অর্জন করেছি, তা অনেক গুণে বাড়াবার কথা আমরা ভাবতেই পারি। শুধু ভাবাই নয়, এ নিয়ে গবেষণাও চল্‌ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গবেষণা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এই গতিবেগ প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে তাকে যদি আমরা আলোর গতির কিছুটা কাছেও নিয়ে যেতে পারি, তাহলে হয়তো অন্তত অপেক্ষাকৃত কাছের তারার জগতগুলো আমাদের অগম্য থাকবেনা। তবে একথা বুঝতে হবে যে সৌর জগতের মধ্যে বসতি স্থাপন যেমন আমাদের জন্য আগামী কিছু দশকের পরিকল্পনায় চলে আসতে পারে, এক্ষেত্রে তেমন হবার সুযোগ নাই। এটি হবে আমাদের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ও গবেষণার অন্তর্ভূক্ত, যার

বাস্তবায়ন হয়তো এখনো শত বর্ষ দূরে রয়ে গেছে। কিন্তু এর প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো এখনই নিতে হচ্ছে।

সমস্যাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য স্মরণ করা যাক যে এ পর্যন্ত আমাদের সব চেয়ে দ্রুতগতির যে মহাশূন্যযান বহির্বিশ্বে গিয়েছে তা হলো ভয়েজার-১। এর গতি আলোর গতির ১৮ হাজার ভাগের এক ভাগ। এই গতিতে আমাদের সব চাইতে নিকটবর্তী তারা প্রক্সিমা সেন্টাউরিতে যেতেই লেগে যাবে ৭২ হাজার বছর। কাজেই স্পষ্টত গতিবেগ আরো অনেক বাড়াতে হবে, তার জন্য ব্যবহৃত মহাশূন্যযানের শক্তি বাড়াতে হবে বহু গুণে।

মজার ব্যাপার হলো এরকম অতি উচ্চ শক্তি এ যানবাহনের লাগবে শুধু তারার দেশে পৌঁছার জন্য নয়। ওখানে অভীষ্ট গ্রহ বা উপগ্রহে পৌঁছার পর সেখানে এই যানবাহনকে থামাতে হবে। ঐ উচ্চ বেগে চলমান একটি যানবাহনকে থামাবার জন্যও প্রয়োজন হবে প্রচণ্ড রকমের শক্তি। সেই দিকটিও মনে রাখতে হচ্ছে।

উচ্চ গতির জন্য বিকল্প রকেট

আমাদের মহাশূন্য অভিযানের এ পর্যন্ত সাফল্যের মূলে রয়েছে রকেট বিজ্ঞানের অগ্রগতি। মহাশূন্যে চলাচলের জন্য রকেটই এখন আমাদের একমাত্র যানবাহন। প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে, পদার্থবিদ্যার এই মৌলিক নিয়মকেই ব্যবহার করা হয় এর চালনায়। জ্বালানি পুড়ে উচ্চ চাপের যে গ্যাস সৃষ্টি হয় তা একটি উপযুক্ত নির্গমন মুখ দিয়ে পেছনে সজোরে নির্গত হতে দিলে এরই প্রতিক্রিয়ায় যেখান থেকে নির্গত হচ্ছে তা দ্রুতবেগে সামনে এগিয়ে যায়। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে বিমানের জেট ইঞ্জিনে একই নিয়ম অনুসৃত হলেও সে ক্ষেত্রে শুধু জ্বালানি থাকলেই হয়, একে পোড়ার জন্য অক্সিজেন বাতাস থেকেই টেনে নেয়া যায়। কিন্তু মহাশূন্যে রকেট ইঞ্জিনের জন্য জ্বালানি ও অক্সিজেন উভয়েই বহন করতে হয়। এ পর্যন্ত আমাদের সব রকেটই রাসায়নিক জ্বালানির উপর নির্ভরশীল। হাজার বছর আগে চীনে যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত রকেট যেমন ছিল, তেমনি আজকের আধুনিকতম যে রকেট আমাদের মহাশূন্যযানগুলোকে উৎক্ষেপন করে দূর-দূরান্তে নিয়ে যাচ্ছে, সবেরই ভিত্তি এই রাসায়নিক রকেট।

রকেটের গতিবেগ কত হবে তা নির্ভর করছে রকেট সমীকরণের উপর। খুব সাদামাটা ভাবে বলতে গেলে সমীকরণের একদিকে থাকবে মহাশূন্যযানটির ভর ও তার বেগের গুণফল এবং অন্যদিকে পেছনের দিক দিয়ে বেরিয়ে আসা গ্যাসের (বা কঠিন, তরল যে কোন কিছু হতে পারে) ভর ও বেগের গুণফল। কাজেই মহাশূন্যযানের বেগ বাড়াতে হলে জ্বালানি পোড়ার হার বাড়িয়ে পশ্চাদগামী গ্যাসের

ভর ও বেগ বাড়াতে হবে। ওদিকে আবার অধিক হারে পুড়তে হলে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি বহন করতে হবে বলে, মহাশূন্যযানের ভর বেড়ে গিয়ে তার গতিকে কমিয়ে ফেলবে। তাই বর্তমান রকেটের বড় সমস্যা হলো রাসায়নিক জ্বালানি পোড়ার হার এমন দক্ষ ভাবে বাড়ানো যাতে সেজন্য খুব অতিরিক্ত জ্বালানি বহন না করতে হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপর নির্ভর করলে এতে একটি উচ্চতম বেগের সীমা এসে পড়ে। এজন্য আগামী দিনের উচ্চ বেগের রকেটগুলোর কথা চিন্তা করা হচ্ছে নিউক্লিয়ার শক্তির উপর নির্ভর করে। জ্বালানির ভরের কথা চিন্তা করলে একই ভরের নিউক্লিয়ার জ্বালানি রাসায়নিক জ্বালানির চেয়ে প্রায় কোটি গুণ বেশি হারে শক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম। দক্ষভাবে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়াকে যদি রকেট ইঞ্জিন চালনায় ব্যবহার করা যায় তা হলে সৌর জগৎ ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য আমরা যা চাচ্ছি সেই লক্ষ্যে অনেকগুণে বেশি বেগের রকেট উদ্ভাবন সম্ভব হতে পারে।

নিউক্লিয়ার রকেটের পরিকল্পনা, ডিজাইন এবং এ নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা ইতোমধ্যেই এগিয়ে যাচ্ছে। মূলত এতে থাকবে একটি নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর যা শক্তি উৎপাদন করবে। এ ছাড়া পেছনে ছুঁড়ে দেবার মত গ্যাসীয় বস্তুও এই রকেট বহন করবে। মূল কৌশলটি হবে নিউক্লিয়ার শক্তির সাহায্যে সৃষ্ট তীব্র বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে গ্যাস পরমাণুকে ধনাত্মক ও ঋণাত্বক আয়নে বিভক্ত করে ফেলা ও প্লাজমা অবস্থার সৃষ্টি করা। এই প্লাজমা হলো আয়ন কণাগুলোতে গড়া গ্যাস। বৈদ্যুতিক চার্জ থাকার কারণে উচ্চ মাত্রার স্থির বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র অথবা চলমান বৈদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা এই আয়নগ্যাসকে সজোরে রকেটের পেছন থেকে উদ্‌গীরণ করা সম্ভব।

ব্যাপারটি অনেকটা একটি আয়ন বন্দুকের মত– স্থির বৈদ্যুতিক শক্তির তীব্রতা বাড়িয়ে এভাবে পেছনে ছুঁড়ে দেয়া আয়নগ্যাসের বেগ যে কোন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব, যা শুধু আলোর গতিবেগের দ্বারাই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি সমস্যা দেখা দেয়। পেছনে ছুঁড়ে দেবার এই গতি বাড়াতে হলে প্রয়োজনীয় শক্তি বাড়াতে হবে তার বর্গের সমানুপাতে। যেমন ঐ গতি দ্বিগুণ করার জন্য শক্তিকে চারগুণ করতে হবে, সেই সঙ্গে জ্বালানিকেও। কিন্তু মহাশূন্যযানটির গতি বাড়বে পেছনে ছুঁড়ে দেবার গতির সমানুপাতে। ফলে ঐ পেছনে ছোঁড়ার গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাশূন্যযানের সম্মুখ গতি ও ওজনের অনুপাতটি সরল রৈখিক ভাবে কমতে থাকবে। এর অর্থ হলো পেছনে ছোঁড়ার গতি একটি ঊর্ধ্বসীমায় পৌঁছার পর তাকে আর বাড়াবার কোন অর্থ হবেনা, কারণ এর জন্য মহাশূন্যযানের ওজন এত বাড়াতে হবে যে মহাশূন্যযানের নিজের গতি আর বাড়বেনা, বরং কমতে থাকবে। কাজেই এই উচ্চতম গতি লাভের পর পেছনে ছোঁড়ার গতি বাড়াবার আর চেষ্টা নিরর্থক। তখন বরং নিউক্লিয়ার শক্তি থেকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কেমন করে আরো দক্ষভাবে

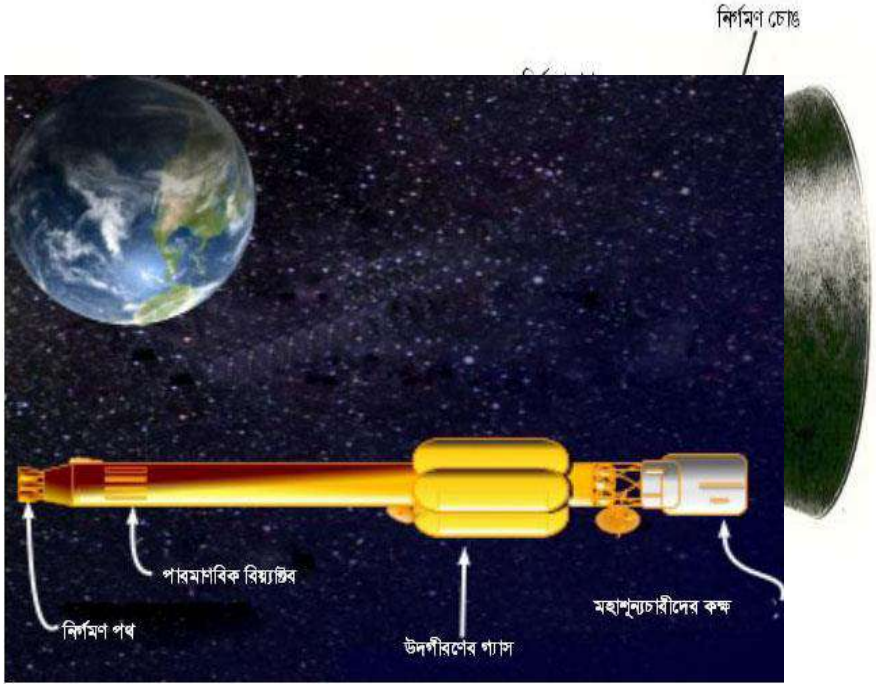

ভবিষ্যতের পারমাণবিক রকেট

তৈরি করা যায় এবং রিয়্যাক্টর, জ্বালানি সবকিছু যথাসম্ভব কত হালকা ওজনের করা যায় সে চেষ্টাই করা উচিত হবে।

ফিশন রিয়্যাক্টরে পরমাণুকে ভেঙ্গে নিউক্লিয়ার শক্তি তৈরি করা হয়। পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভগ্নাংশগুলোর গতিকে যদি ঐ পেছনে ছোঁড়ার গ্যাসের মধ্যে তারই ঘর্ষণে থামানোর ব্যবস্থা হয়, তাহলে গ্যাসটি অতি উচ্চ উত্তাপে তোলা যায়। এই গ্যাসকে সুকৌশলে ব্যবহার করে এবং নিউক্লিয়ার জ্বালানিকে বিশেষ পাতলা আকৃতি দিয়ে নিউক্লিয়ার শক্তি থেকে ৪০% পর্যন্ত বেশি তাপ বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া সম্ভব।

পৃথিবীতে ব্যবহারের জন্য এখনো আমরা নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়ার উপরেই নির্ভর করছি। কিন্তু ফিউশন রিয়্যাক্টরও হয়তো খুব বেশি দূরে নয়, যাতে হালকা পরমাণু নিউক্লিয়াসের একত্র হবার মাধ্যমেই শক্তি নির্গত হয় (হাইড্রোজেন বোমায়, বা তারার মধ্যেকার শক্তি যোগানে যে প্রক্রিয়া আমরা দেখি)। সেটি সম্ভব হলে নিউক্লিয়ার রকেটেও ফিউশন বিক্রিয়া সম্ভব হবে। এতে শক্তি উৎপাদন বেশি এবং জ্বালানি খুব হালকা বলে রকেটের উচ্চতম গতি আলোর গতির আরো নিকটবর্তি হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তবে সব রকম নিউক্লিয়ার রকেটেই কারিগরি চ্যালেঞ্জগুলো

এখনো বিশাল, আর ফিউশন রিয়্যাক্টর জিনিসটিই তো এখনো আমরা বাস্তবায়ন করতে পারিনি।

নিউক্লিয়ার পাল্‌স রকেট

বর্তমানে যে ক্যামিকাল জ্বালানির রকেট মহাশূন্য ভ্রমণে ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে দ্রুত অনেক জ্বালানি পোড়ার মাধ্যমে পশ্চাদগামী প্রচুর বেগের সৃষ্টি করা যায় বটে, কিন্তু তার জন্য জ্বালানির ওজনের খেসারত দিতে হয় অনেক বেশি। ফলে শেষ পর্যন্ত ওজনের সমস্যার কারণে মহাশূন্যযানের গতি আজকের সীমিত অবস্থায় থেকে যায়। অন্যদিকে পরিকল্পিত নিউক্লিয়ার রকেটে জ্বালানি ওজনের সমস্যা কম হবে। এতে খুবই সামান্য জ্বালানি ব্যয় করে পরিমিত পশ্চাদ্‌মুখী বেগের দ্বারাই রকেটে তীব্র বেগ সৃষ্টি করা যাবে বটে কিন্তু তাতেও সমস্যা রয়েছে এখানে পেছনে ছুঁড়ে দেয়ার যে গ্যাস ব্যবহার করতে হবে তার ওজনটিই এক পর্যায়ে মহাশূন্যযানের শক্তিতে একটি ঊর্ধ্ব সীমা এনে দেবে। এই অবস্থার একটি সমাধানের জন্য পরিকল্পিত হয়েছে নূতন এক কৌশলের– যাকে বলা হয় নিউক্লিয়ার পাল্‌স রকেট।

একে পাল্‌স রকেট বলার কারণ হলো সচরাচর রকেটের মতো এর থেকে এক টানা পশ্চাদমুখী গ্যাস নির্গত হবেনা, বরং ঘটনাটি ঘটবে পর পর বিচ্ছিন্ন কিছু বিস্ফোরণের আকারে। এতে অল্প কিছু সময় পর পর এক একটি ছোট নিউক্লিয়ার বোমা রকেটের পেছনে শ' খানেক ফুট দূরে বিস্ফোরণের ব্যবস্থা করা হবে। বোমার সঙ্গেই থাকবে এর ফলে বাষ্পীভূত হয়ে প্রচণ্ড শক্তি লাভ করার মত কঠিন বস্তু– খুব সম্ভব প্লাষ্টিক জাতীয়। প্লাষ্টিক হবার সুবিধা হলো এতে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় সৃষ্ট পরমাণু ভগ্নাংশগুলো ভাল ভাবে শোষিত হয়ে এর হালকা গ্যাসগুলোতে অধিক শক্তি দিতে পারবে। মজার ব্যাপার হলো এই কঠিন বস্তুর বেশ কিছুটা মহাশূন্যযানকে আলাদা ভাবে এই জন্য বহন করতে হবেনা, দীর্ঘ ভ্রমণ কালে এতে যে পরিমাণ বর্জ্য, পলিথিনের মত প্যাকেজিং ও বসবাস জনিত বর্জ্য, মানব-বর্জ্য ইত্যাদি তৈরি হবে– তাও তাতে যোগ করা যাবে।

নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরণে এসব গ্যাসের শক্তি চারিদিকে ছড়ালেও তার একটি অংশ সরাসরি রকেটকে ধাক্কা দিয়ে সামনের দিকে তার বেগ বাড়াবে। অবশ্য সরাসরি এভাবে ধাক্কা দিলে ত্বরণ অত্যন্ত তীব্র হবে বলে তা মহাশূন্যযানের মানুষ আরোহীর জন্য সহ্য করার মত হবেনা। তাই বিস্ফোরণের ধাক্কাটি তাৎক্ষণিক ভাবে শোষণ করে নেবার জন্য রকেটের পেছনে থাকবে একটি শক্-এবজর্বার প্লেইট। সংযুক্ত দণ্ড ও পিষ্টনের সাহায্যে এই প্লেইট তাৎক্ষণিক ধাক্কাটি সামাল দেবে রকেটের নিজের উপরে এটি আসতে না দিয়ে। তারপর এই ধাক্কার ফলে প্লেইটে যে

সংকোচন ঘটছে সেটি কিছুটা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করে এবার সেই শক্তিটি রকেটের বেগ বাড়াতে কাজে লাগবে। এভাবে ত্বরণটি এক সঙ্গে হঠাৎ না হয়ে তাকে কিছুটা ধীরে ধীরে ঘটিয়ে সহ্য ক্ষমতার মধ্যে রাখা হবে।

সাধারণ নিউক্লিয়ার রকেটের তুলনায় এর বড় সুবিধাটি হবে এতে বেগের ঐ ঊর্ধ্বসীমাটি আসবেনা, যা গ্যাসের ওজনের খেসারত দিতে গিয়ে সৃষ্টি হয়। বরং এতে একদিকে যেমন পশ্চাদমুখী বেগ বাড়ানো যাবে একই সঙ্গে রকেটের গতিও ক্রমাগত বাড়ানো যাবে। উচ্চতর ত্বরণ পাওয়ার জন্য বাষ্পীভূত হবার বস্তুর ওজন যত বাড়ানো হবে ধাক্কার শক্তিও তত বাড়বে। ভেতরে দহন করে বাইরে ছুঁড়ে দেবার বদলে, বাইরে বিস্ফোরণ ঘটানোতে এই সুবিধাটি রয়েছে নিউক্লিয়ার পাল্‌স রকেটের।

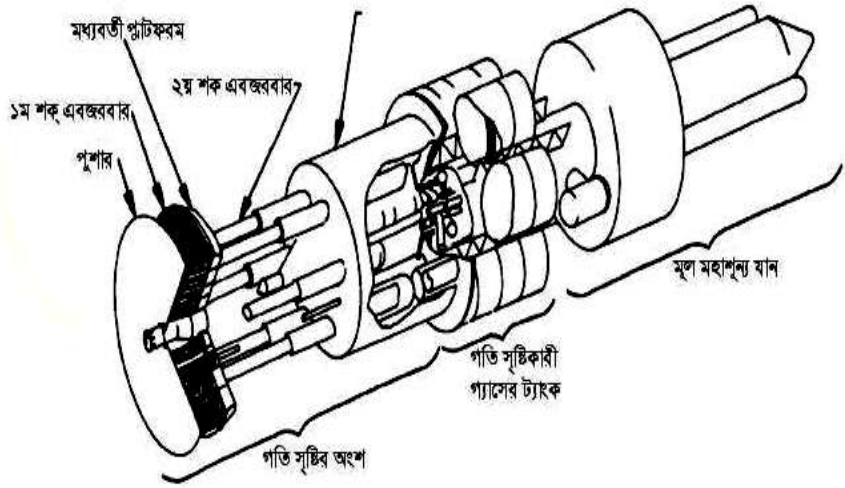

পারমাণবিক পাল্‌স রকেট

রকেটের এই কৌশলটির পরিকল্পনাটি যে নেহাৎ কাগজে কলমে রয়েছে তা নয়। এই আইডিয়াটির উপর ভিত্তি করে প্রজেক্ট ওরিয়োন নামে বেশ কিছু পরীক্ষা নিরিক্ষাও চলেছে– যাতে সীমিত সাফল্যও এসেছে। অবশ্য সাধারণ নিউক্লিয়ার রকেটের তুলনায় এক্ষেত্রে কারিগরি সমস্যাগুলো আরো প্রকট, কারণ অতি নিকটে পর পর অনেকগুলো নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরণের ধাক্কা সামলিয়ে একে চলতে হবে। এর ফলে বিশেষ করে ধাক্কা সামলাবার শক্ এবজরবার প্লেইটটির যে অবক্ষয় হতে পারে তা বলাই বাহুল্য। নিউক্লিয়ার বোমার ভস্ম ও তেজস্ক্রিয়া থেকে মহাশূন্যযানকে ও এর আরোহীদেরকে বাঁচানোও একটি বড় সমস্যা। তাছাড়া পৃথিবী

থেকে উৎক্ষেপনের জন্য এরকম রকেট ব্যবহার করা বেশ বিপজ্জনক হবে। নিউক্লিয়ার বোমার তেজস্ক্রিয় ভস্ম পৃথিবীতে ছড়ানো মোটেই গ্রহণযোগ্য হবেনা। সেক্ষেত্রে অবশ্য আন্টার্কটিকের মত জন-প্রাণিহীন অঞ্চলে উৎক্ষেপন কেন্দ্র স্থাপনের কথা চিন্তা করা যেতে পারে।

শক্তি-উৎস যখন মহাশূন্যযানের বাইরে

এ পর্যন্ত আমরা যে সব মহাশূন্যযান ব্যবহার করেছি, এবং এখানে নূতন যে ধরনের উচ্চ গতির মহাশূন্যযান পরিকল্পনার কথা বলেছি, তার সব ক'টাতেই এর চালিকা শক্তির উৎস মহাশূন্যযান নিজেকেই বহন করতে হয়। যেমন রাসায়নিক রকেটের জন্য জ্বালানি ও অক্সিজেন, নিউক্লিয়ার রকেটের জন্য নিউক্লিয়ার জ্বালানি, পেছনে ছুঁড়ে দেয়ার মত গ্যাস বা কঠিন পদার্থ ইত্যাদি। এই বহন করতে হওয়ার মধ্যেই রয়েছে তার কম বেশি সীমাবদ্ধতা, গতি বাড়াবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তার ওজন বাড়ার বিষয়টি এর ফলে এসে পড়ে।

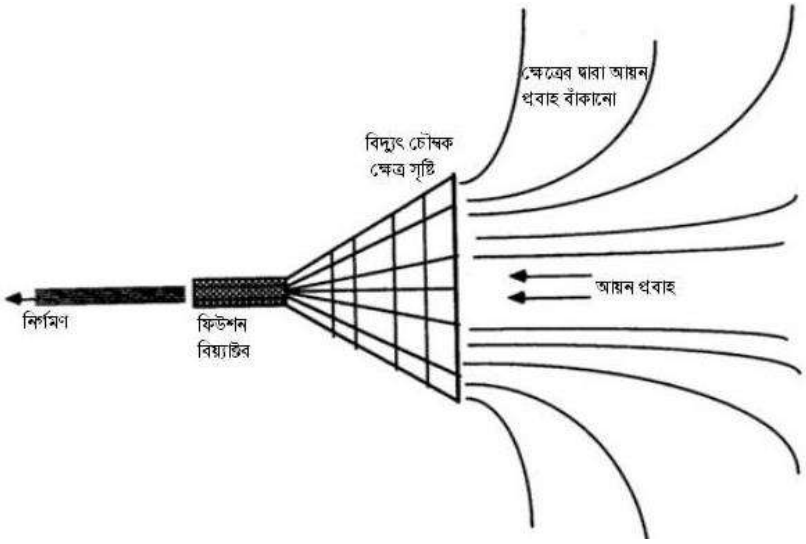

ফিউশন র‍্যাম জেটঃ আন্ড়তারা যাতায়াতের একটি উপায়ঃ
বিদ্যুৎ চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে মহাশূন্যের আয়ন প্রবাহ সংগ্রহ করে তাকে ফিউশন রিয়্যাক্টরের শক্তিতে শক্তিমান অবস্থায় সজোরে নির্গত করা হয়।

এই সমস্যাটি থাকেনা যদি মহাশূন্যযানের বাইরে থেকে কোন কিছুকে চালিকা শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এর একটি উদাহরণ হলো পরিকল্পিত ফিউশন র‍্যাম জেট। এটি অনেকটাই বিমানের র‍্যাম জেট ইঞ্জিনের অনুরূপ, এবং

মূলত রকেট নীতির উপরই নির্ভরশীল। এতে শক্তিটি আসবে মহাশূন্যযানের মধ্যে নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া ঘটিয়ে, যাতে জ্বালানি হিসেবে প্রয়োজন হবে হাইড্রোজেন। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমটি হবে মহাশূন্যযান নিজে এই হাইড্রোজেন বহন করবেনা, বরং চলতে চলতে মহাশূন্য থেকেই তা সংগ্রহ করবে। মহাশূন্যকে আমরা ঐ নাম দিলেও এটি একেবারে শূন্যস্থান নয়, বরং সর্বত্র এখানে রয়েছে খুব পাতলা অবস্থায় ছড়ানো হাইড্রোজেন গ্যাস। ফিউশন র‍্যাম জেটে এই নগণ্য হাইড্রোজেনকেই দক্ষভাবে সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হবে। সেটি যদি সম্ভব হয়, তা হলে এর কাজের বাকি অংশ হবে অন্য সব কিছুর মত। ফিউশন বিক্রিয়ায় প্রচণ্ড নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদনের জন্য খুব বেশি হাইড্রোজেনের প্রয়োজন যে হয় তা নয়। ফিউশন বিক্রিয়ায় যে শক্তি উৎপাদন হলে তার দ্বারা বিক্রিয়াজাত বস্তুগুলোকে সজোরে পেছনে ছুঁড়ে দেয়ার মাধ্যমেই এই মহাশূন্যযান এগিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আপাতত মূল সমস্যা হলো কার্যকর নিয়ন্ত্রিত ফিউশন বিক্রিয়া এখনো সম্ভব হয়নি, শিগ্‌গির হবে বলে আশা করা যায়। অন্য বিশেষ সমস্যা হলো দক্ষভাবে মহাশূন্যের হাইড্রোজেন সংগ্রহ করা। এতে একটি বাড়তি অসুবিধা হলো এই সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় আবার মহাশূন্যযান এগিয়ে যাওয়ার পথে এক ধরনের পিছুটান (ড্রেগ) সৃষ্টি হয়। যে কোন বিমান বা রকেটের গতির শত্রু হলো এই পিছুটান। ফিউশন র‍্যাম জেটে এই বাড়তি পিছুটানকে কমিয়ে আনার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। সমস্যাগুলোকে অতিক্রম করতে পারলে এই ফিউশন র‍্যাম জেটের বড় আকর্ষণ হবে এতে জ্বালানি বহনের সমস্যা বা তার ওজনের সমস্যাটি একেবারেই থাকবেনা। বিস্তীর্ণ মহাশূন্যে এটি নিজের জ্বালানি সংগ্রহ করতে করতেই সীমাহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে পারবে।

চালিকা শক্তির উৎস বাইরে রয়েছে এমন আর একটি খুবই আকর্ষণীয় মহাশূন্যযান আসবে আলো ধরা পাল ব্যবহারের মাধ্যমে। আমাদের নৌকা যেমন চলে বাতাস ধরা পালের মাধ্যমে, এই পাল ধরবে আলো, অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী লেজার আলো। এই আলোর শক্তিতেই এটি এগিয়ে নিয়ে যাবে মহাশূন্যযানকে।

আলো ধরা পাল

আলো ধরা পালের চিন্তাটি মোটেও নূতন কিছু নয়। শুরুতে এর ধারণাটি এসেছে সৌর পাল হিসেবে, যাতে সূর্যের আলোর চাপকে ব্যবহার করে মহাশূন্যযান চালনা করা যাবে। এই সৌর পালের ধারণাটি আমরা ইতোমধ্যে খানিকটা পেয়েছি আগের একটি অধ্যায়ে। আলোর যে চাপ আছে, আলোর শক্তিকে যে সরাসরি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা যায় তা পদার্থবিদ্যার যে কোন ছাত্র জানে। সহজে ঘুরানো সম্ভব এমন একটি খুব হালকা ফুরফুরির কোন একটি ডানার টর্চের আলো ফেললে

আলোর চাপে এটি ঘুরতে আরম্ভ করে, যেমন বাতাসের চাপে সাধারণ ফুরফুরিগুলো ঘুরে।

মহাশূন্যযানকে বিশাল হালকা পালের সঙ্গে সংযুক্ত করে তাতে সূর্যের (বা অন্য তারার) আলো পড়তে দিলে সেটিই পারবে তার বেগকে ক্রমাগত বাড়িয়ে অনেক উচ্চ বেগে নিয়ে যেতে। সীমিত আকারে পরীক্ষা করে ব্যাপারটিতে সফলও হওয়া গেছে। সৌর পালের ক্ষেত্রে প্রধানত নির্ভর করা হবে 'সৌরবায়ুর' (সোলার উইণ্ড) উপর। সূর্যের বাইরের দিকে যে 'করোনা' অংশ রয়েছে তার থেকে প্রচুর পরিমাণে চার্জযুক্ত কণিকা সূর্যের চারিদিকে সেকেণ্ডে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার বেগে ছড়িয়ে পড়ে সৌর বায়ুর সৃষ্টি করে। বায়ুর মতই এর প্রবাহে উত্থান পতন ঘটে এবং নানা অংশের মধ্যে বিভিন্ন বিক্রিয়াও হয়। সূর্যের থেকে অনেক দূরেও (যেমন পৃথিবীতে) সৌর বায়ুর প্রভাব প্রচুর। এর চাপে সৌর পাল মহাশূন্যযানকে দিব্যি গতিমান করে মহাশূন্যে চলাচলের ব্যবস্থা করতে পারে এবং ক্রমাগত এর বেগ বাড়াতে পারে, অথচ এ জন্য কোন জ্বালানি ঐ মহাশূন্যযানকে বহন করতে হয়না।

সৌর পালের ধারণাটিকে সম্প্রসারিত করে পরে আরো নূতন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। পালের উপর চাপটি এক্ষেত্রে সৌর বায়ুর হবেনা, অন্য কোন প্রাকৃতিক আলোরও হবেনা। বরং অনেক জোরালো চাপ সৃষ্টি করা হবে পৃথিবীতে বা অন্য কোথাও রাখা উৎস থেকে তীব্র শক্তির লেজার বা মাইক্রোওয়েভের বীম খুব সুনির্দিষ্ট ভাবে ঐ পালের উপর ফেলে। লেজার আলোর বৈশিষ্ট হলো এতে আলোকে স্বল্প অবয়বের বীমের মধ্যে ইচ্ছেমত জোরালো করে তোলা যায় তাতে ক্রমাগত শক্তি নিয়োগ করে। আর এই বীম তার এই সরু অবয়ব বজায় রেখেই অসম্ভব দূরে চলে যেতে পারবে ছড়িয়ে না পড়ে, বা তার শক্তিকে বিক্ষিপ্ত না করে। লেজারের নীতির ফলে বিবর্ধনের এই গুণ সাধারণ আলোর ক্ষেত্রে যেমন পাওয়া সম্ভব, মাইক্রোওয়েভের ক্ষেত্রেও তা পাওয়া সম্ভব। মহাশূন্যযানের ক্ষেত্রে উভয়কেই ব্যবহারের প্রস্তাব রয়েছে। তবে মাইক্রোওয়েভের একটি বড় সুবিধা রয়েছে। এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ অপেক্ষাকৃত অনেক বড় বলে পালের মধ্যে যদি মাঝে মাঝে ফাঁক থাকে তার উপর মাইক্রোওয়েভ পড়ার ক্ষেত্রে তাতে কোন ইতর বিশেষ হবেনা, ঠিকই তার চাপ পুরো পালে অনুভূত হবে। একটানা পালের চেয়ে একরকম ফাঁক দেয়া টুকরার সমন্বয়ে বিশাল পাল তৈরি করায় নির্মাণগত সুবিধা থাকবে। এ ধরনের উচ্চশক্তি বীম তৈরি করার আর একটি বিকল্প উপায় হতে পারে অত্যন্ত শক্তিশালী কণিকা-ত্বরকের ব্যবহার করা– উচ্চ শক্তি পদার্থবিদ্যার গবেষণায় যা এখনই প্রচুর ব্যবহৃত হচ্ছে। চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে এই অতি উচ্চ শক্তি কণিকার বীমকে বাঁকিয়ে তখন সুদূর মহাশূন্যযানের পালে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করা যাবে।

লেজার বা মাইক্রোওয়েভের বা কণিকা বীমের সরাসরি চাপের উপর নির্ভর না করেও আলো ধরা পাল ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পালের উপর গিয়ে পড়ার ফলে তীব্র শক্তির আলো সেখানে অত্যন্ত উচ্চ উত্তাপ সৃষ্টি করবে যা একটি চালক গ্যাসের মধ্যে শোষণ করে নেয়া হবে। ঐ উত্তপ্ত গ্যাসকে এখন রকেট নীতিতে মহাশূন্যযান এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্যবহার করা হবে। পেছনে ছুঁড়ে দেয়া এই গ্যাসের বেগ উত্তাপের বর্গমূলের সমানুপাতে বাড়তে থাকবে। যেহেতু জ্বালানি বহন করতে হচ্ছেনা, তাই উত্তাপ যত ইচ্ছে বাড়িয়ে পশ্চাদ্‌মুখী গ্যাসের গতি এবং সেই সঙ্গে মহাশূন্যযানের গতি ইচ্ছেমত বাড়ানো যাবে। আলো ধরা পালের সব কিছু যে নেহাৎ পরিকল্পনার পর্যায়ে তাও নয়। কিছু কিছু পরীক্ষা নিরিক্ষাও চলছে এর। যেমন ২০০০ সালে পাল্‌স লেজার ব্যবহার করে ক্ষুদ্র সময় পর পর থেমে থেমে আসা লেজার বীমকে বাটি আকৃতির আয়নার সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করে অতি উচ্চ উত্তাপ সৃষ্টি করা হয়েছে একটি বিমানে। ওতে উত্তপ্ত বাতাসের প্রসারন গতিতে লেজারের প্রত্যেক পাল্‌সের সঙ্গে বিমানটির বেগ বর্ধিত হয়েছে। এভাবে বিমানটি ক্রমাগত উচ্চ বেগে লেজারের শক্তিতে অল্পক্ষণ চালানো হয়েছে।

শক্তিটি যেভাবেই ব্যবহার করা হোক একে আসতে হবে বাইরের উচ্চ শক্তির লেজার উৎস থেকে। মহাশূন্যে যে কোন সুবিধাজনক স্থানে লেজার বা মাইক্রোওয়েভ উৎপাদন যন্ত্রের ব্যবস্থা করে এটি স্থাপিত হতে পারে। আর এর শক্তি আসতে পারে সৌর শক্তি বা অন্য তারার শক্তি থেকে। মহাশূন্যে অতি বিশাল জায়গা জুড়ে সৌর প্যানেল স্থাপন করে যত উচ্চ তীব্রতার এই শক্তি সংগ্রহ কঠিন হবেনা। সব দিক বিবেচনায় খুব সম্ভব তারার দেশে ভ্রমণে সব চেয়ে সম্ভাব্য উপায় হবে এই আলো ধরা পালের ব্যবস্থার মাধ্যমে। এর গতিবেগ বৃদ্ধির হার বা ত্বরণ কী রকম হবে? পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ তার দিকে পতনশীল বস্তুতে যে ধরনের ত্বরণ সৃষ্টি করে সেই পর্যায়ে পৌঁছা এতে অসম্ভব হবেনা। পুরো ভ্রমণ কালে ক্রমাগত এর সাহায্যে গতি বাড়িয়ে এতে এমনকি আলোর গতির অর্ধেক গতিতেও গিয়ে পৌঁছা সম্ভব হতে পারে।

সব কিছু নির্ভর করবে ওরকম প্রচণ্ড শক্তির লেজার বীম সৃষ্টি করতে পারার উপর। হিসেব করে দেখা গেছে ৫/৭ কোটি গিগাওয়াট শক্তির লেজার তৈরি করা গেলে এটি বীমের আকারে আলো ধরা পালে পৌঁছিয়ে ৭৮ হাজার টন ওজনের বিরাট একটি মহাশূন্যযানকে একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে অন্তত আমাদের কাছের তারাগুলোর জগতে পৌঁছাতে পারবে। এর জন্য বহু প্রজন্ম ধরে ভ্রমণ করতে হবার মতো অসম্ভব শর্ত প্রয়োজন হবেনা। এক্ষেত্রে পালের আকারটির কথাও মনে রাখতে হবে। ঐ বিশাল মহাশূন্যযানকে এ গতিতে নিয়ে যেতে হলে আলো ধরার পালটিকেও হতে

হবে অতি বিশাল, যার সর্বাঙ্গে লেজারের চাপ গিয়ে পড়তে হবে। ৭৮ হাজার টনের মহাশূন্যযানের জন্য পালের কিনারার দৈর্ঘ হয়তো হবে হাজার কিলোমিটার। সব কিছুই দশাসই ব্যাপারই হবে বটে।

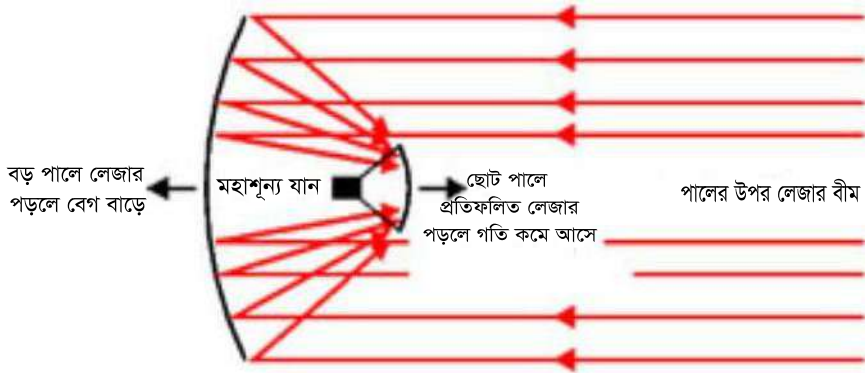

লেজার শক্তি দূর থেকে ফেলে পালের মাধ্যমে মহাশূন্য পাড়ি

এই দশাসই আয়োজনের পুরো জিনিসটি যখন আলোর গতির অর্ধেকের মত গতিতে তারার দেশের কোন অভীষ্ট গ্রহে-উপগ্রহে গিয়ে পৌঁছবে তাকে সেখানে থামাবার উপায় কী হবে? থামানো না গেলে তো পুরো আয়োজনই ব্যর্থ। এ জন্য যথাসময়ে গতি কমিয়ে আনার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এক্ষেত্রে তাও পাল দিয়েই করতে হবে। এর জন্য মহাশূন্যযানের উল্টো দিকে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট পাল থাকবে। গতি কমিয়ে আনার জন্য মূল বড় পালটি মহাশূন্যযান থেকে খুলে দেয়া হবে– ওটি তখন যেমন চলছিল স্বাধীনভাবে চলতে থাকবে আগের মতই– মহাশূন্যযানকে আর না টেনে। এই মূল পালটি এখন ব্যবহৃত হবে লেজার বীমের প্রতিফলক হিসাবে। এর থেকে প্রতিফলিত হয়ে লেজার বীম মহাশূন্যযান সংলগ্ন উল্টো দিকের ছোট পালে পড়বে এবং তাতে উল্টো চাপ সৃষ্টি করে ক্রমে এর গতি কমিয়ে দেবে।

আরো দূরের তারার জগতে কি আদৌ যেতে পারবো?

এ পর্যন্ত মহাশূন্যযানের গতি বৃদ্ধির যে সব পরিকল্পিত উপায়ের কথা বলা হলো তা যদি সব চেয়ে ভাল কাজ করেও তবু এদের যাত্রী হিসেবে সব চেয়ে নিকটবর্তী তারার জগতে পৌঁছতেই আমাদের অন্তত কয়েক দশক লেগে যাবে। আর একটু দূরে যেতে হয়তো জীবনের একটি বড় অংশই আমাদেরকে ঐ মহাশূন্যযানে চড়ে ভ্রমণে থাকতে হবে। স্পষ্টত এর চেয়ে দূরের তারাগুলোর জগতে যেতে হলে আমাদের এক জীবনে কুলোবেনা। হয়তো বংশ-পরম্পরায় মহাশূন্যযানে কাটালে

ভবিষ্যৎ বংশধরদের কেউ সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারবে। কাজেই ওভাবে আমাদের ছায়াপথের দূর তারায় অথবা অন্য গ্যালাক্সিতে যাওয়ার প্রশ্নই উঠবেনা। এর থেকে কম সময়ে যদি আমাদেরকে সত্যি সত্যি দূরের তারায়, এমনকি দূরের গ্যালাক্সির জগতে গিয়ে পৌঁছতে হয় তা হলে আলার গতিকে অতিক্রম করতে হবে। পদার্থবিদ্যার নিয়মে এটি অসম্ভব। তবে আধুনিক কোন কোন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে যাবার উপায় রয়েছে বলে দাবী করছেন বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে। অবশ্য সে দাবী তাঁরা করছেন গাণিতিক সম্ভাবনার হিসাবে, এখনো কোন বাস্তব পরীক্ষণের দ্বারা নয়।

এমনি একটি গাণিতিক ধারণা হলো মহাবিশ্বের স্থান-কালে 'ওয়র্ম হোল' বা 'কীটের গর্তের' ধারণা। মহাবিশ্বে দুটি স্থান 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে স্থান-কালে একটি স্বাভাবিক দূরত্ব রয়েছে। এটি অতিক্রম করে 'ক' থেকে 'খ'তে যেতে অনেক আলোক বর্ষ লেগে যেতে পারে। কিন্তু স্থান-কালে কিছু বিকৃতি ঘটিয়ে এই দুইকে সংযোগকারী এক রকম বিকল্প পথের ব্যবস্থা করা যায়– যা স্বাভাবিক স্থান-কালে না হয়ে হবে এক রকম শর্টকাট পথে, অনেকটা কীটের গর্তের মধ্য দিয়ে যেভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শর্টকাটে যাওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে মহাশূন্যযান যদি ওয়র্ম হোলের পথে যায় স্থানীয় ভাবে এটি কিন্তু আলোর গতিকে অতিক্রম করবেনা, এবং সেদিক থেকে পদার্থবিদ্যার নিয়মের মধ্যে থাকবে। ওয়র্ম হোলের মধ্য দিয়ে যাওয়া আলো মহাশূন্যযানের আগেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবে। কিন্তু কার্যত 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে যাতায়তে মহাশূন্যযানটির যে সময় লাগবে তাতে সাধারণ পথের হিসাবে আলোর গতির চেয়ে অনেক বেশি গতির পরিচয় এটি রাখবে। কারণ সাধারণ পথে যাওয়া আলো ওয়র্ম হোলে চলা মহাশূন্যযানের অনেক পরে লক্ষ্য স্থলে পৌঁছবে। বাস্তব পরীক্ষণ সম্ভাবনা আপাতত নেই বলে ওয়র্ম হোলের বিষয়টি এবং আলোর গতির চেয়ে বেশি গতির অনুরূপ অন্যান্য উপায়গুলো বাস্তব ক্ষেত্রে এখনো কল্প-কাহিনীর দখলে রয়ে গেছে। কিন্তু তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার নিরিখে এগুলো চমকপ্রদ জোরালো গবেষণার অন্তর্গত।

এমনি আর একটি উপায় হতে পারে মহাশূন্যযানকে সব সময় স্থান-কালের একটি 'বুদবুদের' মত পরিস্থিতিতে রেখে চলতে দেয়া। সাধারণ স্থান-কালের বিশেষ বিকৃতির মাধ্যমে তার মধ্যে এই বুদবুদ সৃষ্টি করা যাবে। বুদবুদের পেছনে স্থান-কাল ধসে পড়তে থাকবে আর বুদবুদের সামনে তা প্রসারিত হতে থাকবে। এই প্রক্রিয়াতেও বুদবুদের ভেতরে স্থানীয় ভাবে মহাশূন্যযান পদার্থবিদ্যার নিয়মে আলোর গতির থেকে কম গতি বজায় রাখলেও– বুদবুদ নিজে কিন্তু মহাশূন্যযানকে নিয়েই আলোর গতি অতিক্রম করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যেতে পারবে।

দূর ভবিষ্যতে কোন দিন হয়তো এগুলো আর শুধু গাণিতিক সম্ভাবনার বিষয় থাকবেনা, আমাদের বাস্তব সক্ষমতার অংশ হয়ে পড়বে। তখন হয়তো মহাবিশ্বের বিরাট অংশে ঘটতে পারবে আমাদের অবাধ বিচরণ। আমাদের কলোনিকে হয়তো নিয়ে যেতে পারবো সুদূর গ্যালাক্সির জগতে।

একেবারে কাছের তারার জগতেই হোক, আর সুদূর গ্যালাক্সির জগতেই হোক, আমরা এত দূরে বসত করার কথা আদৌ ভাববো কেন? পৃথিবীর কাছেই তো রয়েছে যথেষ্ট সুবিধাজনক গ্রহ-উপগ্রহ যেখানে এখনই বসত করতে পারার সঙ্গত সুযোগ রয়েছে। দুটি কারণ এদিক থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একটি কারণ হলো আমাদের জন্য সবচেয়ে যুৎসই আবাস খুঁজে পাওয়ার জন্য। পৃথিবীর প্রায় হুবহু পরিবেশ খুঁজে পেতে সৌর জগৎ যথেষ্ট নয়। এর জন্য আরো অনেক বৈচিত্রের মধ্যে খুঁজতে হবে– আর তা সম্ভব অন্য তারার জগতে।

অন্য কারণটি কিছুটা দূর ভবিষ্যতের বিষয়। আমাদের সূর্য এখন তার মধ্য-বয়সে রয়েছে। এই সময়টি সূর্যের মত একটি তারার জীবনে স্থিতিশীল সময়। কিন্তু ভবিষ্যতে সূর্য সব সময় এরকম থাকবেনা। এর পরের পর্যায়টি হবে 'লাল দৈত্যের' পর্যায়। এ সময় সূর্য অনেকখানি ফুলে ফেঁপে উঠবে, এবং পৃথিবী সহ কাছাকাছি গ্রহগুলো এর একেবারে নিজের অবয়বের মধ্যে চলে যাবে। সে রকম ঘটার বেশ কিছু আগে থেকেই পৃথিবী তো যে কোন প্রাণির বসবাসের অযোগ্য হবেই, সৌর জগতে আমাদের আগ্রহের অধিকাংশ জায়গার অবস্থাও তাই হবে। তার আগেই আমাদেরকে শুধু পৃথিবী নয়, সৌর জগতও ছাড়তে হবে। এটি অবশ্য বহু কোটি বছর পরের ঘটনা। সুদূর ভবিষ্যতের কোন না কোন সময় এরকম বিপর্যয় এড়িয়ে প্রজাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে হলে এবং পৃথিবীর জীবকূলকে বাঁচাতে হলে সৌর জগৎ ছাড়িয়ে দূরে গিয়ে বাসা বাঁধার সুযোগ আমাদের করে রাখতে হবে।

আমরা কি একা?

অন্যত্র বুদ্ধিমানরা থাকার সম্ভাবনা

সৌর জগতে যে সব জায়গা সম্পর্কে খোঁজ নেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, তাতে দেখেছি যে সেখানে কোথাও এমন কি ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়ার আকারের প্রাণ রয়েছে কিনা সেই বিষয়েও আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি। এর চেয়ে উন্নত কোন প্রাণির তো কথাই নেই। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীদের একটি বড় অংশের ধারণা মহাবিশ্বে প্রাণের অনুকূল যে অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ থাকার কথা তার বেশ কিছুগুলোতেই উন্নত বুদ্ধিমান প্রাণি রয়েছে, এমনকি মানুষের মত বা তারো চেয়ে অগ্রসর উন্নত সভ্যতার অধিকারী প্রাণি রয়েছে। সত্যি সত্যি এমন কোন প্রমাণ না পেলেও এরকম ধারণা সৃষ্টির কিছু যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। মূল যুক্তিটি হলো মহাবিশ্বের সর্বত্র এক রকম সমতার পরিচয় আমরা পেয়েছি। এর কোন বিশেষ অংশ অন্য অংশের চেয়ে আলাদা কিছু নয়। তাই সূর্যের মত গড়পড়তা মামুলি তারার যদি পৃথিবীর মত প্রাণ-অনুকূল গ্রহ থাকে, তা হলে মহাবিশ্বে কোটি কোটি তারার যে গ্রহমণ্ডলী রয়েছে সেখানেও যে একই রকম অনেক অনেক গ্রহ-উপগ্রহ থাকবে এটিই স্বাভাবিক। আর পৃথিবীতে যেভাবে প্রাণের উন্মেষ হয়েছে, প্রাথমিক প্রাণের বিবর্তনে বিচিত্র জীব জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, এবং মানুষের মত উচ্চ বুদ্ধিমত্তা ও সভ্যতা সম্পন্ন জীব আসতে পেরেছে– তা এরকম অসংখ্য গ্রহেও না হবার কোন কারণ নেই। মহাবিশ্বের নিরবিচ্ছিন্ন সমতা, এর বিশালত্ব, কালের দীর্ঘ পরিক্রমা, ও তারারাজির অভাবনীয় রকম বিশাল সংখ্যার কথা বিবেচনায় রাখলে এটি অনিবার্য।

পৃথিবীতে প্রাণের উন্মেষের যে তত্ত্ব এখন প্রতিষ্ঠিত তাতে বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতিতে প্রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এখানে প্রাণের উপাদানগুলো তৈরি হতে পেরেছিল। এই কারণে আজ ল্যাবোরেটরিতে সেই পরিবেশ নকল করে ঐ উপাদানগুলো কিছু কিছু সংশ্লেষিত হতে দেখা সম্ভব হচ্ছে। অনুরূপ পরিস্থিতিতে মহাবিশ্বের সর্বত্রই এমনটি ঘটবে তা এদিক থেকে নিশ্চিত। তারার সংখ্যাকে যদি অসীম বলে ধরে নিই, তা হলে তার একটি ভগ্নাংশ হিসাবে এমন প্রাণ-অনুকূল গ্রহের সংখ্যাও অসীম। আর সে সব গ্রহের মধ্যে উচ্চ বুদ্ধি ও উন্নত সভ্যতা সৃষ্টির মত জীব বিবর্তনের সুযোগ থাকবে এমনগুলোর সংখ্যাও প্রায় অসীম। তবে একথা ঠিক তারা সবাই আমাদের জীব জগতের মত একই ছাঁদে তৈরি হবে এমন কথা

নেই। তাদের জীবজগৎ হয়তো ভিন্ন জৈব রাসায়নিক ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। কিন্তু তারপরও বিবর্তনের ও প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কের মৌলিক নীতিগুলো সবার ক্ষেত্রে একই হওয়াটি আশা করতে পারি।

মহাবিশ্বে আমাদের কাছ থেকে দূরে তারার জগতে এই যে অনেক 'বুদ্ধিমানদের' কথা আমরা ধরে নিচ্ছি তাদের কোন খবরই কি আমরা পাবনা? অনেক বিজ্ঞানী মনে করছেন চেষ্টা করলেই এই খবর আমরা পাব। কারণ তাদের অনেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমাদের সমকক্ষ, এমন কি তাদের অনেকের সভ্যতা আমাদের থেকে এগিয়ে আছে। তাই তাদের অনেকে নিশ্চয়ই তাদের উপস্থিতির বার্তা চারিদিকে পাঠাচ্ছে। এটি তারা ইচ্ছে করে দূরবর্তী অন্য বুদ্ধিমানদেরকে জানাবার জন্য করতে পারে, অথবা নিজেদের কাজকর্ম করতে গিয়ে অপরিহার্য ভাবেও করতে পারে। আমরা জানি বিজ্ঞানের, বিশেষ করে পদার্থবিদ্যার, নিয়মগুলো সারা মহাবিশ্বে সমান ভাবে প্রযোজ্য। তাহলে সেই দূরবর্তী বুদ্ধিমানদের বার্তাও নিশ্চয়ই কোন না কোন রকমের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের আকারেই প্রেরিত হচ্ছে– রেডিও তরঙ্গের মত। সেই বার্তা আমরা পুরাপুরি না বুঝতে পারি, কিন্তু তাতে এমন কিছু বৈশিষ্ট খুঁজে পাওয়া যাবে যার দ্বারা বুঝা যাবে যে এটি বুদ্ধিমান কারো কাছ থেকে আসছে, নেহাৎ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হচ্ছেনা। আমরা দেখবো, এরকম বার্তার অনুসন্ধান আজ বেশ কিছু বিজ্ঞানীর বড় গবেষণা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিজ্ঞানীদের সবাই কিন্তু এরকম বার্তা খোঁজাকে খুব ফলপ্রসূ কাজ বলে মনে করেন না। কিছু বিজ্ঞানী মহাবিশ্বে অন্য বুদ্ধিমানদের উপস্থিতি থাকতেই হবে সে কথাটিই যথার্থ মনে করেন না। তাঁদের কারো কারো মতে জীবনের উন্মেষটিই একটি দৈবক্রমে ঘটে যাওয়া ব্যপার। যে সব পরিস্থিতির অতি বিরল যোগসূত্রে একদিন পৃথিবীতে সেটি সম্ভব হয়েছিল তেমনটি আর কোন জায়গায় স্বাধীনভাবে ঘটবে সে সম্ভাবনা ক্ষীণ। দূর-বুদ্ধিমান থাকার বিষয়ে আশাবাদী নন এমন অন্য কিছু বিজ্ঞানী অবশ্য অন্যত্র জীবনের উন্মেষ ঘটতে পারেনা এমন মনে করেননা। কিন্তু জীব বিবর্তন যে কোন বিশেষ লক্ষ্যের দিকে যায়না সেই কথাটি তাঁরা স্মরণ রাখেন। বিবর্তন তাৎক্ষণিক পরিস্থিতেই শুধু প্রভাবিত হয়, এর কোন সুদূর প্রসারী লক্ষ্য নাই। তাই তাৎক্ষণিক পরিস্থিতিতে কোন কোন জীব খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে বিশেষ একটি পরিবর্তনের দিকে স্বয়ংক্রিয় ভাবে যায়, অন্য জীব যায় অন্য পরিবর্তনের দিকে। এভাবে মানুষের পূর্বসূরিরা গিয়েছিল উন্নত মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিমত্তার দিকে, এবং তারপর সেটিই ক্রমাগত উন্নত হয়ে আজকের এমন সভ্যতার সৃষ্টিকারী মানুষকে বিবর্তিত করেছে। ঘটনাটি পৃথিবীতে যেমন জানা মতে স্বাধীনভাবে সম্পূর্ণ পৃথক দ্বিতীয় কোন ধারায় আর ঘটেনি– মহাবিশ্বের অন্য কোথাও কোন রকম

জীববিবর্তনের ধারাতেই উন্নত মস্তিষ্কের দিকে যাওয়ার ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি ঘটবে এমন সম্ভাবনা বেশি নয়। তাই দূর তারার জগতে অনেক বুদ্ধিমানরা আছে, থাকতেই হবে, এমন কথায় তাঁদের আস্থা কম।

এই আস্থার অভাব রয়েছে এমন বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ খ্যাতনামা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দল সংখ্যায় ভারি নয়। সাধারণ ভাবে বিজ্ঞানীরা সৌর জগৎ সহ মহাবিশ্বের অসংখ্য জায়গায় প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে এমনটিই মনে করেন। আর দূরের অন্য তারার গ্রহগুলোর বেশ কিছুতে মানুষের অনুরূপ উন্নত বুদ্ধিমানরা থাকতে পারে এ ধারণার উপরও তাঁরা খুবই আস্থাশীল। তাঁদের মতে মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান হিসেবে আমরা একা নই। অন্যরা ওখানে রয়েছে, তবে সৌভাগ্যক্রমেই হোক বা দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক উচ্চতর সক্ষমতার অধিকারী ওদের কেউ আমাদেরকে খুঁজে বের করে এখনো পৃথিবীতে এসে দেখা দেয়নি। উড়ন্ত চাকতি (ফ্লাইং সসার) ইত্যাদি দেখতে পাওয়ার যে সব সাক্ষ্য কেউ কেউ নানা সময়ে দিয়েছে সেগুলো সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি। তাই এখন আমাদেরকে ঐ বুদ্ধিমানদের উপস্থিতির বাস্তব প্রমাণ খুঁজে পেতে হবে, অন্তত তাদের কোন চিহ্ন বা আলামত খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। পুরো মহাবিশ্বে অভাবনীয় বিশাল দূরত্বে ছড়িয়ে থাকা গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে এমন আলামত পৃথিবীতে বসে খুঁজে পাওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়। তবে একটি অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থায় বিজ্ঞানীরা সে কাজটিই কিছু দিন ধরে করার চেষ্টা করছেন। ঐ যে রেডিও তরঙ্গের যে বার্তার সম্ভাবনার কথা বলা হলো সেটিকেই তাঁরা খুঁজে চলেছেন। আর বিশ্ববাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তাঁদের সেই আবিষ্কারটির জন্য– যা আমাদেরকে জানাবে যে সত্যিই আমরা একা নই।

'সেটি'ঃ পৃথিবী বহির্ভূত বুদ্ধিমানের অনুসন্ধান

এই অনুসন্ধানটি এখন একটি নিয়মিত বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে রূপ পেয়েছে, যার নাম সার্চ ফর এক্সট্রা-টেরেসট্রিয়্যাল ইন্‌টেলিজেন্স বা সংক্ষেপে 'সেটি' (SETI)। কথাটির অর্থ– পৃথিবী-বহির্ভূত বুদ্ধিমানের অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানের যে প্রক্রিয়া, তাতে ধরে নেয়া হয়েছে যে ঐ দূর বুদ্ধিমানরা এমন রেডিও তরঙ্গ পাঠিয়ে চলেছে যাকে প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট নানা রেডিও তরঙ্গ থেকে আলাদা ভাবে বুঝা যাবে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেডিও তরঙ্গের ব্যবহারটি এমন মৌলিক একটি ব্যবস্থা যে পৃথিবী-বহির্ভূত বুদ্ধিমানরাও এই প্রযুক্তিও ব্যবহার করবে বলে ধরে নেয়া যায়– তা তারা আমাদের চেয়ে যত বেশি অগ্রবর্তী সভ্যতার অধিকারী হোক না কেন। এদিকে পৃথিবীতে আমরা বেশ কিছুদিন ধরে রেডিও টেলিস্কোপ প্রযুক্তিকে যথেষ্ট উন্নত করতে পেরেছি। অভাবনীয় রকম দূরত্ব থেকে এমনকি মহাবিশ্বের একেবারে

দূর তারার জগতে বুদ্ধিমানের সন্ধানে রেডিও টেলিস্কোপ

কিনারার গ্যালাক্সি থেকে আসা রেডিও টেলিস্কোপে পাওয়া তথ্য উদ্ঘাটন আমরা করতে পারছি এর রেডিও সিগন্যাল বিশ্লেষণ করে। এই প্রযুক্তিকেই দূর বুদ্ধিমানদের উপস্থিতি উদ্ঘাটনেও আমরা কাজে লাগাতে পারি। এবার গ্যালাক্সি থেকে আসা প্রাকৃতিক রেডিও সিগন্যালের খোঁজ নয়, বরং সেখান থেকে আসা সিগন্যালে পৃথিবী-বহির্ভূত বুদ্ধিমানের কোন ছাপ দেখা যায় কিনা তার খোঁজে।

একাজে প্রাথমিক সমস্যাগুলো কী ধরনের হতে পারে তা একটি উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পোর্টোরিকোতে একটি রেডিও টেলিস্কোপ রয়েছে যার বাটি আকারের ডিশ এন্টেনার ব্যাস হলো ৩০৫ মিটার। এটি প্রায় ৭৩ হাজার বর্গ মিটার এলাকা জোড়া জায়গায় দূর থেকে আসা রেডিও তরঙ্গ সংগ্রহ করতে পারে– এবং সেই হিসাবে খুব শক্তিশালী রেডিও টেলিস্কোপের এটি একটি। আমাদের নিজেদের গ্যালাক্সি ছায়াপথের যে কোন জায়গা থাকা অনুরূপ একটি রেডিও টেলিস্কোপ থেকে রেডিও সিগন্যাল পাঠানো হলে এটি তা গ্রহণ করতে পারবে। মনে রাখতে হবে ছায়াপথের ব্যাস হলো প্রায় এক লক্ষ আলোক বর্ষ– অর্থাৎ এর এ কিনারা থেকে ও কিনারায় আলো যেতে এক লক্ষ বছর লেগে যায়– এতই তার ব্যাপ্তি! আর এই ব্যাপ্তির মধ্যে রয়েছে প্রায় এক লক্ষ কোটি তারা। দূর বুদ্ধিমানের সিগন্যাল পাওয়ার জন্য এগুলোর কোন্‌টির দিকে টেলিস্কোপটি তাক করবো? এক এক করে সবগুলোর সম্ভাবনাটি দেখে ফেলতে অসম্ভব রকমের সময় লেগে যাবে। কাজেই এদিক থেকে

একটি বড় অনিশ্চয়তার সমস্যা থেকে যায়। আর একটি অনিশ্চয়তা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে। রেডিও টেলিস্কোপে পাওয়া একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির সিগন্যাল নেবার জন্য যন্ত্রটিকে সে ভাবে বিশেষায়িত ভাবে তৈরি রাখতে হয়। কিন্তু সেটি কোন্ ফ্রিকোয়েন্সিতে করবো? বাইরের বুদ্ধিমান কোন্ ফ্রিকোয়েন্সিতে তার বার্তা পাঠাবে তা আমরা কীভাবে জানবো? সম্ভাব্য ফ্রিকোয়েন্সি হাজার কোটি রকমের হতে পারে। এক এক করে তার প্রত্যেকটিতে খোঁজ করা আবার প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

প্রথম সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছে তারারাজির বিশেষ বিশেষ অংশকে এক এক সময় সিগন্যালের জন্য জরিপ করে। আর দ্বিতীয় সমস্যা ফ্রিকোয়েন্সির সমস্যাকে সমাধানের জন্য একটি প্রাথমিক অনুমান থেকে শুরু করা হলো। অনুমানটি হলো যেহেতু সিগন্যালটি অগ্রসর কোন সভ্যতার বুদ্ধিমানদের কাছ থেকে আসছে, তাই তারা এমন একটি ফ্রিকোয়েন্সিতে তাদের বার্তা পাঠাবে যা প্রেরণকারী ও গ্রহণকারী উভয়ের জন্য সুবিধাজনক হয়। তা ছাড়া পুরো মহাবিশ্বের কোন সাধারণ বৈশিষ্টের সঙ্গে যোগসূত্র আছে তা এমন ফ্রিকোয়েন্সি হবার সম্ভাবনা বেশি হবে। বাইরে থেকে আসা অধিকাংশ বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয়ে হারিয়ে যায়। কিন্তু মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সিতে তা হয়না। শোষিত না হয়ে চলে আসার এই 'জানালাটি' ব্যবহার করে আমরা রেডিও টেলিস্কোপে কাজে লাগাই। এর মধ্যে একটি অনন্য ফ্রিকোয়েন্সি হলো ১.৪২০ গিগাহার্ৎস। এটি হলো হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের ঘূর্ণনের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনের ফলে তৈরি রেডিও তরঙ্গ। সারা মহাবিশ্ব জুড়ে রয়েছে হাইড্রোজেন যেটি এখানকার সব চেয়ে ব্যাপকভাবে থাকা মৌল। ফলে রেডিও টেলিস্কোপ মাত্রেই একটি নিত্য পটভূমি তরঙ্গ (ব্যাকগ্রাউণ্ড নয়েজ) ধরা পড়ে যা কিনা ঠিক এই ফ্রিকোয়েন্সির। এ যেন মহাবিশ্বের একটি মহাসঙ্গীত যা নিত্য বেজেই চলেছে। দূরের

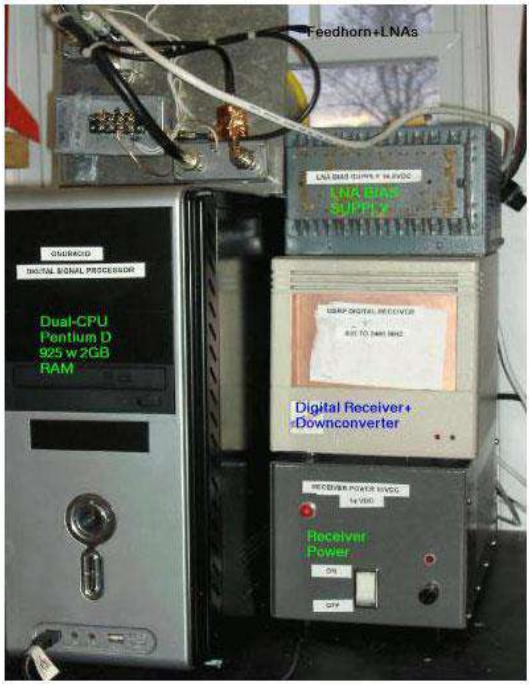

SETI'র জন্য ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম

বুদ্ধিমান কেউ এই ফ্রিকোয়েন্সিতে সিগন্যাল পাঠালে তাতো এই পটভূমিতে হারিয়ে যাবে। তাই মনে করা হলো ঠিক এটিতে নয় এর কাছাকাছি কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে তা পাঠাবার সম্ভাবনা বেশি। তাই অনুসন্ধানের ফ্রিকোয়েন্সিকে আপাতত ১.৪২০ গিগাহার্ৎসের এপাশ ওপাশে ৪০০ কিলোহার্ৎস প্রশস্ত একটি ব্যাণ্ডের মধ্যে সীমিত রাখা হলো যাতে এর সঙ্গে সরল সম্পর্কযুক্ত ফ্রিকোয়েন্সিগুলো অন্তর্ভূক্ত হলো। গ্রাহক যন্ত্রে থাকলো ১০০ হার্ৎস ব্যাণ্ড উইড্থ এর এক একটি চ্যানেল। এভাবে ১০০ হার্ৎস করে করে পুরো ৪০০ কিলোহার্ৎস প্রশস্ততার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের মধ্যে অনুসন্ধান চালানো সম্ভব হলো। ছায়াপথের এক একটি অঞ্চল বেছে নিয়ে তাতে নানা তারার উপর জরিপ চললো 'বুদ্ধিমান বার্তার' খোঁজে।

অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে বিজ্ঞানীরা এই অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। সব সময় যা পাওয়া যাচ্ছে তা নিত্যকার সব প্রাকৃতিক 'নয়েজ' মাত্র। কিন্তু অনুসন্ধানকারীদের আশা একদিন হঠাৎ করে আসবে সেই সিগন্যাল যাতে থাকবে দূরের বুদ্ধিমানের

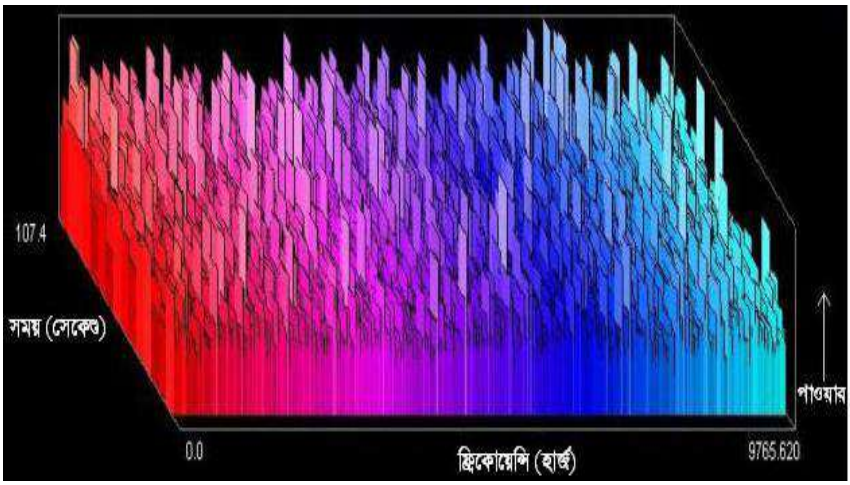

SETI প্রকল্পে নিয়মিত গৃহীত সিগন্যাল

স্পষ্ট 'স্বাক্ষর'। 'ইউরেকা'– সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়াজোড়া সব মানুষের মনে জাগবে সেই অদ্ভূত শিহরণ– আমরা তা হলে একা নই, আমাদের মত চিন্তা করে এমন কেউ রয়ে গেছে ঐ ওখানে। এরপর থেকে নিজের সম্বন্ধে আমাদের ধ্যান ধারণা কিন্তু আর একই থাকবেনা– সব কিছু বদলে যাবে। তবে প্রশ্ন হলো সেই সিগ্‌ন্যাল আদৌ কোনদিন আসবে কি?

সিগন্যাল এলে বুঝবো কী ভাবে ?

মাইক্রোয়েভ ফ্রিকোয়েন্সির ঐ যে 'জানালা' দিয়ে শোষিত না হয়েই মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক রেডিও সিগন্যালগুলো আসতে পারছে, সেই একই জানালা দিয়ে পৃথিবীতে আমাদের নিত্য সৃষ্টি করা নানা রেডিও সিগন্যাল বাইরেও যাচ্ছে– রেডিও, টেলিভিশন টেলিফোন ইত্যাদি নানা উপলক্ষে আমরা এগুলো সৃষ্টি করছি। মানুষ-সৃষ্ট এই তরঙ্গগুলোকে বাইরের মহাকাশ থেকে আসা প্রাকৃতিক রেডিও তরঙ্গ থেকে অনায়াসে আলাদা করা যায়, কারণ এগুলো খুব সরু ব্যাণ্ড উইডথে সীমিত থেকে ফ্রিকোয়েন্সির খুব স্বল্প বৈচিত্রের মধ্যে তরঙ্গের সব এনার্জির বন্টন ঘটায়। আর এর মধ্যেই এটি বার বার পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। অন্য দিকে দূর তারা থেকে অনেকটা 'নয়েজের' মতো প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন যে তরঙ্গ রেডিও টেলিস্কোপে ধরা পড়ে তা অনেক প্রশস্ত ব্যাণ্ডে নিজের এনার্জিকে বন্টন করে। কোন একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে এর বেশি এনার্জি বরাদ্দ থাকেনা। তাছাড়া এরা একটানা পুনরাবৃত্ত কিছুও নয়। আসলে এসব প্রাকৃতিক রেডিও তরঙ্গের অধিকাংশ আসে তারার ফাঁকে ফাঁকে থাকা গ্যাস থেকে (যেমন হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের ঘূর্ণন থেকে যা আমরা দেখেছি)। তাছাড়া 'পালসার' নামের নিউট্রন তারাগুলো থেকে, অথবা এমনি আরো কিছু উৎস থেকে, এরকম তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক ভাবেই এগুলোর রূপায়নটি ঘটে প্রশস্ত ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে।

এখন দূর বুদ্ধিমানের পাঠানো কোন সিগন্যাল যদি আমাদের রেডিও টেলিস্কোপে ধরা পড়ে তবে তাও হবে মানুষের তৈরি করা সিগন্যালের অনুরূপ খুব সরু ব্যাণ্ডে আসা রেডিও পাল্‌সের মত। এর মধ্যেই এগুলো বেশ শক্তিশালী ও উচ্চকিত ধরনের হবে, কারণ সে কারণেই তো এতো দূর থেকে এসেও আমাদের কাছে স্পষ্ট হতে পারছে। এজন্য দূর বুদ্ধিমানের পাঠানো সিগন্যাল খোঁজার জন্য এ পর্যন্ত আমাদের যত সরঞ্জামাদির উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে তা হয়েছে এই উচ্চকিত, পুনরাবৃত্ত, সরু ব্যাণ্ড উইড্‌থের সিগন্যাল উদ্ঘাটিত করার উপযুক্ত করেই। যদি সঠিক ফ্রিকোয়েন্সিতে খোঁজা হয় তা হলে এখানেই পাওয়া যাবে সেই সিগন্যাল। এ পর্যন্ত সেটি আমরা পাইনি। পৃথিবীতে মানুষের তৈরি সিগন্যাল থেকে এদের পৃথক কীভাবে করা হয়, তা আমরা একটু পর দেখবো।

সিগন্যাল পেলে তার বার্তা কি বুঝতে পারবো?

আমরা আপাতত শুধু সিগন্যালের অস্তিত্ব মাত্র খুঁজছি, যার থেকে আমরা বুঝতে পারবো ঐ দূর তারার জগতে বুদ্ধিমান কেউ রয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে আমাদের কৌতূহল জাগবে ঐ সিগন্যালের মধ্যে আসলে কী রয়েছে– সেটি কি কোন বার্তা,

কোন সঙ্গীত না অন্য কিছু। তা ছাড়া ঐ সিগন্যালের মধ্য দিয়ে আমরা এর প্রেরণকারী বুদ্ধিমানদের সম্পর্কে কতখানি আন্দাজ করতে পারবো? খুব সম্ভব এই শেষের কৌতুহলগুলো খুব বেশি মেটানো যাবে না।

আমরা যখন যোগাযোগের জন্য রেডিও সিগন্যাল সৃষ্টি করি তখন দুটি তরঙ্গকে একটির উপর আরেকটিকে চড়িয়ে নিই। শক্তিশালী যেই তরঙ্গটি দূরে যাবার সঠিক রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে সেটি বাহক তরঙ্গ– এটিই বাহকের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। পাঠাবার আগে অবশ্য ঐ বাহক তরঙ্গের কোন বৈশিষ্টের উপর আমরা আমাদের বার্তা-তরঙ্গের রূপটি আরোপ করে দিই যাকে বলা হয় বাহক তরঙ্গকে বার্তা দিয়ে মড্যুলেট করা। এই রূপারোপিত (মড্যুলেটেড) বাহক তরঙ্গটিই গ্রাহক গ্রহণ করে। শুধু বাহক তরঙ্গটির উপস্থিতিটি যদি সে উদ্ঘাটন করতে পারে তা হলে সে বুঝে যে একটি সিগন্যাল এসেছে। কিন্তু যদি যেই আরোপিত রূপটি যদি বাহক থেকে পৃথক করে উদ্ঘাটন করতে পারে তা হলে বার্তাটিও সে পাঠোদ্ধার করতে পারে। দূর বুদ্ধিমান থেকে যা পাব, তাতে আপাতত আমরা শুধু প্রথম কাজটিই করতে পারবো– বাহক তরঙ্গের উপস্থিতিটি শুধু বুঝতে পারবো। এত দূর থেকে আসা সিগন্যালে বার্তার বিস্তারিত খুঁটি- নাটি উদ্ঘাটন করতে পারবোনা বলে এই বার্তায় সেই দূর বুদ্ধিমান কী বলতে চেয়েছে তা তা আমরা বুঝার চেষ্টাও করতে পারবোনা। সেটি করতে হলে বর্তমানে আমাদের সব চেয়ে শক্তিশালী যে রেডিও টেলিস্কোপ আর সব চেয়ে দক্ষ যে গ্রাহক যন্ত্র রয়েছে তাকে অন্তত আরো ১০ হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী ও দক্ষ হতে হবে।

যন্ত্রপাতির দুর্বলতার জন্য খুঁটিনাটি উদ্ঘাটন করতে না পারা ছাড়াও বার্তা না বুঝতে পারার আরো একটি কারণ রয়েছে। বর্তমানের সব চেয়ে শক্তিশালী রেডিও টেলিস্কোপেও সম্ভাব্য সিগ্‌ন্যালকে তার শক্তিশালী নয়েজ পটভূমির মধ্য থেকে ফুটিয়ে তোলার জন্য মহাকাশের একটি ক্ষুদ্র অংশ থেকে আসা তরঙ্গের জন্য ও জায়গাটি বার বার অনেক বার স্ক্যান করতে হয়। এটি করতে গিয়ে সিগন্যালে মড্যুলেশনের সূক্ষ্ম উঠানামাগুলো একাকার হয়ে হারিয়ে যায়– আমরা শুধু গড় সিগ্‌ন্যালটিকেই ফুটিয়ে তুলতে পারি।

তবুও ধরে নিলাম যে আমরা গ্রাহক যন্ত্রের উন্নয়ন ঘটিয়ে বার্তাটি উদ্ঘাটন করার ব্যবস্থা করতে পারলাম। কিন্তু তারপরও বার্তাটির অর্থ যে আমরা বুঝতে পারবো এমন নিশ্চয়তা নেই। দূর বুদ্ধিমানের ভাষা ও তার চিন্তাধারার সঙ্গে আমরা একেবারেই অপরিচিত। সাধারণত পৃথিবীতে একটি অজানা ভাষার কথা বা লিপির মর্মোদ্ধার আমরা যে ভাবে করি সেই পদ্ধতি এখানে চলবেনা। আমরা সাধারণত অচেনা ভাষার বার্তা বা লিপির মধ্যে একটি প্যাটার্ন আবিষ্কারের চেষ্টা করি, যাতে

করে আমাদের জানা কিছুর সঙ্গে তার একটি সম্পর্ক ঘটানো যায়। যেমন এই ভাষার কোন লিপি যদি জানা কোন ভাষার লিপির সঙ্গে থাকে ও উভয়ের একই মর্ম বলে মনে হয়, তা হলে আমরা শুধু ঐ মর্মটিই বুঝতে পারিনা, বরং ঐ অজানা ভাষায় আরো কোন লিপি পেলে ঐ প্যাটার্ন প্রয়োগ করে তারও মর্মোদ্ধার করতে পারি (প্রাচীন মিশরের চিত্র-লিপির মর্মোদ্ধার এ ভাবেই হয়েছিলো)। অথবা সরাসরি সামনা সামনি হবার সুযোগ পেলে আমরা এটি সেটি ইশারায় দেখিয়ে তাকে নিজ ভাষায় সেটি বলতে বলি, এবং এভাবে ঐ ভাষাটি শিখি। কিন্তু দূর বুদ্ধিমানের ক্ষেত্রে এভাবে প্যাটার্ন বুঝতে পারা এ রকম কোন ভাবে সম্ভব নয়।

তবে আপাতত যা পারবো সেটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা যে একা নই, সেই আবিষ্কারটিই একটি বিরাট ব্যাপার– যা আমাদের চিন্তা-চেতনাকে সম্পূর্ণ ভাবে বদলে দিতে সক্ষম। তা ছাড়া যে সিগন্যাল আমরা পাব তার প্রকৃতি থেকে, এবং বার্তা উদ্ঘাটন করা গেলে সেটির প্রকৃতি থেকে যারা এটি পাঠিয়েছে তাদের প্রযুক্তি ও সভ্যতার অবস্থা সম্পর্কে বেশ কিছুটা আন্দাজ আমরা করতে পারবো বৈ কি।

প্রজেক্ট ওজমা থেকে প্রজেক্ট আর্গাস

'সেটির' ধারণাটি বহুদিন থেকে ভাবা হলেও এতে সত্যিকার প্রথম পদক্ষেপটি নেয়া হয় ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রীন ব্যাংক ন্যাশনাল রেডিও এষ্ট্রনোমি অবজারভেটরি থেকে। প্রকল্পটির নাম দেয়া হয় রূপকথার বই উইজার্ড অব ওজের অনুসরণ করে প্রজেক্ট ওজমা। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ৫০ বছরের উপর সময় ধরে নানা চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে চলেছে এই অনুসন্ধান নিয়ে নানা প্রকল্প। এক এক সময় গুরুত্ব পেয়েছে, এক এক সময় একে বেদরকারী কাজ মনে করে সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অন্য দিকে বিস্তৃত হয়েছে এতে বেসরকারী ও সাধারণ সৌখিন বিজ্ঞানীদের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ। ইতিবাচক ফল যদিও এখনো মেলেনি তবুও খোঁজার সক্ষমতা, ব্যাপ্তি, দ্রুততা ইত্যাদিতে বিশাল পরিবর্তন এসেছে এই ৫০ বছরে। ফলে অনুসন্ধান সফল হবার সম্ভাবনাও ক্রমাগত বেড়ে গিয়েছে, এবং সেই সঙ্গে বেড়েছে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের আশা।

নানা ফ্রিকোয়েন্সিতে গড়া ব্যাণ্ড থেকে ফ্রিকোয়েন্সিগুলোকে আলাদা করে অনুসন্ধান চালানোর জন্য বর্ণালী-বিশ্লেষক যন্ত্রটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আশির দশকে এই যন্ত্রের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে এবং এক সঙ্গে ৮৪ লক্ষ চ্যানেল পরীক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এতে এক হার্ৎসেরও মাত্র ৫ শতাংশ পরিমাণে সূক্ষ্মতায় চ্যানেলগুলোকে আলাদা করা সম্ভব হলো। এ ভাবে আলাদা না করা গেলে বুদ্ধিমানের কৃত্রিমভাবে তৈরি সিগন্যাল সনাক্ত করা মুশকিল। একটি সমস্যা বরাবর হচ্ছিল তা হলো পৃথিবীর

মানুষ-সৃষ্ট নানা সিগন্যাল থেকে সম্ভাব্য বুদ্ধিমানদের দূর সিগন্যালগুলোকে পৃথক করতে পারা। কিন্তু বিভিন্ন সিগন্যালের ডপলার শিফ্‌ট অর্থাৎ তার উৎসের গতি জনিত বর্ণালী সরন লক্ষ্য করে এ সমস্যা সমাধানের উপায় বের হলো। ঐ গতি থেকে বুঝতে পারি কোনটি পৃথিবী থেকে আসছে আর কোনটি দূরের তারা থেকে

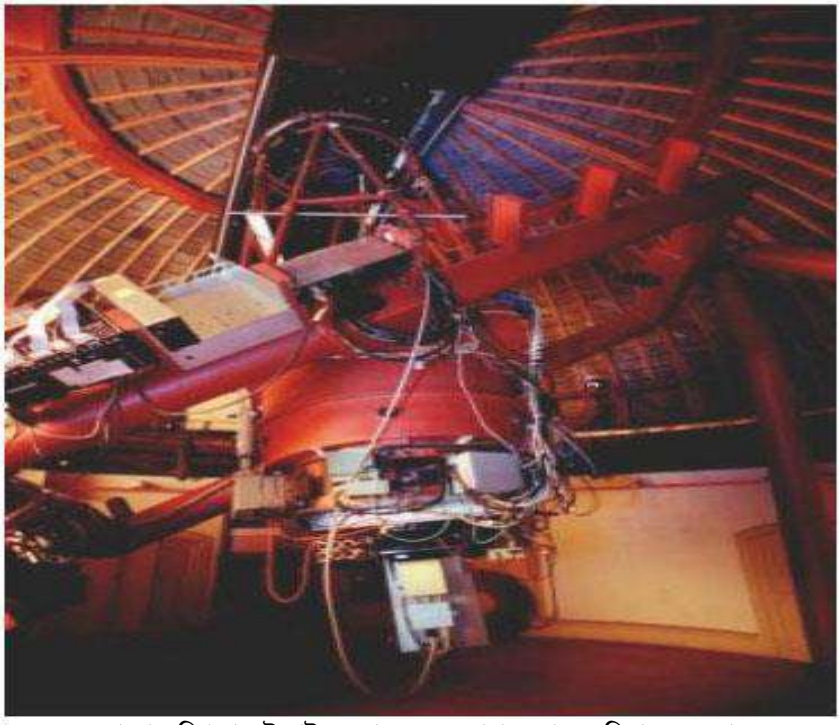

আলোক সিগন্যাল উদ্ঘাটনের মাধ্যমে দূর তারার জগতে বুদ্ধিমান অনুসন্ধান

আসছে। বর্ণালী বিশ্লেষকের এত দ্রুত উন্নতি হচ্ছিল যে ১৯৯৫ সাল নাগাদ ২৫ কোটি চ্যানেল এক সঙ্গে জরিপ করা সম্ভব হয়ে উঠলো। এর মাধ্যমে ১.৪০০ গিগাহার্ৎস থেকে ১.৭২০ গিগাহার্ৎস মাইক্রোওয়েভ বর্ণালী খুব দ্রুত স্ক্যান করা যায়। এসবের মধ্যে কোথাও মনোযোগ আকর্ষণের মত কিছু পেলে সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্লেষক যন্ত্র সেখানে ফেরৎ গিয়ে তাকে ভাল ভাবে উদ্ঘাটনের ব্যবস্থা করে, যাতে সত্যিই সেখানে কোন কাঙ্খিত সিগন্যাল আছে কিনা বুঝা যায়।

১৯৯৫ সাল থেকে চলছে ছায়াপথে অবস্থিত এক হাজার সূর্য-সদৃশ তারার এলাকা থেকে আসা রেডিও তরঙ্গ জরিপের কাজ– যেটি প্রজেক্ট ফিনিক্স নামক উদ্যোগের অন্তর্ভূক্ত। এটি চলছে প্রধানত বেসরকারী বিনিয়োগের মাধ্যমে। অন্য দিকে এ

কাজটি এখন ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে দু'একটি সুনির্দিষ্ট মানমন্দিরের বদলে পৃথিবী জোড়া অনেকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্যে, যার মধ্যে অনেক সৌখিন বিজ্ঞানীরাও অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন। এদিক থেকে আরো সাম্প্রতিক প্রজেক্ট আর্গাসে ২৭টি দেশের ১৪৩টি ছোট বড় রেডিও টেলিস্কোপ ব্যবহৃত হচ্ছে। আর্গাস নামটি লক্ষ্য করার মত। এটি এসেছে গ্রীক দেবতা আর্গাসের নামে যার ১০০টি চোখ, তাই এক সঙ্গে সব দিকে তাকাতে পারে। এই প্রজেক্ট এক সঙ্গে অনেক তারার সিগন্যালের দিকে নজর রাখছে। 'সেটিকে' আরো বিস্তৃত করেছে SETI@home নামক নূতন প্রকল্প। নানা তারার সিগন্যালকে প্রক্রিয়াকরণের জন্য অনেক বেশি কম্পিউটার প্রসেসিং ক্ষমতা প্রয়োজন। অল্প কিছু বড় কম্পিউটারের কাজে কুলাচ্ছেনা। তাই প্রায় ২ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবী তাঁদের ৩ লক্ষ কম্পিউটারের অলস সময়টুকু 'সেটির' প্রসেসিং এর জন্য দিচ্ছেন। তাছাড়া এখন শুধু 'সেটির' জন্যই বিশেষ ভাবে নির্মিত হয়েছে 'এ্যালেন রেডিও টেলিস্কোপ সারি' – যাতে প্রত্যেকটি ৬.১ মিটার ব্যাসের ৩৫০টি ডিশ এন্টেনা রয়েছে এক বর্গ কিলোমিটারে এলাকা জুড়ে। সম্মিলিত ভাবে এরা ১০০ মিটার ব্যাসের রেডিও টেলিস্কোপের সমান শক্তিশালী।

'সেটির' কাজ যখন শুরু হয়েছিল তখনো লেজার রশ্মির আবিষ্কার হয়নি, তাই আমাদের জানা ছিলনা যে দূর বুদ্ধিমানরা রেডিও তরঙ্গের সিগন্যাল না পাঠিয়ে শক্তিশালী লেজার আলোর সিগন্যালও পাঠাতে পারে। এখন আমরা এক হাজার মেগাওয়াট শক্তিশালী লেজার রশ্মি সৃষ্টি করতে পারছি। দূর তারার জগতের কেউ যদি এরকম লেজার রশ্মির ন্যানো-সেকেণ্ড স্থায়ী পাল্‌স আমাদের দিকে পাঠায়, তা হলে তা অনায়াসে শক্তিশালী টেলিস্কোপগুলোতে দেখা যাবে। এরকম আলোক সিগন্যাল সহজে গ্রহণ করার জন্য এখন এমন ফটোটিউব নির্মিত হয়েছে যার সাহায্যে সাধারণ গড়পড়তা রিফ্লেকটর টেলিস্কোপই লেজারের ঝলকে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল সৃষ্টি করতে পারবে।

সঙ্গত ভাবেই আশা করা যায় যে মহাবিশ্বে অনেক স্থানে বুদ্ধিমানরা লেজার বিজ্ঞানে আমাদের থেকেও এগিয়ে গিয়েছে, এবং শক্তিশালী লেজার সিগন্যাল নানা দিকে পাঠাচ্ছে। আমাদের দিকেও নিশ্চয়ই কেউ কেউ তাক করছে আর দেখার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলেই আমরা তা দেখতে পাব। সেই দেখার চেষ্টা করার ব্যবস্থাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়েছে, যেখানে নিয়মিত ভাবে এরকম আলোর সিগন্যালের জন্য অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। আলোক নির্ভর বলে এই কার্যক্রমকে বলা হয় 'অপটিক্যাল সেটি'।

‘সেটি’ সফল হবার সম্ভাবনা

দূর বুদ্ধিমানের কাছ থেকে আসা সিগন্যাল অনুসন্ধানের এই যে কার্যক্রম ৫০ বছর ধরে চলছে, তার পেছনে কতগুলো অনুমান কাজ করছে। মূল অনুমানটি আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি। তা হলো মহাবিশ্বের অন্য অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহে প্রাণের উন্মেষ ঘটেছে এবং এর বিবর্তনে মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবেরও উদ্ভব হয়েছে– এমন

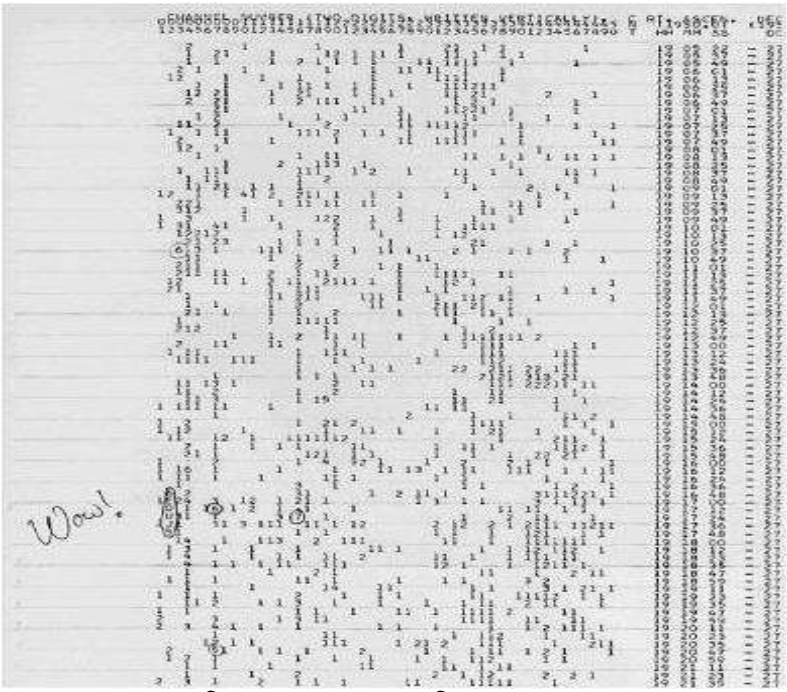

দূর তারার জগতে বুদ্ধিমানের সন্ধানে ক্রমাগত সিগন্যালের মধ্যে একবার আশাব্যঞ্জক আভাস পাওয়া গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওখানে উল-াস ধ্বনি ‘ওয়াও’ লিখলেও আশাটি সত্যি সত্যি হয়নি।

(এখানে সিগন্যাল সংখ্যা ভিত্তিতে রেকর্ডকৃত)

ধারণার উপর আস্থা রাখা। অবশ্য এর সঙ্গে আরো একটি অনুমানের প্রসঙ্গ এসে গড়ে। যে তারার কক্ষপথে আছে ঐ বুদ্ধিমান প্রাণির গ্রহ, ধরে নিতে হবে সেই তারার বয়সটি বুদ্ধিমান প্রাণির বিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের থেকে অনেক বেশি। নইলে তারার যৌবন কালের মধ্যেই যদি সে বিবর্তন না ঘটে তা হলে বিকশিত হবার জন্য যথেষ্ট সময় সে প্রাণি পাবেনা, তার আগেই হয়তো ‘লাল দৈত্য’ তারায় পরিণত হয়ে তারাটি ঐ গ্রহকে ধবংস করবে।

ঐ বুদ্ধিমান প্রাণির সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কেও একটি অনুমান আমরা এর মধ্যে করছি। ধরে নিচ্ছি যে এই বিকাশ অনেকটা মানুষের বিকাশের মত একই খাতে এগিয়েছে। সে জন্যই আমরা মনে করছি তাদের ক্ষেত্রেও রেডিও বিজ্ঞান, লেজার বিজ্ঞান ইত্যাদির অন্তত একই রকম অগ্রগতি হয়েছে। অন্য দিকে দূর বুদ্ধিমানের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের একটি সীমাও আমরা এর মধ্যে টেনে দিচ্ছি। আমরা ধরেই নিচ্ছি যে তারা এদিক থেকে এতটা এগিয়ে যায়নি যার মাধ্যমে ইচ্ছে করলেই দূরের যে কোন তারার যে কোন গ্রহে গিয়ে হাজির হতে পারবে। সেটি যদি পারতো তা হলে আমাদের এখানে এসে ইতোমধ্যে হাজিরই হয়ে যেতো যোগাযোগ করার জন্য। এটি পারেনা বলেই তারা রেডিও সিগন্যাল বা লেজার সিগন্যাল পাঠাবার মত পন্থাই বেছে নিয়েছে তাদের অস্তিত্বের খবর দূরের বাসিন্দাদের কাছে পাঠাবার জন্য। এক্ষেত্রে আমরা যেটুকু করতে পারি, ওরাও শুধু মোটামুটি সেরকমই পারবে, এমনটিই আমরা অনুমান করছি। শুধু তাই নয় যোগাযোগের জন্য নানা কারণে আমরা যে রকম ফ্রিকোয়েন্সি বেছে নিতাম, তারাও তাই করছে বলে অনুমান করছি। এসব অনুমানের পেছনে আমাদের নিজেদের পরিস্থিতিটিই খুব বেশিভাবে কাজ করছে। এমনকি দূর বুদ্ধিমানদের অস্তিত্ব জানার জন্য আমাদের যে রকম প্রবল আকাঙ্খা রয়েছে, ওদেরও আমাদের সম্পর্কে জানার সে রকম আকাঙ্খা রয়েছে বলে ধরে নিচ্ছি। 'সেটি' কার্যক্রম সফল হতে হলে আমাদের এই অনুমানগুলো মোটামুটি সঠিক হতে হবে– অন্তত দূর বুদ্ধিমানদের কারো কারো ক্ষেত্রে। যে সব বিজ্ঞানী 'সেটি' প্রকল্পে আস্থা রাখেন তাঁরা মনে করেন অনুমানগুলো খুবই যুক্তিসঙ্গত। অন্য কিছু বিজ্ঞানী অবশ্য এতে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

'সেটি' কার্যক্রম শুরু হবার একেবারে প্রথম যুগে এর একজন পথিকৃৎ বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ড্রেইক একটি সমীকরণের মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন কী ভাবে দূর তারার কোন বুদ্ধিমানের কাছ থেকে আমাদের সিগন্যাল পাওয়ার সম্ভাবনা এসব অনেকগুলো অনুমান সঠিক হবার উপর নির্ভর করে। সিগন্যাল পাওয়ার সম্ভাবনাকে এখানে কতগুলো উৎপাদকের গুণফলের সমান হিসাবে দেখানো হয়েছে। এই উৎপাদকগুলো হলো: ১) গ্যালাক্সিতে সূর্য-সদৃশ যথাযথ বয়সের তারার সংখ্যা। ২) এদের মধ্যে কত ভাগ তারার গ্রহ রয়েছে। ৩) এ গ্রহগুলোর কত ভাগে প্রাণের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। ৪) অনুকূল গ্রহগুলোর কত ভাগে সত্যি সত্যি প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে। ৫) এদের আবার কত ভাগে মানুষের মত বুদ্ধিমানদের বিবর্তন ঘটেছে। ৬) তাদের কত ভাগ ক্ষেত্রে উন্নত সভ্যতা ও প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে রেডিও যোগাযোগের ক্ষমতা ও ইচ্ছা সৃষ্টি হয়েছে। ৭) এই শেষোক্তদের উচ্চ সভ্যতাগুলো গড়পড়তা কত বছর টিকে থাকবে?

এই সাতটি উৎপাদকের গুণফলই আমাদেরকে দূর-বুদ্ধিমান খুঁজে পাওয়ার গাণিতিক সম্ভাবনার ধারণা দিতে পারে। এর মধ্যে প্রথম ও সপ্তম উৎপাদক দুটা ছাড়া বাকি প্রত্যেকটির মান একটি ভগ্নাংশ– যেগুলো সব গুণ করলে ১ এর থেকে ছোট মানের হবে। এই প্রত্যেকটি ভগ্নাংশের মান ১ হলেই শুধু গুণফল ১ হবে, যা অসম্ভব। তবে 'সেটি' তে আস্থাবান বিজ্ঞানীরা সব কটি ভগ্নাংশকে গণ্য হবার মত যথেষ্ট বড় মনে করেন, যদিও অধিকাংশ উৎপাদক সম্পর্কে আমাদের সত্যিকার জ্ঞান খুব বেশি নয়। প্রথম উৎপাদকটি অর্থাৎ গালাক্সিতে সূর্য-সদৃশ তারার সংখ্যা সম্পর্কে আমরা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের কল্যাণে এখন বেশ কিছুটা ধারণা করতে পারছি। তাছাড়া খুবই সম্প্রতি দূর তারার অনেকগুলো গ্রহ আবিষ্কৃত হওয়ায় এবং সেগুলোর মধ্যে পৃথিবী-সদৃশ তারার সন্ধান পাওয়ায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় উৎপাদকটি সম্পর্কেও আমরা কিছুটা বাস্তবসম্মত ভাবেই আশাবাদী হতে পারছি। বাকি সবগুলো উৎপাদক সম্পর্কে আমরা শুধু পৃথিবীতে যেমন হতে পেরেছে অন্যত্রও তেমনি হবে– এমন যুক্তি থেকেই আশাবাদী হতে পারি। এগুলো সব যথেষ্ট বড় ভগ্নাংশ যদিও বা হয় তবুও শেষ পর্যন্ত সপ্তম উৎপাদকটি অর্থাৎ 'দূর সভ্যতাগুলো'র গড়পড়তা স্থায়ীত্বের উপরই আমাদের সিগন্যাল পাওয়া নির্ভর করবে। যদি ঐ সভ্যতাগুলোর স্থায়ীত্বকাল কম হয় (যেমন তাদের অধিকাংশ যদি দ্রুত আত্ম-ধ্বংসের পথ বেছে নেয়) তা হলে আমাদের কাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে এখন সিগন্যাল পাঠাবার অবস্থায় তাদের বেশি কাউকে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবেনা। কিন্তু যদি সভ্যতাগুলো দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তা হলে তাদের অনেকগুলোকেই এখন আমরা পেতে পারি। অবশ্য সে সম্ভাবনা থাকবে যদি বাকি উৎপাদকগুলো অর্থাৎ ভগ্নাংশগুলোর কোনটি শূন্য না হয়, বরং গণ্য করার মত একটি মান প্রত্যেকটির থাকে। আমরা দেখেছি অনেক বিজ্ঞানী সে সম্পর্কে কিছুটা সন্দিহান। বিশেষ করে পঞ্চম উৎপাদক অর্থাৎ অন্যান্য তারার গ্রহে প্রাণের আবির্ভাব হলেও সেখানে যে বিবর্তনকে মানুষের মত বুদ্ধিমান সৃষ্টির দিকে এগুতেই হবে, একথা তাঁরা মানেননা। কারণ বিবর্তন জিনিসটির মধ্যেই এরকম অবশ্যম্ভাবী কিছু নেই।

আর যাঁরা 'সেটির' উপর একেবারেই আস্থা রাখেন না তাঁরা উৎপাদকগুলো অধিকাংশকেই শূন্য মানের বলে ধরে নেন– যার ফলে সিগন্যাল পাওয়ার সম্ভাবনাকে তাঁরা শূন্য বলেই মনে করেন, আর এর পেছনে সময় ও অর্থ ব্যয়কে মরীচিকার পেছনে ব্যয় বলে মনে করেন। বিখ্যাত পদার্থবিদ এনরিকো ফার্মি এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিলেন– দূর-বুদ্ধিমানরা যদি থাকতো তাদের কেউ কেউ এত দিনে এখানে চলে আসতো। কিন্তু তারা কই, আসলো না তো? কিন্তু অনুমানগুলোর উপর কম আস্থা রয়েছে এমন বিজ্ঞানীদেরও অধিকাংশই মত হলো, হতে পারে সিগন্যাল

পাওয়ার সম্ভাবনা কম, কিন্তু ঐ অল্প সম্ভাবনার কথাটিও অবহেলা করা উচিত হবেনা। বরং অনুসন্ধানকে আরো বিস্তৃত করে এ সম্ভাবনাকে পরীক্ষা করে যাওয়া উচিত। হতে পারে আমরা হয়তো সঠিক প্রযুক্তিতে খুঁজছিনা, দূরের অধিকাংশ বুদ্ধিমান হয়তো এখন আমাদেরকে অনেক ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর প্রযুক্তিতে চলে গেছে। হয়তো প্রযুক্তি ঠিক আছে, আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক নাই, এজন্য ফ্রিকোয়েন্সির ব্যাপ্তি আরো বাড়াতে হবে। যদি খুঁজি তা হলে তাদেরকে পাওয়ার অল্প কিছু সম্ভাবনা অন্তত আছে। যদি না খুঁজি তা হলে তো হয়তো কোনদিন তাদের সম্পর্কে আমরা জানতে পারবোনা। তাই না খোঁজার চেয়ে খোঁজাই কি ভাল নয়? যদি এমন হয়, আমরা খুঁজলামনা অথচ তারা আছে, একদিন সত্যি সত্যি এসে আমাদের উপর চড়াও হলো। তার চেয়ে আগে থেকে জানার চেষ্টাটিই কি ভাল নয়?

আমরাও কি নিজেদের সিগন্যাল পাঠাবো?

আমরা এ পর্যন্ত শুধু ওদেরকে খুঁজছি, কিন্তু তারাওতো হয়তো আমাদেরকে খুঁজছে। সে ক্ষেত্রে আমরা কি নিজেদের অস্তিত্বটি জানাবার চেষ্টা করছি? আমাদেরও কি তাদের দিকে সনাক্ত করার মত রেডিও সিগন্যাল পাঠানো উচিত হবে? এই ব্যাপারে স্থির করার আগে আমাদের ভাবা উচিত দূর-বুদ্ধিমানরা আমাদের দিকে সিগন্যাল পাঠাবে কী মনে করে। তারা জানেনা এই অঞ্চলের কোন গ্রহে কোন প্রাণি আছে কিনা। যদিও বা ভাবে যে আছে, তবুও তারা জানেনা এখানে ব্যাকটেরিয়া বা কীট জাতীয় প্রাণিই শুধু আছে নাকি বুদ্ধিমান কেউ কেউ আছে। বুদ্ধিমান আছে মনে করলেও তাদের উন্নত বিজ্ঞান বা সভ্যতা আছে কিনা তা জানেনা। যদি তাও বা আন্দাজ করে নেয় তবে এটি জানেনা যে সত্যিকার রেডিও বিজ্ঞান চর্চা তারা করতে পারছে। আসলেও তো মানুষের দুই লক্ষ বছর ইতিহাসের মধ্যে মাত্র গত একশ' বছর (মানুষের রেডিও বিজ্ঞানের বয়স) এই সক্ষমতা আমরা লাভ করেছি। আমাদের দিকে তারা যদি হাজার হাজার বছর ধরে এদিকে সিগন্যাল পাঠায়ও, এটি কারো কাছে পৌঁছার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে মাত্র গত একশ' বছরের কম সময়ের মধ্যে। তারা তো জানার কথা নয় যে তারা আদৌ সফল হবে। তাই তাদের জন্য সঠিক পদ্ধতি নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে থেমে থেমে সুদূর বিভিন্ন তারার অঞ্চলে সিগন্যাল পাঠিয়ে যাওয়া। সেটি ভেবেই আমরা সেই সিগন্যালের খোঁজ করছি। আমরা খুঁজে পেলে তারা অন্তত একটি গ্রহের বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে নিজেদের অস্তিত্ব জানাতে সক্ষম হবে।

আমরাও যদি সিগন্যাল পাঠাই তবে এই ভরসাতেই পাঠাবো। ঐ বিশাল মহাবিশ্বের কোথাও কোথাও নিশ্চয়ই সেটি গ্রহণ করে বুঝতে পারার মত বুদ্ধিমান এখন রয়েছে,

এটিই হবে আমাদের আশা। তাছাড়া সেটি পাঠাবার মত এবং অনেক অনেক দূরেও তারার জগতে পৌঁছাবার মত প্রযুক্তি আমাদের রয়েছে।

কিন্তু ওদের পাঠানো সিগন্যাল শুনার চেষ্টা করা এক কথা, কিন্তু নিজেদের অস্তিত্বের ঘোষণা আমরা মহাবিশ্বের সব রকম জায়গায় দেব কিনা সেটি ভিন্ন কথা । অনেকের মতে এটি উচিত হবেনা। সে দলে রয়েছেন ষ্টিফেন হকিংসের মত বিজ্ঞানীও। ২০১০ সালে তিনি এ ধরনের উদ্যোগের ক্ষেত্রে কিছু সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। তাঁর মতে ওখানে কারা রয়েছে, তাদের ক্ষমতা কতখানি ইত্যাদি না জেনে নিজেদেরকে প্রকাশ করা উচিত হবেনা। হয়তো ওরা প্রযুক্তি সক্ষমতায় আমাদের চেয়ে লক্ষ লক্ষ বছর এগিয়ে আছে। হয়তো এখন তারা খুবই আগ্রাসী একটি গোষ্ঠিতে পরিণত– মহাবিশ্বের সর্বত্র সবকিছু কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টায় রয়েছে। আমাদের নিজেদের দিকে তাকালে সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায়না। এমন কি ওরা হয়তো নিজেদেরকে প্রায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অমর অবস্থার উন্নীত করেছে, সে চেষ্টাতো আমরাও কম করছিনা। হয়তো এখন তাদের সভ্যতার জন্য অনেক বস্তু, অনেক শক্তির দরকার– এক একটি তারা দখল করে সেই শক্তি ওরা কুক্ষিগত করছে। হয়তো আলোর গতির চেয়ে দ্রুত বেগে চলার কৌশল ওরা করতে পারছে, যেমন সম্ভাবনা গাণিতিক ভাবে আমাদের পদার্থবিদ্যাও দেখতে পারছে। সেক্ষেত্রে যে কোন মুহূর্তে অনেক আলোক বর্ষ দূরের জগৎ থেকেও ওরা এসে হানা দিতে পারে আমাদের জগতে। কাজেই সাবধানের মার নেই। অতীতে আমরা যখন পৃথিবীতে নূতন নূতন জনপদ আবিষ্কার করেছি, তখন সেগুলোকে ধ্বংস বা পদানত করার সব চেষ্টাই কি আমরা করিনি? সুযোগ পেলে অন্যত্রও যে তা করবো না এমন আত্মবিশ্বাস কি আমাদের আছে? তা হলে অন্য তারার বুদ্ধিমানদের সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা আমরা করবো কোন ভরসায়?

ষ্টিফেন হকিংস এর মত এতটা নৈরাশ্যবাদী হওয়া হয়তো আমাদের প্রয়োজন নাই। ওরকম উচ্চ সক্ষমতা সম্পন্ন বুদ্ধিমানরা যদি দূর তারার জগতে আদৌ থাকে, তা হলে আমাদের আয়োজন করা সিগন্যালের জন্য তারা হয়তো বসে নেই। এর আগেই সেই সিগন্যাল তারা পেয়ে গেছে। প্রায় একশ' বছর ধরে আমরা নিয়মিত রেডিও সম্প্রচার করছি, আর টেলিভিশন সম্প্রচার করছি তাও ষাট বছরের উপর হতে চল্‌লো। এগুলোর অনেকটাই যে পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করে দূর দূরান্তে চলে যায়নি, আর সেখানকার বুদ্ধিমানদের সূক্ষ্ম গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়েনি তা কে বলবে? ওরা হয়তো বহুদিন ধরে আমাদের জনপ্রিয় টেলিভিশন সিরিয়ালগুলো উপভোগ করছে! কাজেই আক্রমণ করার থাকলে তারা এত দিনে তা করতো। তারা খুব সম্ভব আসেনি আসার প্রযুক্তি তাদের নেই বলে। আমরা পদার্থবিদ্যা থেকে আলোর

গতিকে অতিক্রম করার যে সব গাণিতিক সম্ভাবনা দেখছি, সেগুলো সত্যি সত্যি ঘটাতে পারা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। আমাদের জন্য যেমন দুরূহ, ঐ দূর বুদ্ধিমানের জন্যও নিশ্চয় তাই। কাজেই খবর পেলেই তারা আমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য হানা দেবে এই আশঙ্কা হয়তো অমূলক। অন্তত 'সেটি' বিজ্ঞানীরা তাই মনে করেন। দূর বুদ্ধিমানরা নাই বলে নয়, আসার কৌশল আয়ত্ব করতে পারেনি বলেই তারা আসতে পারেনি এত দিন। তাই এদের সিগন্যাল উদ্ঘাটন করতে যেমন এই বিজ্ঞানীদের উৎসাহ, ওদের কাছে সিগন্যাল পাঠাতেও সে রকম উৎসাহ কম নয়। কিন্তু সেটি ব্যয় বহুল হবে বলে, আপাতত পাঠানোর চেয়ে শুনার কাজেই তাঁরা ব্যস্ত রয়েছেন।

মহাবিশ্বে মানুষ

পৃথিবীতে অনন্য হলেও মহাবিশ্বে মানুষকে বুদ্ধির দিক থেকে অনন্য হতে হবে এমন কোন কথা নেই। সে জন্যই তো আমরা কান পেতে রয়েছি দূর বুদ্ধিমানদের কথা শুনার জন্য। আমরা একাকীত্ব পছন্দ করিনা, তাই ভাবতে ভালবাসি দূর তারার জগতে আরো সব উন্নত সভ্যতার কথা। বিজ্ঞানকে উদার ভাবে সার্বজনীন জ্ঞানে পরিণত করে পৃথিবীতে আমরা যেভাবে মানবতার আত্ম-উপলব্ধির প্রতিষ্ঠা করেছি, সেটি এখন পুরো মহাবিশ্বে ভাগ করে নিতে আমরা উদ্‌গ্রীব। আবাস হিসাবে পৃথিবীর গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকতে আমরা নারাজ। প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকাতে হোমো (আমরা) গণের মানুষ যখন বিবর্তিত হয়েছিল, তারপর থেকে আমরা পৃথিবীময় শুধু ছড়িয়ে পড়তে চেয়েছি। পরিস্থিতির বাস্তবতা ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য করেছিলো বটে, তবে আমাদের অনুসন্ধিৎসাও এতে কম অবদান রাখেনি। আমরা ভবিষ্যতে সৌর জগতের অন্যত্র বসত স্থাপন করতে চাই, তারপর তাকেও ছাড়িয়ে যেতে চাই। সে জন্য গবেষণার কী ধরনের আয়োজন চলছে তা আমরা এই বইয়ে দেখেছি। কিন্তু মানসিক ভাবে আমরা ইতোমধ্যেই অনেক দূর বিস্তৃত হয়েছি। দূর-বুদ্ধিমানের কল্পনা ও তাদের সঙ্গে যোগসূত্রের চেষ্টাটি তারই অংশ। মহাবিশ্বের একটি বিন্দুতে আমরা আবদ্ধ হয়ে থাকতে চাইনি, তাই পুরো মহাবিশ্বকেই আমাদের চিন্তা-চেতনায় ধারণ করতে হয়েছে। মানুষের এই উদারভাবে বিস্তৃত হবার দিকটিকেই আমরা বড় করে তুলতে চাই, তার অতীত আগ্রাসী ইতিহাসকে নয়। শেষ পর্যন্ত এটিই হয়তো পুরো মহাবিশ্বেও মানুষের স্থানকে অনন্য করে তুলবে, তার বিশ্ব-জনীনতা, বিশ্ব-উপলব্ধির গুণটি।

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণে এবং দেশের তরুণ তরুণীদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক করার ক্ষেত্রে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। এজন্য তিনি লেখালেখি, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যবহার, বিজ্ঞান সাংবাদিকতা, বিজ্ঞান বক্তৃতা ইত্যাদি সব মাধ্যম ব্যবহার করেছেন গত পাঁচ দশক ধরে। 'মহাশূন্যে মানুষ' এই পুস্তকমালাটিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেয়া তাঁর একটি বিজ্ঞান বক্তৃতামালার ভিত্তিতেই রচিত। ষাটের দশকে তিনি এদেশের প্রথম জনপ্রিয় বিজ্ঞান মাসিক 'বিজ্ঞান সাময়িকী'র প্রতিষ্ঠা করেন, যা তাঁরই সম্পাদনায় এখনো প্রকাশিত হচ্ছে। সত্তরের দশকের শেষের দিকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একটি অনন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সিএমইএস), নিজে কর্ণধার থেকে যাকে তিনি পল্লী-বাংলার সুবিধাবঞ্চিত তরুণ তরুণীদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা ও হাতে কলমে জীবিকামুখি প্রযুক্তির বিস্তারে একটি সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন।

বিজ্ঞান সাহিত্যের জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার সহ বিভিন্ন স্বীকৃতি প্রাপ্ত এই লেখকের লেখনী শুধু তাঁর নিজের বিষয় পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং আধুনিক বিজ্ঞানে অতি ফলপ্রসূ বিভিন্ন শাখার অগ্রগতি নিয়ে তাঁর বুঝিয়ে বলার প্রচেষ্টা ও লেখার স্বচ্ছন্দ গতি রয়েছে। তাঁর প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক বই এবং প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক। বাংলাদেশে বিজ্ঞান চেতনা, বিজ্ঞান সাহিত্য, তরুণ তরুণীদের সক্রিয় বিজ্ঞান আন্দোলন কী ভাবে এগিয়েছে, তাঁর সম্পাদিত 'বিজ্ঞান সাময়িকী'তে এবং তাঁর রচনায় তার একটি ধারাবাহিক আলেখ্য পাওয়া যায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক।